প্ল্যাটফরম

ছোটগল্প সংকলন ২০০৯

সম্পাদনা ঃ চুনী দাশ

কাকলি প্রকাশনী
আগরতলা, ত্রিপুরা

প্ল্যাটফরম

PLATFORM

a Collection of Bengali Short stories

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস : প্রদীপা, আসাম আগরতলা রোড,
ধলেশ্বর রোড নং ১১, আগরতলা

মুদ্রণে : জ্যোতি লেজার পয়েন্ট, ৬৩/২ ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক : কাকলি প্রকাশনীর পক্ষে পারুল দাশ কর্তৃক ধলেশ্বর
নতুনপল্লী রোড নং ৭, আগরতলা- ৭৯৯০০৭,
পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ফোন (০৩৮১) ২২২১৮৪৭

প্রাপ্তিস্থান

কাকলি প্রকাশনী, ধলেশ্বর রোড নং-৭, আগরতলা

বুক ওয়ার্ল্ড, ১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগবতলা

অক্ষর পাবলিকেশনস্, প্যালেস কম্পাউণ্ড, প্রেস ক্লাব রোড, আগরতলা

মূল্য : ১০০ টাকা

শ্রদ্ধার্ঘ্য

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের

পুণ্যস্মৃতিতে

প্ল্যাটফরম

ছোটগল্প সংকলন ২০০৯

সূচি

বিদেশী গল্পের অনুবাদ
ডাঃ বিকাশ ভট্টাচার্য

মৃত্যুর জবানি

[অতীতের অজ্ঞাত পরিচয় এক আরবীয় লেখকের এই ছোট্ট লেখাটিকে মানুষের গল্প বলার শৈলীর এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যায়। এই সংকলনে তাই এই ছোট্ট গল্পটিকেই সবার আগে স্থান দেওয়া হল। লেখাটি ইংরেজি থেকে অনুদিত।]

একদিন বাগদাদের এক বণিক তার ভৃত্যকে বাজারে পাঠাল কিছু খাবার জিনিসপত্র কিনে আনতে। একটু বাদেই ভৃত্যটি ফিরে এল একদম ফ্যাকাসে হয়ে, কাঁপতে কাঁপতে। বলল, প্রভু, এইমাত্র আমি যখন বাজারের ভেতর গেছি, তখন ভিড়ের মধ্যে একটা মেয়েছেলে আমায় হঠাৎ ধাক্কা মারল। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি, যে আমায় ধাক্কা মেরেছে —ও নিজে সাক্ষাৎ মৃত্যু! ও আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ানক সব অঙ্গভঙ্গি করল। প্রভু, এক্ষুণই আপনার ঘোড়াটা আমায় ধার দিন, ভাগ্যের করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে আমায় এখান থেকে পালাতেই হবে। আমি অনেক দূরে সামারাতে চলে যাব, মৃত্যুর সাধ্য নেই সেখানে আমায় খুঁজে বের করে।

বণিক তার ঘোড়াটি ভৃত্যকে ধার দিল। তৎক্ষনাৎ ও সেটার পিঠে চেপে বসল। পা-দানির তীক্ষ্ন ফলা দু'টি ঘোড়াটির পেটের দু'পাশ সজোরে চেপে ধরল। আহত ঘোড়া ওকে নিয়ে তীরের বেগে দূরে মিলিয়ে গেল।

তারপর সেই বণিক এল সেই বাজারে। আর সেখানে এসে ভিড়ের মধ্যে আমায় ও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। কাছে এসে ও আমায় জিজ্ঞেস করল, তুমি একটু আগে আমার ভৃত্যকে এখানে দেখতে পেয়ে ওভাবে ভয় দেখানো-সব অঙ্গভঙ্গি করলে কেন? আমি বললাম, ওটা ভয় দেখানোর কোনও ব্যাপারই নয়। আসলে সবটাই ছিল একটা চমকের শুরু। আমি নিজেই এ-সময় এখানে ওকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেছি! কারণ, আজ রাতেই আমার সাথে ওর সামারাতে দেখা হওয়ার কথা।

বুড়োগিন্নি

Old Wife

(Morley Jamieson, Scotland)

['মোরলি জেমিসন' স্কটল্যান্ডের এক অখ্যাত অপরিচিত লেখক। প্রায় এক শতাব্দী আগে রচিত ওঁর এই ছোটগল্পটির আবেদন বিশ্বজনীন ও কালজয়ী,— অনেকটা মপাসাঁ-র গল্পের স্টাইলে রচিত। A world of Great Stories সংকলনটি থেকে গল্পটি নেওয়া হয়েছে, প্রকাশক Crown Publishers-এর কাছে ঋণী রইলাম, অনুবাদক।]

"জেনি", ফোকলা মাড়ি ঘষতে ঘষতে বুড়োগিন্নি বলতে লাগল,— "জেনি , আমার বয়সডাতো আর কম অইল না। আর কয়ডা দিন সংসারে টিক্যা থাকুম জানি না। যাওনের আগে পোলাডার একটা গতি দেইখ্যা গেলাম না। ডোড-রে একলা ফেলাইয়া যাইতে অইব মনে অইলেই চোখে জল আইয়া পড়ে, বুকখান ফাইট্যা যায় আমার!"

কথাগুলি শুনে কাজের মেয়ে জেনি মুখ-বিকৃতি করে বুড়ির দিকে তাকাল একবাব। গত দশবছর ধরে এই একই কথা শুনতে শুনতে ওর কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখনও বুড়ি ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলেছে,"জেনি , তরে যদি পোলা-ডা নিজের মুখে কয়, তবে তুই আমার ডোড-রে বিয়া করবি?"

এই কথাগুলি কিন্তু বুড়ির মুখ থেকে এই প্রথম শুনতে পেল জেনি। ও তখন উনুনের পাশে বসে ঝাঁঝরিটা পরিষ্কার করছিল। পাকা চুলে ঢাকা পড়া বুড়ির জীর্ণ-শীর্ণ মুখটার দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখল জেনি। ঠিকই বলছে বুড়ি, ওব যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

"হ, করুম অনে," নির্বিকার উত্তর দিল জেনি। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল।

সন্ধের দিকে ওর ছেলে ডোড খেতের কাজ সেরে ঘরে ফিরে এল। ছেলেকে দেখে যেন বেশ খুশি হল বুড়ি। ছেলের বয়স এখন সাতচল্লিশ। বুড়ি মনে মনে খুব আশ্বস্ত ও আনন্দিত বোধ করছিল এই কথাটা ভেবে যে, বুড়ো বয়সেও তার ছেলে তাকে এমন আদর-যত্ন করে বাড়িতে রেখেছে, কোনও এতিমখানা বা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়নি। বুড়িও অবশ্য অনেক আদর দিয়ে ছেলেটাকে মানুষ করেছে। মরবার আগে ছেলেটার একটা বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেই বুড়ির সব সাধ-আহ্লাদ পূরণ হবে। বুড়ির মনে স্থির বিশ্বাস, জেনি ওর ছেলেকে বিয়ে করতে অবশ্যই রাজি হবে। মেয়েটার স্বভাব একটু খুঁতখুঁতে হলেও এই ব্যাপারে ওর কোনও আপত্তি থাকবে, মনে হয় না। বুড়ির বিশ্বাস , ওর ছেলে ডোড-ও জেনির মতো বাড়ির কাজের মেয়েকে বিয়ে করতে নিশ্চয়ই গররাজি হবে না।

জেনি একটু ঘরের বাইরে গেলে বুড়োগিন্নি সুযোগ বুঝে ওর ছেলের কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা রাখল। প্রথমে ডোড যেন একটু অবাকই হয়ে গেল। এরপর অবশ্য ওর গোঁফের ফাঁকে একটু মুচকি হাসি খেলে গেল। বুড়ো মা যদি শান্তি পায় তবে ডোড অবশ্যই জেনিকে বিয়ে করবে। মাকে বলল, সে নিজেও কিছুদিন ধরে এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছে। জেনির বয়সটা আরও একটু

কম হলে অবশ্য ভাল হত, তবু সবদিক বিবেচনা করলে ঠিকই আছে।

জেনি ঘরে ফিরে আসার পরই ওর সাথে বুড়োগিন্নি ও তার ছেলে ডোড-এর বিস্তারিত কথা-বার্তা হয়ে গেল বিয়ের ব্যাপারে। সবকিছু পাকা হতেও বিশেষ সময় লাগল না। বুড়ি জানিয়ে দিল, তার সব সঞ্চিত অর্থ ওদের বিয়েতে উপহার হিসেবে সে দিয়ে দেবে। বুড়ির সঞ্চয় অবশ্য সাকুল্যে মাত্র-ই পাঁচ পাউন্ড। বুড়ির ধারণা ওইটুকু অর্থই ওদের বিয়ের সব খরচাপাতির জন্য যথেষ্ট।

জেনি কিছুক্ষণ বাদে শুতে চলে গেল ওর বিছানায়। বুড়োগিন্নিও ঘুমিয়ে পড়েছে। ডোড তারপর একা একা উনুনের আঁচে বসে মনের সুখে পাইপ টানতে লাগল। দিবাস্বপ্নের মতো কেমন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল ও। এতদিন ওর জীবনটা কেটেছে মদের নেশায়। মনে হচ্ছে আর একটা নতুন নেশার বস্তু এবার ওর জীবনে আসবে। এদিক-ওদিক অনেক ভাবনাই ওর মনে খেলে যেতে লাগল। জেনিকে ওর যথেষ্ট ভালই লাগে এবং সবদিক দিয়ে ঠিকঠাকই মনে হয়। আর তা ছাড়া কাউকে-না কাউকে তো জীবনে ওর খুবই প্রয়োজন। বুড়োগিন্নি এখন আর ছেলের সব ব্যাপারে খেয়াল রাখতে পারে না ঠিকই, তবু ছেলের ওপর ওর যথেষ্ট আধিপত্য এখনও আছে। সব সত্ত্বেও ডোড-এর মনে হয়, একজন শক্ত সমর্থ কেউ যদি ওর পেছনে থাকে, তবে হয়ত জীবনটা অনেক সহজ হবে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে জেনি কিন্তু যথেষ্ট মনের জোর রাখে। এসব ভাবনা-চিন্তা মাথায় নিয়ে ডোড বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল ছটায় খাবার টেবিলে জেনির সাথে মুখোমুখি দেখা হতেই ডোড কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল। পাশের ঘরে বুড়োগিন্নি তখনও ঘুমোচ্ছে, ওর শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডোড আড়চোখে জেনিকে খেয়াল করে যাচ্ছে। আরও একটু মোটা হলে জেনিকে হয়ত ভাল দেখাত, ও মনে মনে ভাবল। বিয়ের দিন না-জানি কেমন লাগবে জেনিকে দেখতে। ওদের দু'জনের মধ্যে অবশ্য কোনও কথাবার্তা হল না। প্রাতরাশ সেরে ডোড কাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল।

জেনি ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "পাইপ আর দেশলাইখান সঙ্গে লইছ?"

"হ, লইছি।"

"তাইলে আইও গিয়া।"

"আইতাছি।"

বাড়ির গেটটা খুলে ডোড বেরিয়ে গেল। নভেম্বরের কন-কনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে বাইরে। এরই মধ্যে ডোড এগিয়ে গেল খামার বাড়ির ভেতর দিয়ে আস্তাবলের দিকে। সেই সাত-সকালে ও-ই সবার আগে কাজে এসেছে খামারে। ও প্রথমে গিয়ে বাতিগুলি সব জ্বালিয়ে দিল। খামারের নায়েব আজকাল কাজে আসছে না, ওর কাজকর্মও ডোডকেই দেখতে হয়। কিছুক্ষণ বাদেই বাকি তিনজন চাষের মজুর ও একটি কাজের ছেলে এসে পড়ল। সব সাজ-সরঞ্জাম জড় করে ওরা ঘোড়াগুলিকে তৈরি করে গাড়ির সাথে জুড়ে দিতে লাগল। ডোড ওদের সাথে নানা ঠাট্টা-তামাশা, গাল-গল্প করত অন্যান্য দিন। আজ ওর মন চাইছিল জীবনে যে নতুন চমকপ্রদ ঘটনা ঘটতে চলেছে, তা নিয়ে সঙ্গীদের কিছু বলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওর মনে হল, আরও কিছুদিন ব্যাপারটা নিয়ে কথা না-বলাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কিছুক্ষণ বাদে ডোড ওর ঘোড়াগুলিকে নিয়ে রওনা দিল খেতে গিয়ে হাল চষতে। একটা

ঘোড়ার পিঠে ও নিজে সওয়ার হয়ে বসে মনের আনন্দে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল। যা কিছু দেখছে, যা কিছু করছে সবেতেই ওর মন যেন আজ খুশিতে ভরে উঠছে। ওর বিয়ে হতে চলেছে, শেষ পর্যন্ত বিয়ে একটা হচ্ছেই। এই চিন্তাটাই ডোডকে এক নতুন আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গুনগুনিয়ে মনের সুখে ও সারাক্ষণ কিছু গেয়ে চলেছে। সারাটা মাঠ হাল দিয়ে চষে বেড়াচ্ছে, আজ কোনও ক্লান্তিই যেন ও অনুভব করছে না। চারপাশে সব কিছুই যেন ছবির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।

ক্রমে শীতের সন্ধ্যা নেমে এল। ডোড এবার বাড়ি ফিরে গেল জেনি আর মার কাছে। ঘরে যেন একটা নতুন উজ্জ্বলতা, ওর মাকেও দেখাচ্ছে বেশ উৎফুল্ল, অন্যান্য দিনের মতো জেনিকেও যেন ততটা নিরাসক্ত ও নীরস মনে হচ্ছে না। তিনজনে মিলে অনেক চিন্তা-ভাবনা আর পরিকল্পনা করল সামনের দিনগুলি নিয়ে। একই নিয়মে একই ব্যাপার চলতে থাকে পরের দিন, তারও পরের দিন, দিনের পর দিন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই অনেক কিছু যেন পাল্টে গেল। জেনিকে দেখলে মনে হবে ওর বয়সটা যেন হঠাৎ তিন-চার বছর কমে গেছে। প্রতিবেশীরা বুড়োগিন্নির মধ্যেও অনেক পরিবর্তন দেখতে পেল। ওর সেই পুরনো কাশিটাও যেন আগের মতো ততোটা তীব্র নেই। বুড়ি যতই মেজাজ-মর্জি দেখাক, জেনি আগের মতো আর তেমন বিরক্তি প্রকাশ করত না। বয়সের সাথে সাথে বুড়ো মানুষরা ওরকম একটু খিটখিটে হতেই পারে। ডোডও জেনির মন জয় করতে নানাভাবে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করল —যদিও সবই একটু গেঁয়ো কায়দায়। মাঝে মাঝে দু'জনে মিলে পাশের গ্রামে চলে যেত সিনেমা দেখতে।

প্রত্যাশা মতই নতুন বছরে ডোড আর জেনির বিয়ে হয়ে গেল, বুড়োগিন্নির দেওয়া সেই পাঁচ পাউন্ড সম্বল করে। সবটা টাকা অবশ্য খরচ হয়ে যায়নি, কারণ অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। ডোড-এর সঙ্গী ক'জন হাল-চাষি আর অল্প ক'জন বন্ধু-বান্ধব বিয়েতে এসেছিল। সামান্য কিছু নাচ-গান আর মদ্যপানের পরই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ উদ্দাম গ্রাম্য নাচ নেচে ডোডও হাঁপিয়ে উঠল। তারপর সবাইকে বিদেয় জানিয়ে জেনিকে সঙ্গে নিয়ে, ও বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।

বাড়ি পৌঁছে ওরা দেখল বুড়োগিন্নি ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওরা দু'জনে উনুনের কাছে গিয়ে পাশাপাশি বসল। ওদের মুখ থেকে কোনও কথা সরছিল না। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন অচেনা ও ভারাক্রান্ত। দু'জনেই যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। ওরা অনেকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি বসে রইল। হঠাৎ ডোড উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "জেনি, মা অখন যে ঘরডাতে থাকে, ওই ঘরডা তুমি তোমার নিজের লেইগ্যা নিয়া নিও। কেমুন?"

জেনিও উঠে দাঁড়াল। ওর চুলগুলি পেছন দিকে টেনে বাঁধা, অনেকটা পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। ও মুখে কিছু বলল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানল ডোড-এর প্রস্তাবে। তারপর সোজা তার স্বামীর কামরায় ঢুকে গেল। যেন কিছুটা চিন্তিত ভাবেই ডোডও জেনির পেছন পেছন ভেতরে চলে গেল। বিয়ে ব্যাপারটা সত্যি কেমন বিচিত্র, সবকিছু কেমন যেন পাল্টে দেয়।

ওদের জীবন অবশ্য আগের মতোই কাটতে লাগল, খুব বড় একটা পরিবর্তন হল না কোনও কিছুতে। আগে বাড়ির কাজের লোক হিসেবে বেশ পরিশ্রম করতে হত জেনিকে। আজকাল সেই

কাজের চাপটা অবশ্য কিছুটা কমেছে, একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করার সময়ও তার জোটে। এই সামান্য পরিবর্তনগুলি বুড়োগিন্নির নজর এড়ায়নি। জেনি নিজে অবশ্য এনিয়ে আলাদাভাবে তেমন কিছু অনুভব করত বলে মনে হত না। মাঝে-মধ্যে বুড়ি ওকে এটা-ওটা ছোট খাটো ফরমাশ দিয়ে ব্যস্ত রাখত, কিছুটা নিজের কর্তৃত্ব জাহির করার জন্যই। হয়ত বুড়ি হাঁক ছেড়ে বলবে, "ওই মাইয়া, আমারে এট্টুখানি খাওনের জল দিয়া যা।" জেনি হয়তো তখন কোনও একটা কাজে ব্যস্ত, বুড়ির কথার উত্তরই দেবেনা। কিংবা হাত খালি থাকলে গজগজ করতে করতে বুড়িকে জল দিয়ে যাবে। ব্যাপারটা বুড়িও সহজে মেনে নেবে না, চড়া গলায় জেনিকে দু'চারটা কথা শুনিয়ে ছাড়বে। জেনিও বুড়িকে ছেড়ে দেবে না, কটা কড়া কথা সেও বলে দেবে। ছোটখাটো খিটিমিটি দু'টি মেয়েমানুষের মধ্যে লেগেই থাকত।

বুড়োগিন্নির মেজাজ ইদানীং প্রায়ই খিটখিটে হয়ে থাকত। বুড়ি নিজেও বুঝে উঠতে পারতনা, সবকিছুই এমন বিরক্তিকর কেন লাগত। আসলে সংসারে দীর্ঘদিনের অধিকার ও কর্তৃত্ব হারিয়ে বেচারা মনে মনে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ছেলে ডোড বা তার বৌ জেনিকে যে বুড়ি খুব হিংসে করত, তা নয়। বুড়ির প্রায়ই মনে হত, ছেলের জীবনে জেনি আসার পর সংসারে ওর স্থান ও অধিকার যেন হঠাৎই কেমন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জেনি অবশ্য একটি অনুগত স্বামী আর ঘর পেয়ে জীবনে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। বুড়ির মাথায় নতুন চিন্তা এবং ভয় , বুড়ো ও গরিব মানুষের শেষ আশ্রয় কোনও এতিমখানা বা হাসপাতালে না শেষপর্যন্ত তাকে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়!

বৃদ্ধাশ্রম বা এতিমখানাকে বুড়োগিন্নি বড্ড ভয় পায়। অনেক খারাপ কথা শুনেছে এই জায়গাগুলি সম্পর্কে। ওর ছেলে ডোড এতদিন ধরে বুড়ো মাকে আদর যত্নে নিজের কাছে আগলে রেখেছে। বুড়িরও এই বাড়ির সব কিছুর ওপর একচ্ছত্র অধিকার ও আধিপত্য ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সব হিসেব যেন পাল্টে গেল। আজ জেনি সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে। বুড়োগিন্নি বেশ বুঝতে পারছে, ওর সব ক্ষমতা বেহাত হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ও হেরে যাচ্ছে সব ব্যাপারে।

ঘরের ভেতরকার সব কিছু আর চারপাশে ছড়ানো নানা প্রিয় জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে , বুড়ি হারিয়ে যেত তার ফেলে আসা অতীতে। সবকিছু কেমন পাল্টে গেল। অতীতের অজস্র সুখস্মৃতি আর আবেগ বুড়ির মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত। বড়ো দুঃখ বুড়োগিন্নির মনে, হারিয়ে যাওয়া সেই আনন্দের দিনগুলির জন্য এবং সেইসাথে নিজের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের জন্যও।

বুড়ির বিছানায় পাতা থাকত পুরনো একটি ছক-কাটা পশমি-কম্বল। একদিন জেনি সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভাঁজ করতে লাগল। সেদিকে নজর পড়তেই বুড়োগিন্নি বলে উঠল,"কম্বলখান কিন্তু খুব ভাল জিনিস। তেইশ বচ্ছর আগে ডোডের বাপে এইখান কিন্যা আনছিল প্লেন্ডার-লিথের মেলা থেইক্যা।"

"কী যে ওলডা কতা কও। ডোডের বাপে এই কম্বল চোখেও দেখে নাই। এই জিনিসখান আমিই সঙ্গে কইর‍্যা নিয়া আইছিলাম," জেনি রেগে উত্তর দিল।

"কী কইলা? তুমি কম্বলখান আনছিলা? আমি তো জনমেও এইরম কতা শুনছি না!"

"যত কতা-ই কও, কম্বলখান আমারঅই, পষ্ট জাইন্যা রাইখ-অ।"

"ও-ই কতা মুখেও আইনো না, কইয়া দিলাম।"

"হ, আমার-অইতো কম্বলখান।"

"না, কইলাম যে।"

"হ আমার অই!"

ওরা দু'জনেই এভাবে কিছুক্ষণ চেল্লাচেল্লি করে শেষে চুপ হল। জীবনের শেষ আশ্রয়স্থল ওর বিছানাটা এভাবে এলোমেলো হয়ে যেতে দেখে বুড়োগিন্নি কান্নায় ভেঙে পড়ল। পাশে দাঁড়িয়ে জেনিও যেন একটু ঘাবড়ে গেল বুড়ির কান্না দেখে। ওর মনে হল, ব্যাপারটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি-ই হয়ে গেছে। ওদের দু'জনের এমন ঝগড়া আর চেঁচামেচি দেখে ডোডও বেশ অবাক হয়ে গেল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না, কীভাবে ওদের ঠান্ডা করা যায়, কিংবা দু'জনের মধ্যে কার পক্ষ তার নেওয়া উচিত।

"হায়লো আমার পুড়াকপাল! কুনুদিনও ভাবছি না আমার ঘরের মইধ্যে আমারে কেউ এইরম কতা শুনাইয়া যাইব। তোর বাপে আমার গতরে একটা ফুল-টুক্কিও পড়তে দিছে না। ওই মানুষডা থাকলে আমারে আইজ এই সকল কতা কওনের সাহস কেউর অইত না," জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে নাকি সুরে বুড়োগিন্নি ছেলের উদ্দেশ্যে বলল। "আইজ এই বাড়িডাতে আমার থাকনের এট্টু জায়গা জুডে না। আমার বুঝনের আর বাকি নাই, এইবার আমার এই বাড়িডা ছাইড়া যাওনের দিন আইয়া পড়ছে।"

মায়ের ওইসব কথা শুনে ডোড-এর একটু রাগ হল। ওকে রাগতে দেখে জেনি পিছিয়ে গেল।

বুড়োগিন্নি ওর বিলাপ চালিয়ে যেতে লাগল। ছেলে ভাবল, বুড়ো হলে সব মানুষের এই অবস্থাই হয়। মাকে কোথাও কি পাঠিয়ে দেওয়া যায় না? এই বাড়ির বাইরে কোথাও? কোনও এক এতিমখানা বা বৃদ্ধাশ্রমে? প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু পয়সা বুড়ির হাতে দিলেই হবে, ওর বাকি দিন ঠিকই কেটে যাবে। সে সমস্ত জায়গায় হয়ত এমন কিছু লোকও জুটে যাবে, যারা বুড়িকে সঙ্গ দেবে, সাহায্য করবে।

বুড়োগিন্নির অভিযোগের আর শেষ নেই, নানা কথা নিয়ে সারাক্ষণ ঘ্যান-ঘ্যানানি চালিয়ে যেত। এ নিয়ে ছেলে ডোড ক্রমেই ধৈর্য হারাতে শুরু করল। বুড়ির একটা হিল্লে করতেই হবে এবার।

সপ্তাহখানেক বাদের কথা। সকালবেলা ডোড তখন ওর ঘোড়াটাকে সাজ পরিয়ে কাজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ওর পাশেই আরও একটি যুবকও তার ঘোড়াকে তৈরি করতে ব্যস্ত। স্বভাবে বাচাল ওই যুবকটির নাম স্যান্ডি। ও জিজ্ঞেস করল, "ডোড, তোমার বুড়ি মা-এর শরীলডা আইজ-কাইল কেমন থাকে?"

ওর ঘোড়ার গায়ে একটা ফিতে আঁটতে আঁটতে ডোড উত্তর দিল, "তেমন খারাপ কওন যায় না। তবে আইজ কাইল কষ্টডা একটু বেশি-অই পাইতাছিল। হকল দিক ভাইব্যা, শেষ পয্যন্ত গতকাইল এতিমখানাতেই গিয়া ভরতি হইয়া গেছে আমার মায়।"

"ঠিক কতা-নি? বেপারটা বুধয় জেনির লেইগ্যা ভাল-অই অইল।" ছেলেটা ডোডকে বলল। তারপর নিজের ঘোড়াটার পাছায় জোরে চাটি মেরে বলল ও, "ওইঠ্যা দাঁড়া বেইস্, বুড়ি মাদি কুনখানের! গতরখানা আর যে তর চলে না, আমি বুঝি। আমি বুঝি, বাতের জ্বালায় তর বুইড়া

শরীলখান অবশ অইয়া আইতাছে। ওইঠা পড়, ওইঠা পড়! বেশি তেণ্ডার নেণ্ডার করলে শেষে কিন্তুক কসাইখানায় চালান অইয়া যাইবি কুনুদিন!"

ছেলেটার চাটি খেয়ে ওর বুড়ো ঘোড়াটা অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল, হেলেদুলে চলতে শুরু করল। ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে ডোডকে আবার বলল, "আসল কথাডা অইল, এই বুইড়া বয়সে অচল মানুষজনের বাড়ির মইধ্যে পাইড়া না-থাকন-অই ভাল-অ। তোমার মা যে নিজের থেইক্যা এতিমখানায় চইলা গেছেন, সেইডাতে হকলেরই মঙ্গল অইল।"

ওর ঘোড়া দু'টোর গলার দড়ি টেনে ধরে, ডোড উত্তরে ছেলেটাকে বলল, "হ, ঠিক কতাই কইছ। জীবনের শেষকালে এতিমখানা বা আশ্রমের থেইক্যা ভালঅ আর কিছু অইতে পারে না।"

ডোডে-এর পেছন পেছন ওর ঘোড়াগুলি, খট্-খট্ শব্দ করতে করতে, আস্তাবল থেকে খেতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল নিত্য দিনের মতো।

পাহাড়ের সন্তান

Hillbred

(Arreph El Khoury, Syria)

'হাসবায়া' সিরিয়ার একটি ছিমছাম ছোট্ট শহর। ওখানকার অধিবাসীরা আদর করে বলত, "ভূ-মধ্যসাগর আর হেরমোন পাহাড়ের মধ্যবর্তী সবচাইতে বড় ছোট্টশহর।" নদীর দু'পাশে গড়ে ওঠা শহরটাতে সবুজে ঘেরা সুন্দর বাড়িগুলো সাদা আর ধূসর পাথরে তৈরি। এর মধ্যে যে বাড়িটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, সেটা হল সেখানকার সচিবালয়। বেশ বড় চত্বর জুড়ে বাড়িটা। এই বাড়িটা বানিয়েছিল তুর্কীরা। বিশ্বযুদ্ধের পর মহামান্য রাজা ফয়জুলের আমলে বাড়িটা আরবদের অধিকারে চলে আসে। আর অতি সম্প্রতি ফরাসীরা হাসবায়া দখল করার পর এটা এসে গেছে লেবানীয়দের অধিকারে।

তখন বসন্তের দিন। সিরিয়ার উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে সমুদ্রের স্বচ্ছ সবুজ জল। নীলাভ পাহাড়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে সমুদ্রের উষ্ণ বাতাস। ঠিক তখন কাশিদ নামে এক যুবক আর হিন্দ্ নামে একটি মেয়েকে দেখা গেল সচিবালয়ের প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে। একটি লেবানীয় প্রহরী পাথরের মূর্তির মতো বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশদ্বারে।

ওরা দু'জনেই খুবই সাধারণ জামা-জুতো পরে আছে, নিজেদের ঘরে বা গ্রামেই তা তৈরি। ছেলেটির গায়ে একটি নকশা করা জ্যাকেট্ আর ঢিলেঢালা নীলচে রঙের একটা পাজামা। ওর

কোমরে বাঁধা আছে এক ফালি কালচে-নীল রঙের সিল্ক যেটা থেকে ঝুলছে একটা বাঁকানো ছুরি। আর ওর সঙ্গের হিন্দ্ নামে মেয়েটির গায়ে নীল পোষাক ও কালোকোট। ওর চোখে সুরমার পোঁচ, আর হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলো লাল করেছে হেনা লাগিয়ে।

সচিবালয়ের ভেতর দিকে যেতে যেতে ছেলে-মেয়ে দু'টি চারপাশের সব কিছু খেয়াল করে দেখছিল কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে। রাস্তার পাশেই রোদের মধ্যে বসে আয়েশ করছিল ক' জন সৈনিক। এদের দেখা মাত্রই ওরা দু'জন অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল, যেন ভূত দেখেছে!

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ওরা এগিয়ে চলল। করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ওরা একটু থমকে দাঁড়াল, ডাইনে-বাঁয়ে খেয়াল করে দেখল। ছেলেটির চোখে পড়ল পরপর ক'টি দরজা। মেয়েটিকে পেছন-পেছন আসতে ইশারা করে ছেলেটি এগিয়ে গেল দরজাগুলোর দিকে। প্রত্যেকটা দরজায় তার ভেতরকার দপ্তরের নাম লেখা আছে। ওরা যে দপ্তরটার খোঁজে এসেছে তার নাম কোথাও নেই। হতাশ হয়ে ওরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত একটা সিঁড়ির তলায় গিয়ে পৌঁছলো। আর কোথাও কিছু না দেখে ছেলেটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। মেয়েটি নীরবে তার পেছনে চলেছে। দোতলায় উঠে বাঁদিকে তাকাতেই ওরা পেয়ে গেল কেরানির ঘর। এই কেরানিবাবুর কাছেই ওরা এসেছে। কাশিদ পেছনে দাঁড়ানো হিন্দ্-কে ইঙ্গিত করল ঘরের ভেতর যেতে। মেয়েটি আগে ছেলেটিকে ভেতরে যেতে বলল।

সহজ, সরল এবং ভীতু পাহাড়ি সন্তান ওরা। দরজার সামনে পৌঁছে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ছেলে ও মেয়েটি।

মেয়েটি কাশিদকে আবারও বলল, "কী হল? তোমার কাছে তো ছুরিটা রয়েছে, তুমিই আগে ভেতরে যাও।"

কাশিদ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দ্ ওর দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছে। ছেলেটি শিশুর মতো একটু হাসল। মেয়েটি ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কাশিদ ওর মাথাটা হিন্দ্-এর মুখের কাছে নিয়ে গেল। দু'জনেই চুপচাপ। মেয়েটি প্রথম কথা বলল, "আমরা এখন কী করব?"

"আল্লার নামে বলছি, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না", কাশিদ উত্তর দিল। ওরা দু'জন দু'জনের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দু'জনেই দোরগোড়ায় বসে পড়ল।

একটু বাদেই ওদের সামনে হাজির হল ইউরোপীয় পোষাকে এক ভদ্রলোক। প্রথমে ওরা দু'জনেই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওদের দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, "কী করছ এখানে? কী চাই তোমাদের?"

ওরা একসাথে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমরা এই ঘরটার ভেতরে যেতে চাই, কেরানিবাবুর সাথে আমাদের দরকার।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আমিই কেরানিবাবু। ভেতরে এসো।" প্রথমে ভদ্রলোক আর তাঁর পেছন পেছন ওরা দু'জন ঘরের ভেতর ঢুকল।

ভদ্রলোক অফিসের ভেতর গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করলেন, "বলো, তোমাদের জন্য কী করতে পারি?"

"আমরা বিয়ের অনুমতিপত্র চাই।"

ওদের কথা শুনে কেরানিবাবু একটু হেসে ওর টেবিলের দেরাজ খুলে একটি কাগজ বের করে কাশিদকে দিয়ে বললেন, "এই ফর্মটা ভর্তি করে দাও।"

কাশিদ কাগজটা হাতে নিয়ে পাশের একটা টেবিলে গিয়ে বসল। হিন্দ্ ও তার পেছন পেছন গেল। টেবিলে কালি-কলম সবই রাখা আছে। ফর্মটা একবার পড়ে নিয়ে কাশিদ লিখতে শুরু করল। খুবই কাঁচা হাতের লেখায় কাশিদ কাগজটির মধ্যে সব তথ্য লিখে দিল, দু'জনের নাম, বয়স, জন্মস্থান, মা-বাবার নাম, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই লিখতে হল।

লেখার কাজ শেষ হলে কাশিদ উঠে দাঁড়াল এবং কেরানিবাবুর টেবিলের দিকে গেল। হিন্দ্ আছে ওর পেছন পেছন। শেষে কেরানিবাবুর হাতে ও কাগজটা দিল।

ভদ্রলোক কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "দেখো বাছা, তোমার বা ওর বিয়ের বয়সই তো হয়নি এখনও।"

"আল্লাহু আকবর! বিয়ে করার জন্য আমাদের কত বয়স হতে হবে?" দু'জনে সমস্বরে জোরে-জোরে বলে উঠল।

আইন মোতবেক বিয়ের সময় ছেলে-মেয়েদের বয়স কত হতে হবে, তা কেরানিবাবু ওদের দু'জনকে বুঝিয়ে বলে দিলেন।

"কিন্তু আমাদের সেই বয়স না-হলেও আমরা দু'জনেই তো এখন বিয়ে করতে চাই।" সরল পাহাড়ি ছেলে-মেয়ে দু'জনে আবার একই সাথে বলে উঠল। এবং বলল বেশ জোর দিয়েই।

"সেই যদি হয়, তবে তোমাদের মা-বাবাকে আগে এই কাগজে সম্মতি দিয়ে দস্তখত করতে হবে," কেরানিবাবু ছেলেটির হাতে কাগজটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন।

"কিন্তু আমাদের তো বাবা-মা নেই, আমরা এতিম। গতযুদ্ধে ফরাসী দখলদাররা আমাদের বাবা-মায়েদের খুন করেছে।"

"ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। তবে তো তোমাদের অপেক্ষা করতেই হবে বিয়ের বয়স না হওয়া পর্যন্ত।"

হতাশ ও বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কাশিদ কেরানিবাবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হিন্দ্ ওর পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর হাতের কাগজটি কাশিদ কেরানিবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল।

কাশিদ ডান হাতটা তার কোমরে বাঁধা ছুরিটার ওপর রাখল আর বাঁ হাতে ধরল মেয়েটির একটি হাত। কেরানিবাবুর ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে গেল দরজা ঠেলে।

হতাশ ছেলেটি মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে বলল, "আল্লাহ্ কখনও এমন কথা কেতাবে লেখেননি।"

ব্যভিচার

Adultery

(Enrique Lopez, Peru)

[গল্পটি পেরুর আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের নিয়ে]

ট্যাক্না থেকে বাড়ি ফিরে কার্মেলো মাকেরার মনে হল, ওর স্ত্রীর মধ্যে যেন এক বিচিত্র পরিবর্তন এসেছে। বাড়ি থেকে যাবার সময় সে রেখে গিয়েছিল কর্মঠ স্ত্রীকে। ফিরে এসে ও দেখতে পাচ্ছে সেই মেয়ে মানুষটাই কেমন যেন অলস হয়ে গেছে, কোনও কাজেই আর যেন উৎসাহ পায় না। আগের মতো সুতো কাটার মাকু চালাতে পারে না, আগের মতো সেই সুস্বাদু রান্না করাও যেন একদম ভুলে গেছে। সব সময় স্ত্রীলোকটি ঝিমোচ্ছে, স্বামীর কোনও কথাই যেন ঠিক-ঠাক কানে পৌঁছয় না।

কী হলো স্ত্রী ইসিডোরার? ইন্ডিয়ান স্বামীটির দুশ্চিন্তা দিন-তো-দিন বেড়েই চলে। আগে একই বিছানায় ঘনিষ্ঠ হয়ে দু'জন পাশাপাশি ঘুমোত। এখন মেয়েছেলেটি আলাদা বিছানায় শুতে যায়। ওর এমন আচার-ব্যবহারে স্বামীটির মাথা ক্রমেই গরম হতে থাকে। মাঝে মাঝে কার্মেলো বাড়ি ফিরে দেখতে পেত, ওর স্ত্রী দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছে। অনেক চেঁচামেচিতেও দরজা খুলত না। হয়ত সারারাত ঠান্ডার মধ্যে বাইরে কুকুরদের সাথেই বেচারা স্বামীটিকে রাত কাটাতে হত।

ইন্ডিয়ান লোকটি ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। যেভাবেই হোক স্ত্রীর এমন আচরণের একটা বিহিত করতেই হবে। ধর্মপিতা কালাস্তার কথা ওর মনে পড়ল। একমাত্র এই প্রাজ্ঞ লোকটির কাছেই ও মুখ খুলে সব কথা বলতে পারবে। তিনিই সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। বুদ্ধিমান এই মানুষটি থাকেন তারাতা নামে একটা গ্রামে।

স্ত্রী ইসিডোরার এ ধবনের পরিবর্তনের পেছনে কি কোন অমঙ্গলসূচক ঘটনার প্রভাব পড়েছে? ইন্ডিয়ান লোকটির মাথায় অনেক চিন্তা খেলছে। ওর বাড়ির ওপর দিয়ে কি কোনও চড়াই বাজপাখি উড়াউড়ি করে গেছে? নাকি কোনও ধূর্ত শেয়াল চুপিসারে খাবারের থালা চেটে গেছে?

সব সময় এসমস্ত চিন্তা কার্মেলোর মাথাটা গরম করে রাখত। সেদিন ও আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। নিজের গরুগুলোকে মাঠে ফেলে রেখেই বাড়ি চলে এল দুপুরে। এসে দেখল ওর স্ত্রী নাক দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে আর পেটিকোটে চোখ মুছছে।

"তুমি কাঁদছ? কী হয়েছে তোমার? কোনও খারাপ জিনিস কি তোমার চোখে পড়েছে? এমন কেউ কি মারা গেছে, যাকে তুমি আমার চাইতেও বেশি ভালবাসতে?"

"আরে না, ওসব কিছুই নয়। চোখে ধোঁয়া লেগেছে। চুলাটা থেকে আজ একটু বেশি ধোঁয়াই বেরুচ্ছে।"

"কিন্তু আগে কখনও তো এর জন্য তোমার চোখে জল দেখিনি এভাবে। ঠিক করে বলো তো, অন্য কোনও ব্যাপার নিয়ে তোমার মনে কোনও অস্থিরতা চলছে না তো?"

"হতেও পারে।"

"আমি কি এর কোনও প্রতিকার করতে পারি?"

" মোটেও না। আসলে এটা কোনও শারীরিক কাটা-ছেঁড়া বা আঘাতের ব্যাপার নয়।"

"ব্যাপারটা তবে কী?"

"আমি জানি না, কীভাবে তোমায় সব খুলে বলব ...।"

" সেই ধূর্ত শেয়ালটা কি তবে আবার তোমার পিছু নিয়েছিল?"

"তার চাইতেও খারাপ কিছু ঘটেছিল। সেই শয়তানটা আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল।"

"তুমি কী করলে?"

"আমি কিছুই করে উঠতে পারিনি। আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে লোকটা! আমি তোমার বিশ্বাসকে প্রতারণা করেছি।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে কার্মেলো তার স্ত্রীকে বলল, "কী বললে? ব্যভিচার? তুমি?"

"একটু সময় দাও, আমি তোমায় সব বলছি।"

সাহস সঞ্চয় করে ইসিডোরা ঘটনাব বিবরণ দিতে শুরু করল। গত রোববার বিকেলের ঘটনা। কার্মেলো একটা কাজে পাশের গ্রামে গিয়েছে, তখনও ফিরে আসেনি। ওর স্ত্রী ইসিডোরা মাঠে কাজ করতে গিয়েছে। একটা বাঁধের পাশে ও মাটি কাটছিল। হঠাৎ ওর মনে হল যেন পেছনে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল পাশের বাড়ির লিওনসিও কোয়েলোপানাকে। লজ্জায়, ভয়ে ইসিডোরা দিশেহারা হয়ে গেল। ও বুঝে উঠতে পাবছিল না, ঠিক কী করা উচিত। লোকটাব দিকে তাকিয়ে ও একটু হাসবার চেষ্টা করল; ওর স্ত্রীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করল।

লোকটা কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে ইসিডোরাকে জাপ্টে ধরল। কামড়ে, খিমচে, চিৎকার কবেও কোনও লাভ হল না, শয়তানটাকে নিরস্ত করতে পাবল না ইসিডোরা।

তারপর যা যা ঘটবার সবই ঘটে গেল। ইসিডোরার কোনও ভূমিকা নেই এই পাপকাজে। ও ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারে সেটা। ধূর্ত লিওনসিওর সমুচিত শাস্তি হলেই এই পাপের একটা প্রতিবিধান হবে।

সবশেষে মেয়েটি বলল, "তখনই আমি ভেবেছিলাম, সোজা ধর্মাপিতা কালাত্তার কাছে গিয়ে সব খুলে বলে আসি। কিন্তু ভয় পেলাম, শয়তানটা নিশ্চয়ই দৌড়ে আবার আমায় ধরে ফেলবে। আমি বাড়ি ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। একা একা বাড়িতে বসে সারারাত আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, যাতে তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আস।"

স্ত্রীর এমন বিবরণ ও স্বীকারোক্তি শুনে সহজ সরল পাহাড়ি ইন্ডিয়ান পুরুষটি স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মনে তবু যেন একটা দ্বন্দ্ব, স্ত্রী ইসিডোরার কোনও ইন্ধন নেই তো ব্যাপারটার পেছনে? লিওনসিওকে কোনও ভাবে প্ররোচিত করেনি তো ইসিডোরা? শক্ত সমর্থ মেয়েছেলেটির গায়ে তো বেশ জোর আছে, হাতে একটা বেলচাও ছিল। নিজেকে শয়তানটার হাত থেকে বাঁচাতে পারল না ও? স্বামী হয়ে গায়ের জোরে সে নিজেও কোনও দিন এমন কিছু করে উঠতে পারেনি। জোর করে কিছু করার চেষ্টা করলে প্রতিহত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। তবে কি...?

স্বামী হিসেবে, পুরুষ হিসেবে মনে মনে খুবই আহত হয়েছে মানুষটা। ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা ছোরাটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল লোকটা। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "শেষ পর্যন্ত, আমার বোনের স্বামী হয়েও, ওই শয়তানটা তোমার

ইজ্জত লুটে নিল? ওর বুকের হৃৎপিণ্ডটা এবার আমার ছোরার ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হবেই। কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।"

"না, কার্মেলো, না! তুমি ওকে খুন করতে যেয়ো না। তা করলে হয়ত বাকি জীবনটা তোমায় কয়েদখানায় বন্দি হয়েই কাটাতে হবে। আমায় এখানে পড়ে থাকতে হবে সম্পূর্ণ একা। এমন আরও অনেক ব্যভিচার তখন ঘটে যাবে আমার ওপর। এই জন্যই আমি তোমায় সব কথা বলতে চাইনি। যা ঘটে গেছে তার দুঃখ আমি সহ্য করে নেব।"

"আমি যদি কিছুই না করি তবে তো ওই শয়তান লিওনসিওটা ভাববে আমি কাপুরুষ, আমি ওকে ভয় পাই। সুযোগ পেলেই লোকটা আবার তোমার ইজ্জত লুটবে। তোমায় একা ফেলে ধারে-কাছে কোথাও আমি আর যেতে পারব না।"

"তুমি অযথা এ নিয়ে ভাববে না। আবার যদি বদমাশটা আমায় আক্রমণ করে তবে আমিই ওই ছোরাটা দিয়ে ওকে শেষ করে দেব।" দেয়াল থেকে ছোবাটা একবার নামিয়ে এনে, "দেখো, আমি এরই মধ্যে ওটাকে শান দিয়ে কেমন ধারালো করে রেখেছি। আমি যখনই বাড়ির বাইরে যাই ছোরাটকে সঙ্গে নিয়ে যাই।"

স্ত্রীর এই কথাগুলি শোনার পর ইন্ডিয়ান পুরুষটির মাথা একটু ঠান্ডা হল।

তবু ওর মন বলছে, এভাবে শয়তানটাকে ছেড়ে দিলে চলবে না। একটা কিছু করতে হবে। হয় খুন, না হয় জোর কবে সবার সামনে স্বীকারোক্তি এবং সেই সাথে বড় ধরনের জরিমানা আদায়। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এবং নিজের সম্মানের কথা ভেবে একটা কিছু করতেই হবে। এমনও তো হতে পারে, গ্রামের অনেক লোকই ব্যাপারটা এরই মধ্যে জেনে গিয়েছে। এরপর সে চুপ করে থাকবে কীভাবে? ইন্ডিয়ান সমাজের আইন অনুযায়ী শাস্তি ওই শয়তানটাকে পেতেই হবে। সাদা চামড়ার লোক হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। ওদের ব্যাপারে আইন-কানুন অনেক শিথিল। প্রত্যেকটি ইন্ডিয়ানকে নিজের সমাজের প্রচলিত আইনের বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হয়। অর্থদণ্ড হলে সাথে সাথেই তা মিটিয়ে দেওয়াই নিয়ম।

লিওনসিও তার সম্মানকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে। দণ্ড তাকে পেতেই হবে। নিজের হাতে আইন নিয়ে শারীরিক শাস্তি দিতে গেলে শেষপর্যন্ত হয়ত কার্মেলোকেই জেলে গিয়ে পচতে হবে। এর চাইতে বরং ভাল পরিমাণ অর্থদণ্ডই হবে ওর উপযুক্ত শাস্তি। গরিব ইন্ডিয়ানদের কাছে অর্থাভাবের যন্ত্রণা সবচাইতে বড় যন্ত্রণা। লিওনসিওর পাপের সেটাই হবে উপযুক্ত শাস্তি।

পাড়াপ্রতিবেশী এবং আশপাশের অঞ্চলের বয়স্কদের ডেকে এনে সভা বসাতে হবে। সেই সভায় হাজির করাতে হবে লিওনসিওকে। এ সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা অবশ্য করতে হবে কার্মেলোকেই।

কার্মেলো মনে মনে ঠিক করল তার ধর্মপিতা কালাভাকে সে আমন্ত্রণ জানাবে এই সভায় পৌরোহিত্য করার জন্যে। সেই মতো প্রথম দিন সে গেল ওই বয়স্ক ও বিজ্ঞ লোকটির বাড়িতে।

স্ত্রী ইসিডোরার ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে দুশ্চরিত্র লিওনসিও সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সে জানাল তার ধর্মপিতাকে। সেইসাথে এও জানাতে ভুলল না যে, দুর্বৃত্তটাকে খুন করে ফেলার জন্যে ছোরাটা হাতে নিয়েও সে শেষ মুহূর্তে কীভাবে নিজেকে সংযত করেছে।

ধর্মপিতা কালাভা এরপর কার্মেলোকে বললেন, "বেশ! তোমার সব কথাই আমি শুনলাম

মনোযোগ দিয়ে। তুমি ছোরাটা নিয়ে যে নিজেই বিচার করতে যাওনি, সেটা অবশ্য সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। তবু লিওনসিওর সেই মারাত্মক অপরাধের মধ্যেও একটা ব্যাপার যেন পরিষ্কার হচ্ছে না। তোমার স্ত্রীর মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে জোর করে লিওনসিও পাপ কাজটা করেছে ঠিকই, কিন্তু দু'পক্ষের সম্মতি না থাকলে এমন অপরাধকে ব্যভিচার বলা যাবে না। অবশ্য ইচ্ছে না থাকলেও তোমার স্ত্রীর আর কতটুকু ক্ষমতা আছে ওই দুর্বৃত্তকে বাধা দেবার। ধূর্ত শেয়ালের সামনে পড়লে অসহায় মুরগি কী-ই বা আর করতে পারে? সাদা চামড়ার লোকেরা একটা কথা বলে থাকে, সুযোগ পায় বলেই চোরেরা চুরি করে। ধর্মপুত্র কার্মেলো, মনে রাখবে, নিজের স্ত্রী আর টাকা-পয়সা একটু সামলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাড়ির বাইরে যখন এতদিনের জন্য গিয়েছিলে, তখন স্ত্রী ইসিডোরাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলে ঠিক করতে।"

"আসলে আমার খেতের ফসল আর গরু-মোষ-লামাগুলিকে দেখাশোনা করার মতো আর কেউ-ই তো আমার বাড়িতে নেই।"

"হ্যাঁ, তা-ও ঠিক। খেতের ফসল আর গরু-মোষ-লামাদের দাম তো আর নেহাত কম নয়, অনেক সময় স্ত্রীর চাইতেও বেশি। তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অবশ্য আমার সেরকম মনে হয় না," বিজ্ঞ ধর্মপিতাটি মন্তব্য করলেন।

উত্তরে ধর্মপুত্র কার্মেলো বলল, "আপনি তো সবই জানেন, ধর্মপিতা। আপনি এবং আমার স্ত্রী দু'জনেই চান না, আমি ছোরার সাহায্যে ব্যাপারটার মীমাংসা করি। এখন আপনিই বলে দিন ব্যাপারটার ফয়সালা কীভাবে হতে পারে।"

"পর্যাপ্ত অর্থদণ্ডই এখানে মীমাংসার একমাত্র উপায় হতে পারে। অপরাধী লিওনসিও যদি দু'শ 'সোল' তোমাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয় তবে কেমন হয় ...?"

"আমার কাছে কিন্তু জরিমানার পরিমাণটা বেশ কম-ই মনে হচ্ছে। আমার স্ত্রী ইসিডোরার বয়সটাও তো তেমন কিছুই নয়। দুর্বৃত্ত লিওনসিও নিজে অনেকগুলি গরু-মোষ-লামার মালিক। পাঁচ'শ সোল নয় কেন, ধর্মপিতা?"

"ওটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় না ওর পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব। ঠিক আছে, ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। দেখি, কতটুকু কী করা যায়।" ধর্মপিতা কালাত্তো সবশেষে বললেন, "সবাইকে গিয়ে বলে এসো, আজ শেষরাতেই সভায় আসতে। সেখানেই আমি আমার সিদ্ধান্ত জানাব।"

যাদের বিচারসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সবাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সভায় হাজির হল। ইন্ডিয়ানদেব সামাজিক প্রথা মতো সূর্য ওঠার আগেই বিচার-সভায় সব কাজ শেষ করতে হবে। সেই প্রথা মেনেই শেষরাত চারটের সময় সভা ডাকা হয়েছিল। সূর্যদেব এ-ধরনের পাপের বিচার একদমই পছন্দ করেন না। তিনি অসন্তুষ্ট হলে সমূহ সর্বনাশ ঘটবে, বিশেষত চাষবাসের। তাই সূর্যদেবের দেখা দেবার আগেই সব অনাচারের বিচার শেষ করার বিধি।

বিজ্ঞ কালাত্তাও যথাসময়ে হাজির হয়েছেন। তিনি চারপাশে খেয়াল করে দেখলেন সবাই হাজির হয়েছে কিনা। বিচারপ্রার্থী কার্মেলো এসে গেছে তার স্ত্রী ইসিডোরাকে সঙ্গে নিয়ে। অপরাধী লিওনসিও উপস্থিত হয়েছে তার স্ত্রী কার্লোতাকে সাথে নিয়ে। কার্লোতা আবার কার্মেলোর বোন।

সেই হিসেবে লম্পট লিওনসিও হল গিয়ে কার্মেলোর ভগ্নীপতি।

নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যে এমন ঘৃণ্য একটা অপরাধ ঘটে গেছে তার জন্য বিজ্ঞ কালাত্তা এবং উপস্থিত অন্যান্য সবাই খুব বিচলতি বোধ করছিল। সবাই হাঁটু গেড়ে গোল হয়ে বসল কালাত্তার চারপাশে, প্রার্থনার সময় গির্জায় যেমন বসে, সেভাবে।

কালাত্তা নীরবতা ভেঙে বললেন, "কার্মেলো কোয়াহিলার স্ত্রী ইসিডোরা, তুমি তোমার বক্তব্য সভায় পেশ করো।"

ইসিডোরা সভার উদ্দেশে বলল, "আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। এমন পাপের মুখে আমায় জীবনে কোনওদিন পড়তে হয়নি। যদি আপনারা এটাকে ব্যভিচার বলেন, তবে তার অভিজ্ঞতাও আমার জীবনে এই প্রথম ...।" সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল ইসিডোরা।

ওর বিবরণ শোনার পর সভার সবচাইতে বয়স্ক মানুষটি মুখ খুললেন, "লিওনসিও, ইসিডোরা যা যা বলেছে সবই কি সত্যি?"

লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে আছে লিওনসিও। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও উত্তর দিল, "হ্যাঁ, সবই সত্য! তবে আমার জীবনেও এটাই প্রথম ব্যভিচার, ... আপনারা আমায় এবারের মতো ক্ষমা করে দিন!"

এরপর কালাত্তা বললেন, "এবার কার্মেলো বলুক তার স্ত্রীর এই ইজ্জৎহানির জন্য কী মূল্য সে চায়।"

কার্মেলো উত্তরে বলল, "শুধু ইজ্জৎই নয়, আমার অনেক পয়সাও শেষ হয়ে গেছে এর জন্য উকিলের পেছনে— আর সদরে ক'বার যাতায়াত করার পেছনে— ভাল গচ্চা দিতে হয়েছে আমাকে। লিওনসিওর কাছ থেকে আমি পাঁচশ' সোল দাবি করছি।"

এবার অভিজ্ঞ কালাত্তা মধ্যস্থ হয়ে বললেন, "লিওনসিও, পাপ করলে তার সমুচিত জরিমানা দিতেই হবে। তোমার অপরাধের গুরুত্ব খুবই বেশি। এই অবস্থায় টাকার থলির মুখতো একটু আলগা করতেই হবে তোমাকে। অযথা অন্যের কুয়োর জল খাওয়ার প্রয়োজনতো তোমার ছিল না। এখন তুমিই বলো, তোমার জরিমানার অর্থ কত হতে পারে।"

"মান্যবর কালাত্তা, আপনি কি মনে করেন তিনশ' সোল ঠিক হবে?"

কালাত্তা যেন একটু অবাকই হলেন টাকার পরিমাণটা শুনে। কার্মেলোর সাথে ওঁর একটু দৃষ্টি বিনিময় হল। তিনি আন্দাজ করলেন এই টাকায় রফা করতে কার্মেলো সম্মত আছে। গম্ভীর গলায় তিনি লিওনসিওকে বললেন, "ঠিক আছে। যাও, এখনই গিয়ে টাকাটা এনে দিয়ে দাও কার্মেলোকে।"

"মান্যবর কালাত্তা, এক্ষুণই তো আমি টাকাটা দিতে পারব না, এই মুহূর্তে আমার কাছে এত টাকা নেই। কাল সকালে আমি তারাতা গিয়ে মানুষজনের কাছে ধার করে টাকাটা জোগাড় করে নিয়ে আসবো।"

"তার দরকার হবে না। আমিই তোমায় টাকাটা এখন ধার দিচ্ছি। তুমি কাম্বয়ানাকে দিয়ে একটা রসিদ বানিয়ে সই-সাবুদ করে আমায় দিয়ে দাও।"

কালাত্তার এমন প্রস্তাব শুনে একটু হকচকিয়ে গেল লিওনসিও। নতুন করে আর কোনও চালাকি করার অবকাশ এখন নেই। তিনশ' সোল গচ্চা ওকে দিতেই হবে। শুধু একটু মৃদু প্রতিবাদ

করে ও বলল, "টাকার অংকটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। সামান্য একবারের ব্যভিচারের জন্য এত দাম দিতে হবে, ভাবিনি।"

বিচারের পর্ব শেষ হয়ে গেল। উপস্থিত সবাইকে আরও একবার ব্র্যান্ডি খাইয়ে আপ্যায়ন করল কার্মেলো। বিদায় নেওয়ার আগে সভায় আমন্ত্রিত সবাই ওর স্ত্রীকে বলে গেল, 'ইসিডোরা, তোমার ভাগ্যে একজন ভাল স্বামী জুটেছে। খেয়াল রেখো, যেন আবারও ইজ্জৎ খোয়াতে না হয়।"

যেতে যেতে ওরা লিওনসিওকে বলে গেল, "তুমি ইন্ডিয়ান সমাজের কলঙ্ক। এরপর আমাদের ঘরের মেয়েছেলেদের সাথেও ওই ধরনের বাঁদরামি করতে যেও না। তোমার জন্য আমাদের ধারালো ছোরা হাতের কাছেই থাকবে।"

একে একে সবাই বিদায় নিল, কালাস্তা, কার্মেলো আর ইসিডোরা ছাড়া। ওদের দু'জনের উদ্দেশে কালাস্তা বললেন, "শেষপর্যন্ত মীমাংসাটা ভালই হল। এবার তোমরা বল, আমার দক্ষিণা কী হবে।"

"আপনিই বিবেচনা করে বলুন, ধর্মপিতা।"

"পঞ্চাশ সোল হলে কেমন হয়?"

"আপনি ওই টাকাটা কেটে রেখে বাকি দু'শ পঞ্চাশ সোল আমায় দিয়ে দিন।"

সব লেনদেন মিটিয়ে কালাস্তা বিদেয় নিলেন।

কার্মেলোও স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। জীবনে একসাথে হাতের মধ্যে এতগুলি টাকা আগে সে কোনওদিন পায়নি। একটু আস্কারা দেবার সুরেই সে তার স্ত্রীকে বলল, 'ইসিডোরা, ব্যাপারটা কিন্তু বেশ মজারই। প্রতিমাসেই যদি ব্যভিচারের এমন একটা ব্যাপার ঘটে যেত, তবে অল্পদিনের মধ্যে আমরা কিন্তু অনেক টাকার মালিক হয়ে যেতাম। সেই টাকায় হয়ত প্রচুর জমি-জমাও কিনে ফেলতে পারতাম আমরা।"

"তবে কি তুমি বলতে চাইছ যে, তুমি যখন বাড়ির বাইরে থাকবে তখন, এদিক-ওদিক চলাফেরা করার সময়, আমি আর ছুরিটা সঙ্গে রাখব না ...?"

যুদ্ধ

War

(Luigi Pirandello, Nobel Laureate, Sicily)

[কবি, নাট্যকার, উপন্যাসিক, ছোটগল্পকার পিরানদেল্লো সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৭ ইংরেজিতে। বিশ্ববরেণ্য এই লেখকের প্রথম জীবন কাটে রোমে, অধ্যাপনার সূত্রে। প্রথম লেখা একটি কবিতা সংগ্রহ, প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। তারপর অবিরাম লিখে গেছেন। নাট্যকার হিসেবেই বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত — "নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র" ইত্যাদি নাটক বাংলার দর্শকদেরও মুগ্ধ করে। পিরানদেল্লো সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩৪ সালে। 'যুদ্ধ' গল্পটি পিরানদেল্লোর অসাধারণ রচনাশৈলির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।]

রাতের এক্সপ্রেস ট্রেনে যারা রোম থেকে এসেছে সুলমোনা যাবার জন্য তাদের সবাইকে এই ফেব্রিওনা স্টেশনে নামতে হবে। এখান থেকে শেষ রাতে, তাদের ছোট লাইনের ট্রেন ধরতে হবে গন্তব্যে পৌঁছুবার জন্য।

ভোর রাতে ছোট লাইনের ট্রেনটি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। একটি দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় দম বন্ধ করা, ধোঁয়াচ্ছন্ন পরিবেশে পাঁচটি লোক আগে থেকেই বসে আছে। ওরা সারাটা রাত কাটিয়ে এসেছে এই পরিবেশেই। গাড়ি থামতেই এই কামরাটাতেই, প্রায় জবরদস্তি করে ঠেলে তুলে দেওয়া হল একটি মহিলাকে। আকারহীন মস্ত এক মাংসপিণ্ডের মতো ওর দেহটি, খুবই শোকাচ্ছন্ন তার চেহারা। মহিলার পেছন পেছন হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল একটি পুরুষ, ওর স্বামী। ছোট্ট-খাটো রোগাপাতলা মানুষটির চোখ দু'টিতে কেমন এক লজ্জা আর অস্বস্তির চাহনি।

শেষপর্যন্ত একটু বসবার জায়গা পেয়ে লোকটি কামরার অন্যান্য যাত্রীদের ধন্যবাদ জানাল, বিশেষ করে ওর স্ত্রীকে জায়গা করে দেবার জন্য। লোকটি তারপর ওর স্ত্রীর দিকে ঘুরে বসল, ওর কোটের উঠে যাওয়া কলারটি নামিয়ে দিল এবং খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সব ঠিক আছেতো, ডিয়ার?"

স্বামীর কথার উত্তর না দিয়ে মহিলাটি তার কোটের কলারটি আবার ঠেলে ওপর দিকে তুলে দিল, —যেন নিজের মুখটা কারও কাছ থেকে আড়াল করতে চায় সে।

"অসভ্য দুনিয়া!" স্বামীটি মৃদু হেসে করুণভাবে বলল।

লোকটির এরপর মনে হল ওর স্ত্রীর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থাটা কামরাব অন্যান্য যাত্রীদের একটু বুঝিয়ে বলা দরকাব। সব কিছু শোনার পর মহিলাটির প্রতি সবাই নিশ্চয়ই সমবেদনা জানাবে। লোকটি বলতে শুরু করল যুদ্ধ কীভাবে ওদের একমাত্র ছেলেটিকে ওদের কাছ থেকে দূরে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। মাত্রই বিশ বছরের সন্তানটির জন্য ওরা জীবনের প্রায় সবকিছুই ত্যাগ করেছে। সুলমোনাতে নিজেদের ভিটে মাটি ছেড়ে ওরা ছেলেকে পড়াশোনার জন্য রোমে নিয়ে গেছে, দিনের পর দিন ওর সাথে সেখানে থেকেছে। তারপর একদিন সেই প্রিয় সন্তানটিকে ছেড়ে দিতে হল যুদ্ধে যাবার জন্য। সেই সময় ওদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, অন্তত ছ'মাস ছেলেকে রণক্ষেত্রে পাঠানো হবে না। এখন ছেলেব কাছ থেকে হঠাৎই তার এসেছে, তিনদিনেব মধ্যেই ওবে সীমান্তে চলে যেতে হবে। ওর খুব ইচ্ছে, বাবা-মা এসে একবার ওকে বিদায় জানিয়ে যাক।

কোট গায়ে ওই মস্ত মহিলাটি তখন কেমন অস্থির হয়ে ছটফট করতে শুরু করেছে। ওর মুখ দিয়ে বিচিত্র সব আওয়াজ বেরুচ্ছে। স্বামীটির কাছে এত কথা শোনার পরও কামরার সব যাত্রীরাই কেমন নির্বিকার, কোনও সহানুভূতির সামান্য প্রকাশও নেই। হয়ত বা বাকি সব যাত্রীরাও ওদের মতোই একই ধরনের মানসিক যন্ত্রণায ভুগছে।

যাত্রীদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলতে শুরু করল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও যে তোমাদের ছেলেটিকে যুদ্ধ শুরু হবার এতদিন বাদে সীমান্তে যেতে হচ্ছে। আমার ছেলেকে তো ওরা যুদ্ধ শুরু হবার দিনই সোজা রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দু'-দু'বার মা[illegible] ফিরে এসেছিল, তারপরও আবার সীমান্তে চলে যেতে হয়েছে ওকে।"

"আর আমার বেলায় কী ঘটেছে? আমার দু'টি ছেলে আর তিনটি ভাইপো এ[illegible] এখন সীমান্তে লড়ছে," আরেকজন যাত্রী বলল।
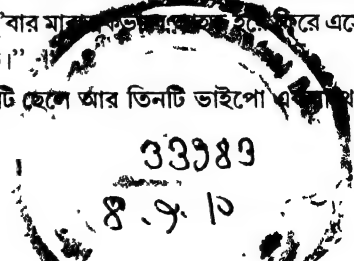
"হতেই পারে, তবে আমাদের ক্ষেত্রে ও-ই তো হল গিয়ে একমাত্র সন্তান।" মোটা মহিলার স্বামীটি বলল।

"একমাত্র সন্তানে কী এসে যায়? বরং অতিরিক্ত আদরে ও প্রশ্রয়ে ওর মাথাটা নষ্ট করে দেওয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। তোমার যদি আরও ক'টি বাচ্চা থাকত তবে ওই একটিমাত্র সন্তানকে নিশ্চয়ই বাকিগুলোর চাইতে বেশি ভালবাসতে না। বাপের আদর তো পাউরুটির মতো নয় যে, ভেঙে টুকরো করে অনেকগুলো বাচ্চার মধ্যে ভাগ করে দেবে সমান ভাবে। প্রত্যেক বাপকে তার সন্তানদের প্রত্যেককে নিজের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনও পক্ষপাত করা চলবে না, সে একটা সন্তানই হোক কিংবা দশটা। এই আমি এখন একই সাথে দু'টি ছেলের জন্য জ্বলে-পুড়ে মরছি, এমনতো নয় যে, একজনের জন্য অর্ধেক আর অন্যটির জন্য বাকি অর্ধেক কষ্ট পাচ্ছি। ঠিক ভাবে দেখতে গেলে, আমার কষ্টটা দ্বিগুণ হচ্ছে।"

"ঠিক, ... একদম ঠিক কথা," দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওই মোটা মহিলার স্বামীটি বলল। "কিন্তু ধরুন (অবশ্য আপনার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তা ঘটবে না) কোনও পিতার দু'টি ছেলেই একসাথে সীমান্তে যুদ্ধ করছে। তাদের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ প্রাণ হারায় তারপরও অন্য একটি কিন্তু থেকে যাবে পিতাকে সান্ত্বনা দিতে, ... আর যদি ...।"

"হ্যাঁ," একটু খেপে গিয়েই অন্য লোকটি বলতে শুরু করল, "একটি ছেলে হারিয়ে গেছে আর অন্যটি বাপকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বেঁচে আছে, এমন তো হতেই পারে। সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির জন্য বুড়ো বাপকে কিন্তু, দুঃখের বোঝা নিয়ে, আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু কারও একটিমাত্র সন্তান যদি যুদ্ধে প্রাণ হারায় তবে বাপটি, সব দুঃখ ভুলে যেতে নিজেও মৃত্যুর পথ বেছে নিতে পারবে।"

"বাজে কথা!," ... হঠাৎ মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল মোটা লালমুখো এক যাত্রী। লোকটা হাঁপাচ্ছে। কোনও তীব্র আবেগ আর উত্তেজনায় ওর লাল চোখ দু'টো যেন বেরিয়ে আসছে।

"বাজে কথা,— একদম বাজে কথা," লোকটি আবারও জোর দিয়ে বলল। ওর সামনের দু'টো দাঁত নেই, আর সেই ফাঁকটা ঢাকা দিতে সব সময় একটা হাত মুখের সামনে ধরে রাখছে। "আমরা নিজেদের সুখ বা লাভের কথা ভেবে সন্তানের জন্ম দিতে যাই নাকি?"

কথাগুলি শুনে কামরার অন্য যাত্রীরা বিষণ্ণ চোখে লোকটিব দিকে তাকাল।

যে লোকটির ছেলে প্রথম দিন থেকেই যুদ্ধে আছে, সে এবার বলল, "একদম ঠিক কথা। আমাদের সন্তানরা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, ওদের ওপর একচ্ছত্র অধিকার শুধু দেশের।"

সেই মোটা লোকটি উত্তরে বলল, "এসবই অর্থহীন কথাবার্তা। আমরা কি দেশের কথা মাথায় রেখে সন্তানের জন্ম দিই? আমাদের সন্তানরা জন্মায় কারণ, ... জন্মাতে ওদের হয়। যখন ওরা জীবন পায় তখন আমাদের জীবনের সাথে নিজেদের জীবনকে ওরা জড়িয়ে নেয়। এটাই হল সার কথা। আমাদের ওপর ওদের অধিকার থাকে কিন্তু ওদের ওপর আমাদের, বলতে গেলে, কোনও অধিকার থাকে না। আর যখন ওরা বিশ বছরে পা রাখে তখন ওরা আমাদের মতোই হয়ে যায়, মানে বিশ বছর বয়সে আমরা যেমন ছিলাম ঠিক সেরকম। আমাদেরও বাবা ছিল, মা ছিল, কিন্তু তার বাইরেও আরও অনেক কিছু ছিল। মেয়ে মানুষ, সিগারেট, অলীক স্বপ্ন, নতুন টাই,... আরও

কত কী। আর সেই সাথে অবশ্যই ছিল নিজের দেশ, যার ডাকে আমাদের সাড়া দিতেই হত, মা-বাবা যদি বারণ করত তবুও। এই বয়সেও দেশের প্রতি টানে আমাদের কোনও খামতি নেই, তবুও হয়ত সন্তানদের প্রতি ভালবাসার টানটা একটু বেশি। এই কামরায় এমন কেউ আছেন কি যিনি, সুযোগ পেলে, নিজের সন্তানের জায়গায় হাসিমুখে যুদ্ধে যেতে রাজি হতেন না?''

সবাই কেমন চুপচাপ, —প্রত্যেকেই যেন মাথা নেড়ে সম্মাতি জানাচ্ছে লোকটির কথায়।

একটু থেমে মোটা লোকটি আবারও বলতে শুরু করল, ''কুড়ি বছরে পা দেবার পর আমাদের সন্তানদের মনে যে সমস্ত আবেগ কাজ করতে শুরু করে সেগুলোও তো আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে, তাই কিনা? ওই বয়সে ওরা (আমি শুধু ভদ্র ছেলেদের কথা বলছি) যদি নিজের মা-বাবার চাইতে নিজের দেশকে একটু বেশি ভালবাসে তবে সেটা খুব অস্বাভাবিক মনে হবে কি? এমন হওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয়? যদি আমাদের নিজেদের দেশ থেকে থাকে আর বেঁচে থাকার জন্য যেমন রুটি চাই, তেমনই যদি দেশকেও আমাদের প্রয়োজন থেকে থাকে, তবে তো কাউকে না কাউকে এগিয়ে যেতেই হবে বিপদের সময় দেশকে রক্ষা করতে। ঠিক বললাম কিনা? তাই আমাদের ছেলেদেরও যেতে হয়, কুড়ি বছর বয়স হলেই যেতে হয়। ওরা চোখের জল চায় না, কারণ মৃত্যু ওদের কাছে এক তীব্র আবেগ ও আনন্দের ব্যাপার (আমি অবশ্য শুধু ভালো ছেলেদের কথাই বলছি)। জীবনের কুৎসিত দিকগুলি, বেঁচে থাকার একঘেয়েমি, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, মোহভঙ্গের ব্যথা ইত্যাদি যদি এড়িয়ে যেতে মন চায় তবে অল্প বয়সে মরার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে।... তখন এর বাইরে এদের কাছ থেকে আর কী-ই বা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি? কান্না এখন অর্থহীন, প্রত্যেককেই হাসিমুখে থাকা উচিত, যেমন আমি আছি।... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, যেমন আমি দিচ্ছি ... কারণ আমার ছেলে মৃত্যুর ঠিক আগে একটা বার্তা পাঠিয়ে গেছে। ওই বার্তায় ও জানিয়েছে, খুব খুশি মনেই ও মরছে। জীবনের এর চাইতে সুন্দর পরিসমাপ্তি নাকি ও কোনওদিন আশা করেনি। ঠিক ওই কারণেই, আপনারা নিজেরাও দেখতেই পাচ্ছেন, আমি শোকের কোনও পোষাকই ধারণ করিনি।'' ...

কথাগুলি শেষ করে মোটা লোকটি ওর হলদে-বাদামি রঙের কোটটাকে টেনে ধরে বোঝাতে চাইল, ওটা কোনও শোকের পোষাক নয়। ফোকলা মাড়ির ওপর ওর ঠোঁটগুলো যেন তখন কাঁপছে, চোখ দু'টি কেমন ভেজা ও নিশ্চল। হঠাৎ এক তীক্ষ্ম হাসিতে মোটা লোকটি ফেটে পড়ল, যা কিনা হাসি না হয়ে বাঁধ-ভাঙা কান্নাও হতে পারত।

''ঠিক, ... একদম ঠিক ...,'' বাকি যাত্রীরা সবাই ওর কথা মেনে নিল।

অন্যদিকে, সেই মোটা মহিলাটি কামরার এক কোণে বসে আছে তার গায়ের মস্ত কোটটার ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে। কামরার অন্যান্য যাত্রীদের সব কথা সে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। গত তিন মাস ধরে আরও কত কথাই মহিলা শুনতে পেয়েছে, কখনও স্বামীর কাছ থেকে, কখনও বা নিজের প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে। সব কথাই দুঃখের দিনে ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। ওরা সবাই যেন মহিলাকে বোঝাতে চাইত, নিজের ছেলেকে ভয়ানক বিপদ বা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েও, কীভাবে সব কিছু মেনে নিতে হয়। আসলে কেউই ওর মনের শূন্যতা ও দুঃখ অনুভব করার চেষ্টা করেনি।

কিন্তু এই বুড়ো মোটা লোকটির মুখে যুদ্ধে তার ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যুর বিবরণ শুনে মহিলাটি

বেশ অবাক হয়ে গেল। ওর মনে হল, অন্যান্য মা-বাবাদের মতো ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে ও নিজেই সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ছেলেদের যুদ্ধে পাঠিয়ে, এমনকি ওদের মৃত্যুর পরও, কান্না বা হতাশায় ভেঙে পড়ে না সবাই, যেমন নিজের ছেলেকে চিরতরে হারিয়েও একদম ভেঙে পড়েনি এই বুড়ো মানুষটি।

বুড়ো মানুষটির কথা তখনও শেষ হয়নি। ওর ছেলে কীভাবে হাসিমুখে বীরের মতো নিজের দেশের জন্য নিজের রাজার জন্য প্রাণ দিল, সেই কাহিনি বিস্তারিত বলে চলেছে মানুষটি। মহিলাটি সোজা হয়ে বসে কান খাড়া করে লোকটির সব কথা শোনার চেষ্টা করছে। যতই শুনছে ততই বিস্মিত হচ্ছে ও। কামরার বাকি সব যাত্রীরা বুড়ো বাপটিকে সাধুবাদ জানাচ্ছে, নিজের ছেলের করুণ মৃত্যুর বিবরণ ওইভাবে দেবার জন্য।

যেন এতক্ষণ ধরে বলা কোনও কথাই ওর কানে যায়নি এবং যেন হঠাৎ ও স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠেছে, এমন ভাব করে মহিলাটি বুড়ো বাপটির দিকে তাকিয়ে আচমকা বলে উঠল,

"তবে কি ... আপনার ছেলেটি সত্যি যুদ্ধে মারা গেছে?"

অবাক হয়ে সবাই মহিলাটির দিকে চোখ ফিরিয়ে চাইল। বুড়ো মানুষটিও সজল চোখ, গভীর ও স্থির দৃষ্টিতে, ওর দিকে তাকিয়ে রইল। চেষ্টা করল মহিলাব প্রশ্নের উত্তর দিতে, কিন্তু পারল না। বুড়ো লোকটি মহিলাটির দিকে চেয়ে আছে তো, চেয়েই আছে। এমন অর্থহীন এবং বোকাটে একটা প্রশ্ন শোনার পর তখন, একমাত্র তখনই, লোকটি যেন হঠাৎ উপলব্ধি করতে পারল যে, ওর ছেলেটি সত্যি মারা গেছে, হারিয়ে গেছে চিরতরে, একেবারেই চিরতরে।

বুড়ো মানুষটির মুখটা কেমন কুঁচকে বিকৃত হয়ে যেতে লাগল। পকেট থেকে রুমালটা বের করল এবং তারপর আচমকা, সবাইকে অবাক করে দিয়ে, মর্মবিদারি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল লোকটি! সন্তানহারা বুড়ো মানুষটির ভেতরে চেপে রাখা সব কান্না যেন আর বাধা মানতে চায় না!

মৃত্যু

Death

(Wladyslaw Reymont, Nobel Laureate, Poland)

"বাবা, ও বাবা, ওঠো, শুনতে পাচ্ছো? আরে ওঠো!"

"হায় ঈশ্বর ! আঃ!"— জোর ধাক্কা খেয়ে কাতর ভাবে গোঙাতে লাগল বুড়ো মানুষটা। কম্বলের ভেতর থেকে উঁকি মারল ওর মুখটা, বার্ধক্যের সাথে শুকিয়ে দুরমুশ হয়ে যাওয়া গভীর বলিরেখায় ক্ষতবিক্ষত এক জরাগ্রস্ত চেহারা। ওর চোখ দু'টি বন্ধ, হাঁ-করা মুখের একপাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে জিভটা।

"ওঠো ! কী হল?", চিৎকার করছে বুড়োর মেয়ে।

পাশ থেকে একটি বাচ্চা চেঁচিয়ে ডাকল, "দাদু, ও দাদু?" ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ও আবার কাতর ভাবে ডাকল, "দাদু?"

ধমক মেরে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাচ্চাটিকে হটিয়ে দিল ওর মা। এরই মধ্যে বাড়ির অন্ধ কুকুরটাও বুড়োর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকতে সুরু করেছে। ওটাকেও কষে একটা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল বুড়োর মেয়ে। ওদিকে মায়ের হাতে মাব খেয়ে বাচ্চা মেয়েটি চুল্লিটার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে চলেছে।

"বাবা, উঠে পড়ো, বলছি। আমার মেজাজ খারাপ হলে কিন্তু মুস্কিল হবে।"

অসুস্থ বুড়ো চুপচাপ নিশ্চল পড়ে আছে। বিছানায়, মাথাটা একদিকে কাত কবে। ওব শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। আর বেশিক্ষণ বোধ হয় বাঁচবে না।

"ওঠো! ব্যাপারটা কী? তুমি কি এখানে পড়ে মরার তালে আছো নাকি? ওসব হবে না। বুড়ো ভাম কোথাকার। যাও তোমার পেয়ারের মেয়ে জুলিনীর কাছে গিয়ে মরো। সমস্ত সম্পত্তি তো ওই মেয়েটাকেই দিয়ে বসে আছো। এবার আদরের সন্তানকে গিয়ে বলো, তোমাকে নিয়ে গিয়ে আদর-যত্ন করতে। আমার কাছে কেন?"

"হায় যিশু! হায় মাতা মেরি...!", বৃদ্ধের মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ ক'টি বেরিয়ে এল।

হঠাৎ বুড়োর মুখটিতে কেমন একটা খিঁচুনি দেখা দিল। ওর মেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে এক হ্যাঁচকা টানে খাট থেকে ওর শরীরের অর্ধেকটা মাটিতে ফেলে দিল। মাথার দিকটা শুধু খাটের ওপর পড়ে রইল। বুড়োর দেহে সামান্য নড়াচড়াও নেই, কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে।

অসাড়, অশক্ত লোকটি এরই মধ্যে বিড়বিড় করে শুধু উচ্চারণ করল, "যাজক-মশাই. ., শ্রদ্ধেয় ...।"

"দাঁড়াও, যাজক দেখাচ্ছি তোমায়! ওই শুয়োরের ঘরটায় এখন চালান দেব তোমায়। ওখানে পচে মরবে তিলে তিলে, পাপী কোথাকার!" কথাগুলি বলেই মেয়ের খেয়াল হল কেউ একজন বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকছে। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ বাপকে টেনে হ্যাঁচড়ে আবার বিছানায় তুলে রাখল ও।

প্রতিবেশী এক কৃষকের বউ এসে ওদের ঘরে ঢুকল।

"যিশুর জয় হোক! কেমন আছ তোমরা সব?"

"ঈশ্বরের দয়ায় কেটে যাচ্ছে...।"

"বুড়োর কী খবর? ঠিকঠাক আছে তো?"

"ঠিক আর থাকবে কীভাবে, শ্বাসই তো নিতে পারছে না ঠিকমতো।"

আগন্তুক মহিলা বুড়োর দিকে মাথা নিচু করে তাকাল।

"যাজক...", শব্দটা অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল বুড়ো।

"হায় কপাল! বুড়ো আমায় চিনতেই পারছে না। ও শুধু যাজককে খুঁজছে। কোনও সন্দেহ নেই, ওর মরবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, ...প্রায় মরেই গেছে। তোমরা কি শ্রদ্ধেয় যাজক মশাইকে খবর পাঠিয়েছ?"

"কে যাবে বলো তো খবর দিতে? কেউ তো নেই আমার ঘরে। আমিই বা একা ওকে ফেলে রেখে যাই কী করে?"

"কিন্তু শ্রদ্ধেয় যাজকের ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ ছাড়া কোনও খ্রিস্টান মারা যাবে, তা কী করে হয়?"

"তুমি যদি ফেরার পথে যাজক-মশাইকে খবরটা দিয়ে যাও, তবে খুব ভাল হয়।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে আর বেশিক্ষণ নেই। আমি যাচ্ছি যাজকের কাছে। আমি চললাম, আন্তকোয়া।"

'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!"

প্রতিবেশিনীটি বেরিয়ে যাওয়ার পর বুড়োর মেয়ে আন্তকোয়া ওর ঘরটা গোছগাছ করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে বুড়ো বাপের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে গালাগাল পাড়ছে আর মেঝেতে থুতু ফেলছে।

"পনেরো একর জমি, এতগুলি শুয়োর, তিনটি গরু, আসবাবপত্র, জামাকাপড়...! হায় কপাল, এর অর্ধেকও বুড়ো যদি আমায় দিয়ে যেত! খুব কম করেও ছ'শো রুব্‌ল দাম পাওয়া যেত"— কথাগুলি মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে আরও খেপে উঠছিল বুড়োর মেয়েটি।

নিজের বাপ আর বোনকে শাপশাপান্ত করে আন্তকোয়া বলতে লাগল, "শয়তানের দল! হাঁস মুরগি, বাছুর, খামারের সব কিছু বুড়ো মিনসে ওর ওই ছেনাল মেয়েটাকে দিয়ে গেছে। মাটির নিচে গেলে পোকাতে খুবলে খাবে মিনসেকে!"

ক্ষিপ্ত হয়ে হঠাৎ বাপের দিকে ছুটে গেল আন্তকোয়া। চিৎকার করে বলতে লাগল, "অনেক হয়েছে, এবার উঠে পড়ো! আমার এখানে তো শুধু মরতেই এসেছ। তোমার সৎকারের পয়সা জোটাতে হবে আমাকে? সে হবে না। যাও, তোমার আদরের মেয়ে জুলিনার কাছে চলে যাও। তাকে তো সব দিয়ে গেছ, সে-ই তোমার শেষকাজ করবে। আমার কাছে পড়ে মারা যাবে, তা আমি ...।"

ওর কথাগুলি শেষ হওয়ার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। যাজক মশাই বুড়োর শেষ ক্রিয়াকর্মের

জন্য তৈরি হয়ে চলে এসেছেন।

বুড়োর মেয়ে আন্তকোয়া নতজানু হয়ে যাজকের পা স্পর্শ করল। যাজকের সাথে আশপাশের আরও ক'জন মানুষও এসেছে বুড়োর খবর পেয়ে।

"কী অবস্থা এখন?"

"কী আর হবে! বুড়ো আমাদের এখানে এসেছে মরবে বলে। সারা জীবন তো আমাদের শুধু বঞ্চনাই করে গেছে, এখন আমাদের ছাড়া গতি নেই। হায় আমার কপাল!" কান্নায় ভেঙে পড়ল আন্তকোয়া।

"ঠিক কথা। বুড়োকে পচে মরতে হবে তিলে তিলে, আর তোমাদের বেঁচে থাকতে হবে তারও পর," জড়ো হওয়া লোকগুলি মাথা নেড়ে বলল একসাথে।

"আমরা দু'জন, মাঝে আমি আর আন্তেক কী-ইনা করেছি বুড়োটার জন্য। ডিম, দুধ, মাখন — যখন যা পেয়েছি সব গিলিয়েছি। আর এখন যাওয়ার আগে সব দান করে গেল ওর আদরের মেয়ে জুলিনাকে। পনেরো একর জমি, ঘরবাড়ি, গরু, শুয়োর আর বাকি সব কিছু ...। আমাদের পোড়া কপালে কিছুই জুটল না। পৃথিবীতে বিচার বলে কিছুই নেই।

"কেঁদো না, এভাবে কেঁদো না। ঈশ্বর দয়াময়, একদিন-না-একদিন তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন," প্রতিবেশী একটি মেয়েছেলে সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

মহিলার স্বামীটি বাধা দিয়ে বলল, "আহাম্মকের মতো কথা বলছ কেন? অন্যায় সব সময় অন্যায়ই। বুড়ো ঠিকই মারা যাবে আর দারিদ্র্য তারপরও থেকেই যাবে।"

নানা ধরনের সব দার্শনিক মন্তব্য বেরিয়ে এল আরও ক'জনের মুখ থেকে। তারপর লোকগুলি সব চুপ মেরে গেল। বাইরে হিমেল বাতাস বইছে, সেই সাথে পড়ছে বরফ।

যাজক সবাইকে বুড়োর ঘরের ভেতর ডেকে নিলেন। সবাই নতজানু হয়ে বসল। মরণাপন্ন বুড়ো বালিশে মাথা রেখে নিশ্চল পড়ে আছে বিছানায়। যাজক তাব করণীয় সব ক্রিয়া-কর্ম সম্পন্ন করলেন। সবশেষে তিনি বুড়োর মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার স্বামীটি কোথায়?"

"মান্যবর, রোজের মতো আজও সে খেতে কাজ কবতে গিয়েছে।"

যাজক সবাইকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। সেই সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাইরের সব লোকজনেরাও।

ডিসেম্বরের ছোট দিন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। সন্ধের অন্ধকার ক্রমে নেমে এল। বাইরে ক্রমাগত বরফ পড়ে চলেছে। মুমূর্ষু বুড়ো নিশ্চল পড়ে আছে বিছানায। ঘরের ভেতরেও আঁধার ঘনীভূত হচ্ছে। কেমন অস্থিরতায় ভুগছে আন্তকোয়া। হঠাৎ ও উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। চাবপাশ নিস্তব্ধ, জনমানব শূন্য। আচমকা ছুটে গিয়ে সে বুড়োকে বিছানা থেকে টেনে তুলল, দু'টি বগলের নিচ দিয়ে হাত গলিয়ে। ছোট্ট মেয়েটাকে ডেকে বলল, "মাগদা, দরজাটা খুলে দে।"

মাগদা চমকে উঠে একলাফে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

"এদিকে আয়! বুড়োর পা দু'টো তুলে ধর। ওকে এখান থেকে নিয়ে যাব।"

টেনে-হ্যাঁচড়ে বুড়োর অচেতন দেহটাকে ওরা ঘর থেকে বের করে আনল। ঠান্ডা হাওয়ার

ঝটকা লেগে বুড়ো যেন একটু নড়েচড়ে উঠল, একটু গোঙাতেও শুরু করল।

"হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে ..., যত পারো চিৎকার করো, কেউ এখন তোমার চিৎকার শুনতে আসবে না ...।"

টানতে টানতে বুড়ো বাপের মৃতপ্রায় দেহটাকে আন্তকোয়া নিয়ে ফেলল শুয়োরের ঘরটার দরজায়। পা দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজটা খুলে দিল। শুয়োরগুলি সব ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। বুড়োর শরীরটাকে টেনে শুয়োরের ঘরটার ভেতর ঢুকিয়ে দিল ওর মেয়ে। তারপর একটানে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এল। পরমুহূর্তেই আবার দরজা খুলে ভেতরে গেল আন্তকোয়া। বুড়ো মানুষটার গায়ের জামাকাপড় সব ছিঁড়ে ফেলল। বুড়োর মাথা থেকে ফেটিটাও খুলে নিয়ে চলে এলো।

"এবার ঠাণ্ডায় তিলে তিলে মরতে থাকো, কুষ্ঠরোগী কোথাকার!"

বেরিয়ে আসার আগে ক্ষিপ্ত মেয়েটি বাপের পা দু'টিতে লাথি মেরে এল।

অন্ধকারে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়া শুয়োরগুলিকে আদর করে কাছে ডেকে আনল আন্তকোয়া। একটা জায়গায় কিছু আলু ছড়িয়ে দিল ওদের জন্য। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরের ভেতর চলে গেল ও।

ঘরের ভেতর এসে আন্তকোয়া ছোট প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিল। বুড়োর মাথার ফেটিটা হাতিয়ে বেশ ভারী মনে হল ওর, যেন কিছু আছে সেটার ভেতরে। ও ফেটিটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল। অবাক হয়ে ও দেখল, ফেটির ভেতর থেকে বেশ কিছু টাকার নোট আর দু'টি রুপোর মুদ্রা বেরিয়ে এসেছে। আন্তকোয়া তাড়াতাড়ি সবগুলিকে ভালভাবে একটি কাপড়ে জড়িয়ে বাক্সের ভেতর রেখে দিল।

বুড়ো তবে মিথ্যে বলেনি, ওর শেষ কৃত্যের জন্য টাকার ব্যবস্থা সে ঠিকই করে রেখে গেছে!

কিছুক্ষণ বাদে আন্তকোয়ার স্বামীটি বাড়ি ফিরে এল। ওকে সবাই ডাকে 'আন্তেক'। মস্ত মোটা লোকটার আপাদমস্তক গরম জামা কাপড়ে মোড়া। টুপি আর মাফ্‌লার খুলে নিয়ে ও চুল্লিটার পাশে গিয়ে বসল। আন্তকোয়া এক সস্‌প্যান ভর্তি গরম বাঁধাকপি রান্না আর কিছু পাউরুটি এগিয়ে দিল। ক্ষুধার্ত চাষাটি গোগ্রাসে সব খেতে লাগল। সব খেয়ে নেওয়ার পর লোকটা জানতে চাইল, আরও কিছু খাবার আছে কিনা। ওর স্ত্রী দুপুরের অবশিষ্ট কিছু পায়েস এগিয়ে দিল।

খাওয়া শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল আন্তেক। আরও ক'টা কাঠের টুকরো ফেলে চুল্লির আগুনটাকে একটু চাগিয়ে দিল। কিছুক্ষণ একটু আরাম করে নেওয়ার পর ওর হঠাৎ নজরে পড়ল, বুড়োর খাটটা খালি!

অবাক হয়ে স্ত্রীকে ও জিজ্ঞেস কবল, "বুড়ো কোথায় গেল?"।

"কোথায় আর যাবে? শুয়োরের ঘরটাতে পড়ে আছে।"

"আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম। মরতেই যখন হবে তখন ঘরের ভেতর বিছানাপত্র অযথা নষ্ট করা কেন? বুড়ো ঠিক জায়গায়ই গিয়ে পড়েছে, এখন তাড়াতাড়ি বিদেয় হলেই বাঁচা যায়। আমাদের জন্য তো ছিটেফোঁটাও কিছু রেখে যায়নি। শেষবেলা আমাদের জ্বালাতে এসেছে কেন? আমরা কেন ওকে খাওয়াব, কেনই বা ওর সৎকারের খরচাপাতি সামলাব? আদরের মেয়ে জুলিনার জন্য যখন সবকিছু রেখে গেছে, তখন ওরই তো উচিত বুড়োকে এখন সামলানো। আমরা করতে

যাব কোন দুঃখে!"

"এটা আমার বাপ নয়! আমাদের শুধু ঠকিয়েছে এই বুড়ো ভাম!"

"এই পচা-গলা বুড়ো যদি আমাদের এভাবে না ঠকাত তবে আজ কত কিছু আমরা করতে পারতাম। গরু, ঘোড়া, ছাগল, জমি— কোনও কিছুরই অভাব থাকত না।"

কথাগুলি শেষ করে লোকটা রেগে একদলা থুতু ফেলল ঘরের মেঝেতে।

স্ত্রী আস্তকোয়া কাপড়ে জড়ানো বুড়োর সেই টাকাগুলি বের করে আনল বাক্সের ভেতর থেকে। পুঁটলিটা ধরিয়ে দিল স্বামীর হাতে।

"কী আছে এতে?"

"দেখো-ই না খুলে!"

কাপড়ের পুঁটলিটা খুলল লোকটা। টাকাগুলি দেখামাত্রই লোভ যেন আর সামলাতে পারছে না! বার বার গুনতে লাগল টাকাগুলি।

"কত টাকা আছে?", জানতে চাইল স্ত্রী আস্তকোয়া। টাকা গুনতে জানেনা মেয়েলোকটি।

"সাকুল্যে চুয়ান্ন রুব্ল।"

"হায় ঈশ্বর! এ তো অনেক টাকা।" হাত বাড়িয়ে টাকাগুলিকে একবার ছুঁয়ে দেখল আস্তকোয়া।

"তুমি কীভাবে উদ্ধার করলে টাকাগুলি?"

স্ত্রী আস্তকোয়া তার বুড়ো বাপের মাথার ফেটিটার ভেতর থেকে কীভাবে টাকাগুলি বের করেছিল, তা সবিস্তারে স্বামীকে বলল। "এই টাকাগুলি তো এখন আমাদের। কী বলো?"।

"সবই ঈশ্বরের দয়া! শেষপর্যন্ত আমাদের কপালেও কিছু জুটল। টাকাটা ধার খাটিয়ে বেশ কিছু চাষের জমি পেয়ে যাব, সন্দেহ নেই। গতকালই স্মোলেজ এসে আমাব কাছে টাকা ধাব চাইছিল। পাঁচ একর চাষের জমি বন্ধক রেখে টাকা নেবে।"

"ধার দেওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা কি হাতে এসে গেছে তোমার?"

"হ্যাঁ, মোট যে পরিমাণ টাকা এখন হাতে আছে তা ধার দিয়ে পাঁচ একর চাষের জমি বন্ধক পেয়ে যাব। রুপোর মুদ্রাগুলি বরং তুমি রেখে দাও তোমার নিজের জন্য।"

আস্তেক পাঁচ একর জমির স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। একটু বাদে হঠাৎ ওর বুড়োর কথা মনে এল। বুড়োর শূন্য বিছানাটার দিকে চোখ পড়লেই ও কেমন খেপে উঠে থুতু ফেলতে লাগল মেঝেতে। বুড়োর চিন্তাটা ওর মাথা থেকে কিছুতেই বেরুচ্ছে না। রাতের খাবার না খেয়েই আস্তেক বিছানায় শুতে চলে গেল। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়ল।

চারপাশে সব নীরব হয়ে গেলে। আস্তকোয়া চুপচাপ পাশের ঘরটাতে গেল। শনগাছের আঁটির নিচে লুকিয়ে রাখা আর একটা কাপড়ের পুঁটলি ও খুঁজে বের করল। তার ভেতর থেকে আগের জমানো কিছু টাকা বের করল। সেগুলির মাঝে বুড়োর কাছ থেকে পাওয়া টাকাগুলি মিশিয়ে রাখল। সবকিছু আবার পুঁটলি বেঁধে সাবধানে শনগাছের আঁটির নিচে লুকিয়ে রাখল আস্তকোয়া। তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে ও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওর স্বামীর পাশে।

এরমধ্যে বুড়ো মানুষটি মারা গেছে। শুয়োরের ভাঙাচোরা ঘরটাতে ঠান্ডায় জমে জমে শেষ

পর্যন্ত একদম মরেই গেল বুড়ো। মরার আগে ক্ষীণকণ্ঠে বুড়ো প্রাণপণ ডাকাডাকি করে গেছে একটু দয়া ভিক্ষে করে। কারও কানে পৌঁছায়নি সেই আর্ত আবেদন। বুড়ো একবার শেষ চেষ্টা করেছিল দরজাটার কাছে শরীরটা টেনে নিয়ে যেতে। পারেনি। বুড়ো টের পাচ্ছিল মৃত্যু কীভাবে এসে ওকে তিলে তিলে গ্রাস করছে। পা থেকে ওপর দিকে বেয়ে বেয়ে উঠছিল মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ। সব ক্রমে অসাড় হয়ে যেতে লাগল। চোয়াল দু'টি ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। বুড়ো শেষবারের মতো শরীরটাকে তোলার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করল, তারপরই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, আতঙ্কগ্রস্ত বিস্ফারিত চোখ দু'টি স্থির হয়ে গেছে। ওই ভাবেই পড়ে রইল নিঃসঙ্গ বুড়ো।

পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই ঘুম ভেঙে গেল আন্তেক ও তার স্ত্রী আন্তকোয়ার। ঘুম ভাঙার সাথে সাথেই আন্তেকের মনে পড়ল বুড়োর কথা। ও চলে গেল শুয়োরের ঘরটার দিকে। দরজাটার ওপর ঠেস দিয়ে পড়ে আছে বুড়োর কাঠ হয়ে যাওয়া লাশটা। অনেক ধাক্কাধাক্কি করে দরজাটা একটু ফাঁক করতে পারল আন্তেক। ভেতরে ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে এল ও। ওর চোখে মুখে এক ভয়ানক আতঙ্কের ছাপ! ওর মুখ দিয়ে কথা সরছে না, ওর শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে!

আন্তকোয়া তখন ব্যস্ত ওর বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে। স্বামীকে দেখে ও জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। "বুড়ো মরেছে তো?" প্রায় নির্লিপ্তভাবে ও জানতে চাইল।

"দরজা বরাবর ওর কাঠ হয়ে যাওয়া দেহটা পড়ে আছে ...", লম্বা-লম্বা শ্বাস ফেলতে ফেলতে লোকটা উত্তর দিল স্ত্রীকে।

"তার মানে স্বর্গে চলে গেছে ...।"

"স্বর্গে চলে গেছে ...!"

"কিন্তু এভাবে তো বুড়োকে ওখানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। লোকজন দেখতে পেলে অনেক কথা বলাবলি করবে।"

"আমাকে তুমি কী করতে বলছ?"

" সে আমি কী করে বলব? একটা ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে।"

"এখানে, এই ঘরের ভেতর যদি বুড়োকে টেনে নিয়ে আসি?", আন্তেক স্ত্রীকে বলল।

" শোনো কথা! ওখানেই বরং বুড়োকে পচতে দাও। এখানে আনা চলবে না।"

"আরে বেআক্কেল! লোকটাকে তো কবর দিতে হবে!"

"সৎকারের খরচটাও কি আমাদেরই দিতে হবে?" বুড়োর মেয়েটি জানতে চাইল ওর স্বামীর কাছে।

"খরচাপাতির দায় তো আইনত বইবে তোমার বোন!"

"তবে তাই হোক! আমেন!"

"আমেন!"

আন্তকোয়া ওর বাচ্চাটির দিকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিল।

আন্তেক আস্তে আস্তে বলল, "বুড়োকে ওখান থেকে বের করে আনতেই হবে।"

"এখানে, এই ঘরের ভেতর?"

"আর কোথায়?"

"তার চাইতে বরং গরুর ঘরটাতে ঢুকিয়ে দাও। গরুগুলিকে বের করে দিয়ে একটা বেঞ্চির ওপর শুইয়ে রাখো বুড়োর লাশটা," বলল মেয়ে আন্তকোয়া।

" বেশ বলেছ! বুড়োকে বের করে আনতে হয় তবে।"

"যাও, বের করে নিয়ে এসো।"

"যাচ্ছি তবে ..."

"তবে কী? ভয় পাচ্ছ নাকি?"

"আহাম্মকের মতো কথা বলবে না!"

"তা নয় তো কী?"

"চারপাশে এত অন্ধকার ...।"

"তবে সকালবেলা সবার চোখের সামনে কাজটা করতে চাও?"

"এসো, তবে দু'জন একসাথে যাই।"

" তোমার উৎসাহ বেশি, তুমিই যাও।"

"পচা মেয়েছেলে। তুমি আসবে, নাকি আসবে না? ওই বুড়োটাতো তোমারই বাপ, আমাব কেউ নয়।" ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্ত্রী ও আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ স্বামীর পেছন পেছন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শুয়োরের ঘরটাতে ঢুকেই ভয়ে দু'জনেরই কেমন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। বরফের মতো জমে যাওয়া বুড়োর দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। ওর অর্ধেকটা শরীর ঠান্ডায় মেঝেব সাথে জমে গেছে। টেনে-হ্যাঁচড়ে সেটাকে ওরা দু'জনে মেঝে থেকে ছাড়িয়ে নিল। ভোরের আবছা আলোয বুড়ো বাপের জমে যাওয়া লাশটার বিকৃত ও ভয়াবহ চেহারা দেখে মেয়ে আন্তকোয়ার শরীর কাঁপতে শুরু করল।

স্বামী আন্তেক স্ত্রীকে বলল, "এসো, হাত লাগাও। জমে পাথর হয়ে গেছ বুড়ো।"

ভোরের হিমেল হাওয়া বইছে তীব্র বেগে। আকাশের গায়ে তখনও কিছু তারা জেগে আছে এদিক-ওদিক। মুরগির ডাক ভেসে আসছে গ্রামের ভেতর থেকে।

আন্তকোয়া চোখ বুজে নিয়ে ওর মরা বাপের কাঠ হয়ে যাওয়া বরফের মতো ঠান্ডা পা দু'টিকে টেনে তুলল। মাথার দিকে হাত লাগল ওর স্বামী। দু'জনে মিলে টেনে-হ্যাঁচড়ে বুড়োর লাশটাকে গোয়ালঘরের বেঞ্চিটার ওপর নিয়ে ফেলল, একটা পুরনো কম্বল দিয়ে চাপা দিল।

বুড়োর শরীরটা খুব নোংরা হয়ে আছে। জল-কাদা লেগে। আন্তকোয়া তার স্বামীকে বলল, "কাউকে ডেকে এনে বুড়োর শরীরটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা দরকার।"

গ্রামে একটা কালা-বোবা লোক ছিল যে এ ধরনের কাজে ওস্তাদ। সে এসে বুড়োর শরীরটা সাফ করে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে দিল। মাথার দিকে একটি মোমবাতিও জ্বালিয়ে দিল।

আন্তেক তারপর বেরিয়ে গেল যাজক ও অন্যান্যদের বুড়োর মৃত্যু সংবাদ দিতে। সবশেষে সে গেল তার শ্যালিকা জুলিনার বাড়িতে খবরটা দিতে, আর ওদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে আসতে

যে, বুড়োর কবর দেওয়া এবং অন্যান্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া-কর্মের সমস্ত খরচ বইতে হবে ওদেরই, যেহেতু বুড়োর সব বিষয়-সম্পত্তি পেয়েছে একমাত্র ওরাই। এ ব্যাপারে তার বা তার স্ত্রী আস্তকোয়ার করবার কিছু নেই।

সবার সাথে আলাপ-আলোচনা করে সাব্যস্ত হল, বুড়োকে কবর দেওয়া হবে মারা যাওয়ার তৃতীয় দিনে। ওইদিন কবরের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই ছোট বোন জুলিনা এসে হাজির হল আস্তকোয়ার বাড়িতে।

দরজায় দাঁড়িয়ে জুলিনা বলল, "ঈশ্বর, পবিত্র যিশুকে আশীর্বাদ করুন!"

বোনকে দেখামাত্র ক্ষোভে ফেটে পড়ল দিদি আস্তকোয়া, "দেখো! একবার, শয়তান মেয়েছেলেটার দিকে চেয়ে দেখো! নিশ্চয়ই নতুন কোনও শয়তানি ধান্দায় এখন এখানে এসেছে। বুড়োটাকে তো শেষ করেছিস! ওর যা ছিল সবইতো হাতিয়ে নিয়েছিস। বেশরমা কোথাকার! এবার আর কিসের খোঁজে এখানে এসেছিস?"

"অনেক কিছুই তো আমি বুড়োকে দিয়েছি, সেসব আমি ফেরত চাইনা। আমার নিজের টাকায় একটা পশমের কম্বল আমি ওকে কিনে দিয়েছিলাম, সেখানা আমার ফেরত চাই," ঠান্ডা গলায় বলল জুলিনা।

"সেটা তোর ফেরত চাই? জানোয়ার কোথাকার! হ্যাঁ, আমি দিচ্ছি তোকে। চিবিয়ে চিবিয়ে সব রস শুষে নিয়ে একেবারে ছোবড়া বানিয়ে আমার কাছে বুড়োটাকে পাঠিয়েছিলি। ওর কাছ থেকে সবই তো হাতিয়ে নিয়েছিস। এখন ওই কম্বলটাও চাই?"

"সব্বাই জানে, বুড়োর কাছ থেকে সব জমি-জমা আমরা নগদ পয়সা দিয়েই কিনেছি। সাক্ষী-সাবুদেরও অভাব নেই।"

"মিথ্যুক হারামজাদি! নিজের পয়সায় কিনেছিস? ঈশ্বরকেও তোর ভয় নেই? চোর, কুত্তি বদমায়েশ মেয়েছেলে! বুড়োটাকে তো শুয়োরের সাথে এক থালায় খেতে দিতিস। হামেশা মার-ধরও করেছিস। বেশরম মেয়েছেলে!"

"মুখ সামলে কথা বল! মুখ থেতলে দেব বেশ্যা মেয়েছেলে কোথাকার!"

"কী বললি পচা মাগি? আয়, তোকে আজ দেখাচ্ছি মজা!"

দু'টি মেয়েছেলে নিমেষে একে অপরের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল চুল ধরে টানাটানি আর সেই সাথে অশ্রাব্য সব গালাগাল। প্রতিবেশীরা সব ছুটে এলে। কাতর ভাবে দু'টি ক্ষিপ্ত বোনকে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই! অনেক হয়েছে, এবার থামো তোমারা। লজ্জা-শরম বলে কি তোমাদের কিছু নেই?"

"হারামজাদি, আমায় ছেড়ে দে বলছি!"

"আজ তোকে আমি ছিঁড়ে ফেলব! নরকের কীট কোথাকার! তোর শেষ দেখে আমি ছাড়ব!"

অবশেষে ক্ষিপ্ত মেয়েছেলে দু'টি মাটিতে পড়ে ধস্তাধস্তি, চুলোচুলি চালিয়ে যেতে লাগল। শুয়োরের বিষ্ঠা আর পেচ্ছাবে দু'টি বোনের শরীর মাখামাখি হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'টি মেয়েছেলেরই চেহারা ভয়ানক ডাইনির আকার ধারণ করল। ক'জন পুরুষ অবশেষে এগিয়ে গিয়ে জোর করে দু'টি হিংস্র বোনকে আলাদা করে দিল।

বড় বোন আন্তকোয়া কান্নায় ভেঙে পড়ল, "হায় ঈশ্বর! তুমি এই পচা-গলা ম্লেচ্ছ মেয়েমানুষটার বিচার করো ...।"

অন্য বোনটি ততক্ষণে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়ে প্রাণপণ চিৎকার ও গালাগাল শুরু করেছে। গ্রামের মানুষজন দু'টি বোনের এমন কান্ড-কারখানা দেখে অবাক হল, বিশেষত আজকের দিনে! ওরা সবাই দু'তিনজন করে বাড়ির ভেতর গিয়ে কফিনে শায়িত বুড়োকে শেষবারের মতো দেখে প্রার্থনা করে আসছে।

অবশেষে যাজকমশাই এলেন, সঙ্গে এক অর্গ্যান-বাদক।

কফিন-বন্দি বুড়োকে বাড়ি থেকে বের করে এনে ঘোড়ার গাড়ির ওপর রাখা হল। গ্রামের মেয়েরা তাদের সামাজিক প্রথা মাফিক বিলাপের গান গাইতে শুরু করল। মৃতকে নিয়ে কবরখানার উদ্দেশে শোকযাত্রা শুরু হল গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ ধরে। অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

শবযাত্রার শুরুতেই আছেন যাজকমশাই। তিনি যথাবিহিতভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন। সুর করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন মৃতের আত্মার শান্তিকামনায়। তিনি তার নির্দিষ্ট অন্তরীয়ের ওপরে পরে আছেন সাদা ঢিলে-ঢালা শ্যামলা, আর তার বাইরে পশমের এক আলখাল্লা। ঠান্ডা হিমেল বাতাসে সব জমে যাচ্ছে। যাজকও একদমই উপভোগ করছেন না এই পরিস্থিতিটা।

রাস্তার ধারে মাঝে মাঝেই গ্রামের মেয়ে-পুরুষদের ছোট ছোট জটলা। ওরা মাথা নুইয়ে মৃতকে সম্মান জানাচ্ছে, ক্রুশচিহ্ন আঁকছে আর বুক চাপড়াচ্ছে।

বুড়োর নাতি ইগ্‌নাজ সবার আগে একটি কালো ধ্বজা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধ্বজাটির গায়ে স্বর্গ এবং নরকের ছবি আঁকা। ভীষণ ঠান্ডা আর বাতাসের মধ্যেও ছেলেটি গর্বভরে ধ্বজাটি কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, জোরে জোরে প্রার্থনার গান গাইতে গাইতে।

আন্তেক তার মস্ত দেহটা নিয়ে এই প্রচন্ড ঠান্ডায় বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। তার আসল দায়িত্ব ঘোড়াগুলি আর গাড়িটাকে সামলানো। এবড়োখেবড়ো গ্রামের রাস্তায় এটা এক কঠিন কাজ। সেই সাথে সামলাতে হচ্ছে কফিনটাকেও।

ওই দিকে বুড়োর দুই মেয়ে কফিনের পেছন পেছন হেঁটে চলেছে বিড়বিড় করে প্রার্থনা আওড়াতে আওড়াতে। ফাঁকে ফাঁকে রক্তচক্ষু করে একে অপরের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে। বাড়ির পোষা কুকুর সুত্‌সুও সাগ্রহে ঢুকে পড়েছে মিছিলের ভেতর, কিছুতেই ওটাকে তাড়ানো যাচ্ছে না। এদিকে বাতাসের গতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সবাই ঠান্ডার চোটে কাবু হয়ে পড়েছে। ভয়ানক দুর্যোগে অনেকেই শোভাযাত্রা ছেড়ে নিজ নিজ বাড়ির দিকে রওনা দিল।

বেশ কিছুক্ষণ লাগল ওদের কবরখানায় পৌঁছাতে। কবর অবশ্য আগে থেকেই খোঁড়া ছিল। বুড়োর কফিন কবরের গর্তে নামিয়ে দেওয়া হল। যাজকমশাই পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন কফিনের ওপর। মাটি আর বরফে ভরে দেওয়া হল কবরের গর্ত।

তুষার-ঝড়ে কাবু হয়ে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষজন যে যার বাড়ির উদ্দেশে ছুটে পালাল।

আন্তেক, তার ছেলে ইগ্‌নাজ, স্ত্রী আন্তকোয়া আর গ্রামের সেই চাষি স্মোলেজ, চারজনে মিলে এক সরাইখানায় গিয়ে ঢুকল। বুড়োর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া টাকাগুলি এই স্মোলেজকে ধার দিয়েই আন্তেক পাঁচ একর চাষের জমি পাবে বন্ধক হিসেবে। সেই মতো সব কথা পাকা হয়ে

গেছে দু'জনের মধ্যে। সরাইখানায় গিয়ে চারজনে মিলে পেট ভরে মদ-মাংস খেল। তারপর ওরা বেরিয়ে এল। স্মোলেজ অবশ্য এল না। আন্তেকের কাছ থেকে এতগুলি টাকা ধার পাবে ভেবেই ও আত্মহারা। সেই আনন্দে আরও কিছু মদ গিলতে ও রয়ে গেল সরাইখানায়।

আন্তেকের পেটে মদ একটু বেশিই পড়েছে। সে নিজেকে সামলে রাস্তায় চলতে পারছে না। ওর স্ত্রী আন্তকোয়া হাত ধরে টানতে টানতে ওকে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

নেশার ঘোরে লোকটা বলতে শুরু করল, "পাঁচ একর চাষের জমি, পুরোটাই আমার হাতে আসবে! শুনতে পাচ্ছ তো? শরৎকালে গম ও বার্লি, আর বসন্তে আলুর চাষ করব আমরা। সব আমাদের, সব কিছু। ঈশ্বরের অসীম দয়া ..।"

হঠাৎ লোকটা গান গাইতে শুরু করল।

"মুখটা বন্ধ করবে এবার? মুখ থুবড়ে পড়লে আর দেখতে হবে না, বলে দিলাম," স্ত্রী আন্তকোয়া মাতাল স্বামীকে সাবধান করে।

তুষার ঝড় ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে, চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তারই মাঝে পথ হাতড়ে এগিয়ে চলল ওরা। কিছুদূর যাওয়ার পর ওদের রাস্তায় পড়ল জুলিনা আর টমেকের বাড়ি। ভেতর থেকে লোকজনের কথাবার্তা কানে ভেসে আসছে। মাতাল আন্তেক ওদের গলার আওয়াজ শোনা মাত্রই আবার খেপে উঠল, চেঁচিয়ে বলতে শুরু কবল, "ম্লেচ্ছের গোষ্ঠী, বাটপারের দল! একবার হাতে আমি ওই পাঁচ একর জমি পাই, তারপর তোদের দেখাব মজা ...।"

স্ত্রীর হাত ধরে এগিয়ে চলল আন্তেক। এক সময় বাড়ি পৌছল। লোকটা মরার মতো পড়ে রইল কিন্তু ওর ঘুম এল না। একটু বাদেই ছেলেকে ডাকল চিৎকার করে, "এই ইগ্‌নাজ?"

ছেলেটি হাজির হল বাপের কাছে।

"এদিকে শোন্, বদমাশ ছেলে! তুই একদিন এক মস্ত ইজ্জৎদার চাষি হবি, দেখে নিস্। ভিখারির মতো জীবন তোকে কাটাতে হবেনা!" ছেলের উদ্দেশে চিৎকার করে কথাগুলি বলে মাতাল বাপটি বিছানায় সজোবে একটা ঘুষি চালাল।

"হারামির বাচ্চারা, সবাই শুনে রাখ্, ওই পাঁচ একর জমি এখন থেকে আমার ...!"

— ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল লোকটা।

নিধুভূষণ হাজরা

ভাড়াটে

অবশেষে জমিটুকু কেনা হ'ল। এটুকু করতেই নমিতার সঙ্গে সুকুমারের ঠান্ডা লড়াই কম হয়নি। নমিতা কিছুতেই গয়না দেবেনা। সে বলেছে, জমি কেনার মরোদ নেই, আমার মরা বাপের দেওয়া সামান্য গয়না হাতানো কেন? গয়না বন্ধক দিয়ে মাসে সুদ গুনে জমি কেনার দরকার নেই। সেই থেকে সুকুমার নমিতাকে জমি কেনার কথা আর বলে না। ভাড়াটে বাড়িতেই কাটছে বছরের পর বছর।

মাঝে মাঝে অন্যদের দেখে সুকুমারের এক টুকরো জমি কেনার ইচ্ছে যে হত না এমন নয়। কিন্তু সেই প্রবল বাসনা চরিতার্থের একটাই লক্ষ্য খুঁজে পেত সে, তাহল প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। কখনও ভেবেছে পি-এফ থেকে টাকা তুলে জয়গুরুর নাম নিয়ে ঝাঁপ দেবে। তাও হয়ে ওঠে না নমিতার নিমিত্তে। নমিতার এক একবার বাচ্চা হয়, তখন যমে মানুষে টানাটানি। সুকুমার পি-এফ থেকে টাকা তুলে ডাক্তার, নার্স, রক্ত, ভাল ভাল পথ্য নিয়ে ছুটোছুটি করে। পনর মাসে পি-এফ এর টাকা শেষ হতে না হতেই নমিতার পেটে আবার বাচ্চা আসে, পোয়াতি হয়ে পড়ে। আবার পি-এফ থেকে লোন। ভিক্ষুণীর ছোট ছেঁড়া কাপড়ের মত, মাথায় কাপড় টানতে বুক ফাঁকা হয়ে পড়ে। পি-এফ এর টাকা জমে চার সংখ্যা হতে পারে না। জমি কেনার ইচ্ছেটা সুকুমারের বুকের ভেতরেই কখনও কখনও দাপাদাপি করে জবাই হয়ে আফিসের ফাইলের ভেতর শান্ত হয়ে যায়।

নমিতার শখ ছিল একটা ছেলের। দু'মেয়ের পর ছেলে টিঙ্কু হবার পর ছয় মাসের মধ্যে সুকুমার ভি-এম হাসপাতালে নিয়ে ভেসেকটমি করিয়ে নেয়। সুকুমার এখন তিন সন্তানের বাপ। আর বাচ্চা হবেনা! ভেসেকটমি নিয়েও কম হুজ্জতি হয় নি। স্বামীস্ত্রীর একজন হলেই হল। নমিতার ভয় সুকুমারের অস্ত্রোপচার হলে যদি কমজোরি হয়ে সাধু হয়ে যায়, তার ওপর আদর কমে যায়, তাহলে সর্বনাশ! সে নিজেই অস্ত্র অপারেশন করাবে, তবু ত রোজগারি লোকটা পঙ্গু হবে না।

পরের দিন অফিসের টেবিলে জমানো কয়েকটি জরুরি ফাইল থাকা সত্ত্বেও সুকুমারেরর মন বসছে না। সে ভাবছে, ঘর তাকে করতেই হবে। একটা ঘর, শুধু একটা ঘর। একটু আলো একটু শান্তির নিঃশ্বাস। সে একটা সাদা কাগজে হিসেব করছে। পাঁচ ভরি গয়না দিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বা ইউ-বি-আই থেকে দশ হাজার টাকার বেশি পেতে পারেনা। শতকরা বার্ষিক সুদ আঠার টাকা, তারপর তিন মাস পর পর সুদেরও সুদ বাড়ে। সে আরও হিসেব করে দেখে, দশ হাজার নিলে বছরে হাজার টাকা সুদ হবে। বছরের সংখ্যার সঙ্গে চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণ দেখে হঠাৎ আঁতকে ওঠে সুকুমার।

মনে পড়ে শ্বশুরের শেষের দিনের কথাগুলো। নমিতাকে বলেছিল, খুব বিপদে না পড়লে গয়নাগুলো হাত ছাড়া না করতে। সুকুমার আতংকে অস্থিরতায় হিসেব করা কাগজটা পাশের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে। সুকুমার ক্লান্ত, বিমর্ষ, দুর্বল। সম্মুখের ফাইলগুলো মলিন শুষ্ক অর্থহীন হয়ে ওঠে। অব্যক্ত ব্যথায় সে চুপ করে বসে থাকে। আফিসের এই মাঝারি কক্ষটায় আরও অনেকে বিভিন্ন টেবিলে কাজ করছে। আছে জয়া রায়,শুভেন্দু দত্ত, ইউ-ডি-সি সুমিত ভট্ট, হেড্ক্লার্ক

অরুণাভ দাস। আরও কয় জন নিমাই, সুমেরু এবং খুকু চৌধুরি নামের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা। একটা যৌথ পরিবারের মতই সবাই সবার সুখ দুঃখের গোপন কথা জানে। জয়া রায়ের বয়স চল্লিশ গড়াচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা মার কথা ভেবেই জীবনে সাত পাঁকে বাঁধা মুখচন্দ্রিকা হল না। ওঠে নি কপালে সিদুঁর। জয়ার বাবা মার দায়িত্ব নিতে উদার কেউ এলো না। শুভেন্দুর মাথায় টাক পড়ে গেছে। চাকুরি করা গৃহকর্ম নিপুণা কেউ আসে নি। পত্রিকায় বারবার বিজ্ঞাপন দিয়েও কোন সাড়া পায় নি। নিমাই সুমেরু অফিসের কাজ সেরে ছয়টা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত আগরতলা শহরে রিক্সা চালায়। সুমিত ভট্ট তিন তিনটে টিউশনি করে।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় সুকুমার অফিসে বসেই একটা মিছিলের শব্দ শুনছে। মিছিলটা ওদের আফিস লেন দিয়ে পুবদিকে দীপ্তপদক্ষেপে যাচ্ছে। শ্লোগানে মুখর। ওরা টেবিল ছেড়ে দোতলায় এল। জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

মিছিলটা মাস্টারদের হেলে দুলে মিছিল নয়। কেরানি বাবুদের পান চিবানো সাইকেলে ভর দেওয়া মিছিল নয়, চতুর্থ শ্রেণি, কর্মীদের ঝুলে পড়া মন্থর মিছিলও নয়, কৃষকদের বাচ্চা বুকে গামছা নিয়ে পদযাত্রাও নয়। এ মিছিল শ্রমিকদের তেজি ঘোড়ার খুরের আঘাতে মাটি কাঁপানো মিছিল, শ্লোগানের শব্দ মাইক্রোফোনের ভেতর থেকে দুপাশের মানুষকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসছে রাস্তার দুধারে।

মিছিলটা হাঁপুরে ফুঁ দিয়ে দিয়ে কামারের নেহাইর মধ্যে ফেলে দু'পাশের মানুষগুলোকে সাঁড়াশি দিয়ে নেড়ে চেড়ে পরখ করে দেখছে। হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে তৈরি হয় শক্ত হাতিয়ার। মিছিল মনের মরিচা মোছার মহৌষধি।

মিছিলের বিরাট হাঁ-করা মুখ থেকে শব্দ তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে, দ্রব্য মূল্য বাড়ছে কেন, কেন্দ্রীয় সরকার, জবাব চাই, জবাব দাও। বিচ্ছিন্নতাবাদ নিপাত যাক। জাতি উপজাতি ভাই ভাই। দুনিয়ার মজদুর এক হও।

সুকুমার, জয়া, সুজিত, সুমেরু ওরা দেখছে মিছিলটা সাপের মত ফেস্টুনের ফণা তুলে এঁকেবেঁকে চলছে। একদিন গুণগত পরিবর্তনে কোমরে পায়ে জোর পেলে ব্যাঙ এর মত লাফাবে। লাফের প্রতি ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়বে সোনালি রোদ, সবুজের মেলা, আর অফুরন্ত হাসি।

মিছিল দেখতে সবাই গেলেও বড়বাবু প্রমোদ রায় যান নি। তিনি সুকুমারকে বললেন, মিছিল দেখে কি হবে? কত সময় নষ্ট করলেন। সুকুমার মুখ তুলে বললো, অর্থনৈতিক দাবী। ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না। সুকুমার এবার চোখ তুলে বললো, অর্থনীতিই যে ইতিহাসকে ভাঙছে গড়ছে, ভূগোলের নক্সাটাই পালটে দিচ্ছে। বড়বাবু আর কথা বাড়ান নি। সুকুমারও টেবিলে এসে বসে।

অফিস কক্ষে শেষ বেলায় কাজ হচ্ছে। সুকুমারের মন ভাল নয়। সে তাই একটা স্থানীয় সংবাদ পত্র পড়ছে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই বিজ্ঞাপনের কলমে ওর চোখে পড়ে তৈরি ঘর বিক্রী। সুকুমার পড়তে থাকে একাগ্র হয়ে, বনমালীপুর দিঘির পাড়ে একটি তৈরি ঘরের সবটাই বিক্রী হবে। দাম-পাঁচ হাজার টাকা। বিজ্ঞাপনে মালিকের নাম ঠিকানা ইত্যাদি ছিল। পত্রিকায় আরও সংবাদ ছিল, কমলপুরে টি-এন-ভির আক্রমণে তিন বাগিচা শ্রমিক হত। ত্রিপুরাকে উপদ্রুত অঞ্চল

ঘোষণার দাবী, মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর শোক, চিলড্রেনস পার্কে ড্রেনের ধারে বারবনিতার মৃতদেহ, হাই কমান্ডের জরুরি তলব পেয়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পরেশবাবুর দিল্লী যাত্রা, জাতি উপজাতি মিলনে সহরে দীপ্ত-মিছিল। কমলপুর বন্ধ, আরও কত কত খবর।

সুকুমার অন্য সব খবর পড়ার আগেই বিজ্ঞাপনের খবরটা কাগজে টুকে নিল। সুকুমারের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ছাত্র জীবন থেকে। ইদানিং পরিবারের খরচ চালিয়ে পত্রিকা রাখতে পারেনা। সন্ধ্যায় হরিপদের দোকানে গিয়ে পঞ্চাশ পয়সায় এক কাপ চা পান করে, ষাট পয়সার খবর মাথায় বয়ে আনে।

আজ বাড়ি ফিরেই সুকুমার পত্রিকার বিজ্ঞাপনটার কথা নমিতাকে শুনাল। নমিতা অবাক হয়ে শোনে। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনেক অনেক দিন পর যেন এক ফালি রোদ ঘরের ফোঁকর দিয়ে দুজনের মুখে পড়ে উদ্ভাসিত করে দিল। মনে হলো যেন ওরা লটারি পেয়েছে।

নমিতার তর সইছে না। সে যেন এক্ষুণি বনমালীপুর দিঘির পাড়ে উড়ে গিয়ে দেখতে চায়। সে সুকুমারকে বলল, তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুণি যাবো। সুকুমার বলে, আজই কেন, কালকে গেলে হয়না? নমিতা গলা ঝেড়ে, সব কাজেই তোমার দীর্ঘসূত্রিতা।

ওরা চার নম্বর রামনগর রাস্তার মুখে শঙ্কর চৌমুহনীতে এসে পৌছে একটা রিক্সা ডাকে। অন্য সময় নমিতা বণিক, রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করে। আজ করলো না।

নমিতা সুকুমার রিক্সায় গড়িয়ে গড়িয়ে বনমালীপুর দিঘির পাড়ে ঠিকানা মত পৌছায়। সুকুমার ঘরটি দেখছে। নমিতা যেন ঘরটাকে চুম্বন করছে। এই মুহূর্তে সে যেন টিঙ্কুর মত ঘরটাকে আদর করতে চাইছে। ওরা দেখলো টিনের ঘরটার গা ঘেঁষে পুবদিকে তিনতলা বাড়ির দোতলা উঠে গেছে। নমিতা চোখ তুলে দেখলো। বাড়িটা কত উঁচুতে উঠছে। তিন বছর আগে আশ্রয়ের জন্যে বাড়ির মালিক ঘরটা তৈরি করেছিল। সরকারি চাকুরির টাকা নয়ছয় হওয়া বিভাগের বড়কর্তা হওয়ার দৌলতে কপাল ফিরেছে। এখন টিনের ঘরটা বিক্রী হয়ে যাবে। ওখানেই তৈরি হবে, লালিত ফুলবাগান, ট্যাক্সির গ্যারেজ।

ঘর বিক্রির কথা উঠতেই মালিক ভদ্রলোক জানালেন, সকাল থেকে পনর জন ঘরটা কিনতে এসেছেন। দরাদরি হচ্ছে। এক্কেবারে তৈরি করা ঘর; শুধু উঠিয়ে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া।

সুকুমার কিছু দর কমাবার জন্যে বিনীত ভাবে ভাড়াবাড়ির দুঃখের বারমাস্যা এবং নিজের অক্ষমতার কথা জানালো। সে আরও জানালো, আগরতলার বাড়িওলা নয়, যেন জমিদারের বাচ্চা। গত দশ বছরে ষাট হাজার টাকার জমির দাম বিশ লক্ষ টাকা হয়ে গেছে। ভদ্রলোক একটু মৃদু হাসলেন। সুকুমার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার একদিন হাতে সময় রেখে অফিসের ফোন নাম্বার দিয়ে এল। মালিক যদি কিছু না কমান , তাহলে প্রস্তাবিত টাকায়ই সে কিনবে এটাই প্রতিশ্রুতি দিল।

সুকুমার নমিতা বাড়ি ফিরছে। নমিতা পথে আসতে আসতে ঘরটাকে কেমন করে সাজাবে, কোথায় টিঙ্কু খেলবে, মেয়েটার পড়ার টেবিল কোথায় পড়বে, নিজের শোবার খাট কি করে রাখবে, ঠাকুরের আসন কোথায় থাকবে, এসবের একটা পরিকল্পনা করছিল। এতদিন ভাড়া বাড়িতে ফিরেছে, মনের মত কিছু করতে পারেনি। একটা ফুলগাছ একটা তুলসিতলাও মনের মত করতে পারে নি। বিয়ের পর ওরা পাঁচবার বাড়ি পালটেছে। সুকুমার দু'একবার কথা বলতে বলতে

নমিতাকে প্রশ্ন করছে। নমিতা অন্যমনস্কের মত হাঁ-হুঁ-শব্দ করছে মাত্র।

একদিন পর সুকুমার পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বনমালীপুর দিঘির পাড়ে গিয়ে দেখে ঘরটা ভাঙা হচ্ছে। কত লোকজন। সম্মুখে ঘরটাকে তুলে নিতে একটা বড় ট্রাক তৈরি হয়ে রয়েছে। সুকুমার থ বুনে গেল। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে সুকুমারকে বললেন, গতকাল বিকেলেই একজন লোক ছয় হাজার টাকা দিয়ে যায়। আজ ঘরটাকে ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। সুকুমারের আর কথা শোনার ইচ্ছে হল না । সে বাড়ি ফিরছে । পা দু'টো দেন ওর বড়ো ভার ভার মনে হচ্ছে। সে শুধু ভাবছে, নমিতাকে গিয়ে সে কি বলবে।

নসরত বিবির শাড়ি

নসরত যে এমন কান্ড বাঁধাবে কেউ ভাবতেই পারেনি। বাড়ির কাইজ্যা বাজারে নিয়ে এসেছে। বটগাছের নিচে যেখানে দিনমজুররা দা, ঝুড়ি, কোদাল নিয়ে অনিশ্চিত রোজগারের আশায় বাবুদের পথ চেয়ে বসে থাকে, তার পাশ দিয়ে গলি পথে ঢুকে আকবর আলী যেখানে আড্ডা দেয়, সেখানেই চেঁচামেচি শুরু করে দেয় নসরত। আকবরকে এখানে পায়নি , তবু আকবরের উদ্দেশে কথাগুলো থুথুর মত ছুঁড়ে মেরেছে, যাতে সাকরেদরা আকবরকে বলে। থুথুতে জীবাণু থাকে। জীবাণু শুধু আকবরকেই আক্রমণ করেনি, অন্যদের গায়েও ছিটে-ফোঁটা লেগেছে। পাশে বসেছিল মালতীর ভাই, শচীন্দ্র।

আকবর নসরতের খসম। কয়দিন থেকে নসরতের বাড়িতে শান্তি নেই। একথা ওকথা শুনছে। রাত করে বাড়ি ফিরে। আকবর ঠিকমত নমাজ পড়ে না। রাই সখির গান গায়। নসরতের সঙ্গে কথা কম কয়। বেহুঁশের মত ঘুমায়। নড়চড় থাকে না। মেয়ে বিয়ে দিয়েছে, ছেলে বড় হয়েছে। ছেলের নাম জাফর। আজ বাপের সঙ্গে যোগালীর কাজ করতে পাঠায় নসরত। কিন্তু ঘন্টা খানেক পর ফিরে এসে বাপজানের নামে নালিশ করে, —তাতেই নসরত খেপে যায়। ছুটে আসে বাজার পর্যন্ত।

দূর্গা চৌমুহনীর উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে এঁকেবেঁকে কাটাখাল। আগরতলা শহরে যাতে জল ঢুকতে না পারে তার জন্যে দক্ষিণ তীর উঁচু করে বাঁধানো। আগরতলার চার দিকটাই পরিখায় ঘেরা। রঘুনন্দন পাহাড় থেকে হাওড়া নদী চন্দ্রপুর এসে যে অংশটা ডান দিকে বয়ে এসেছে , তার নামই কাটাখাল। এই কাটাখালের উত্তর তীর ঘেঁষে বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ছোট ছোট শনের ঘরে বাসা বেঁধেছে আকবর, অনিল, নিরঞ্জন, নিকুঞ্জ, মইনুদ্দিন, আতর আলী, শচীন্দ্র, মদন, আরও অনেক অনেক মানুষ। আকবর রাজমিস্ত্রী, আতর আলী সানাই বাজায়, নিরঞ্জন রিক্সা চালায়, মদন কাঠমিস্ত্রী।

কয়দিন আগে আকবর মালতী বনমালীপুর থেকে বিকালে কাজ সেরে আসার সময় বিজয়কুমার

স্কুলের পূর্ব পাশে রাস্তার ওপর ইটের স্তূপ দেখে একটা নতুন কাজ ঠিক করে। সব সময় হাতে কাজ থাকে না। যখন দু-চার পাঁচটা কাজ হাতে জমে পড়ে, তখন সব কাজের সামান্য সামান্য করে ধরে রাখে। বকুনিও খায়। বাবুরা গালি দিয়ে বলে, রাজমিস্ত্রিরা হারামি।

আকবর আলী যে শুধু নতুন কাজ খোঁজে তাই নয়, সিভিল সাপ্লাইতে কখন সিমেন্ট আসে, কোন্‌বাবু কত ব্যাগ পারমিট পেয়েছেন, কোথায় লোহার রড কম দামে মেলে, এ সব সংবাদও রাখে। শহরে কে কে সিমেন্টের ব্ল্যাক করে, এসব খবরও আকবর আলীর জানা। অনেক অনেক উজ্জ্বল ভদ্রলোকের ছবি তখন আকবর আলীর কাছে বিড়ালের মত নির্লজ্জ।

গত কয়দিন ধীরেন দেববর্মার বাড়িতে কাজ হচ্ছিল। বাড়ির মালিক ইটের কাজ কম বোঝে। সৌন্দর্য প্রিয়, নিরেট কাজ চায়। আকবর প্রথম আলাপেই বুঝেছে। আকবর মালতীকে ভালভাবে কাজ শিখিয়ে রাজমিস্ত্রি তৈরি করেছে। রোজ আকবর আলীর পঁচিশ টাকা, মালতীর বাইশ টাকা; যোগালীদের কারো পনের, কারও দশ, কারো চৌদ্দ। তার মাঝে মেয়ে, পুরুষ, কিশোর-কিশোরীর ভাগও আছে।

আকবর আলী সকল যোগালী থেকে পাঁচ টাকা বখরা পায়। এখানে শহিদবেদীর মালা থেকে রাজভবনের মিষ্টি সরবরাহ পর্যন্ত অলিখিত বখরা প্রথার পরিধি প্রসারিত। প্রতিবাদ করলে রুজি বন্ধ, রোজা অত্যাবশ্যক বিধিলিপি। যোগালী যত বেশি আকবরের লাভও তত বেশি। যোগালীরা আকবরকে পীরের মত ভয় পায়। মালিকের কাছে আকবর একথা ওকথা পাঁচ কথা বুঝিয়ে দেয়। আজ পাঁচজন যোগালীর সঙ্গে ছেলে জাফর এসেছিল। মালিক বেশি লোক নেবে না। জাফর ফেরত যায়। অথচ মালতীর ভাইপো পিন্টু রয়ে গেল! তাই নসরত বাজারে এসে নাস্তানাবুদ করে গেছে।

মালতী, শচীন্দ্রের কিশোর ছেলে পিন্টু, ইলা, কমলা, মমতাজ, ইন্দ্র, সুরেন্দ্র; তাদের নিয়েই আকবর আলীর রাজমিস্ত্রির টিম। ইটের কাজের সঙ্গে কাঠের কাজ পেলে আকবর অনিলকে দেয়। অনিলও কাঠমিস্ত্রির টিম করেছে। মাটির ট্রাক সাপ্লায়ার ফণী দে, আকবরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

আকবর আলী অনেককে কাজ শিখিয়েছে। হরি দেবনাথের চাকুরি গেলে হরিকে যোগালীর কাজে নিয়ে তার কচি বৌ আর শিশু মেয়ের দানা-পানীর সুরাহা করে।গতর খেটে হরি রাজমিস্ত্রি কাজ শিখে পগারপার। এখন নতুন সেও টিম করেছে। কিন্তু হরির সঙ্গে নসরতের যে একটা যোগাযোগ রয়েছে সেটা মাঝে মাঝেআকবরের মনে খোঁচা দেয়। একবার তিনতলা বাড়িতে বাঁশের মাচাং-এ দাঁড়িয়ে কাজ করার সময় আকবর পড়ে যায়। দুমাস জি. বি হাসপাতালে কাটাতে হয়। হরি, নসরত শিয়রে বসা। তখনই ওদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। হরি প্রকাশ্যে বলেছে, সুন্দরী নসরতের হাতের পান না খেলে হরির পেটের ভাত হজম হয় না। হরি বলে, নসরত বিবি তুকতাক জানে।

আকবর কাজ জোগাড় করে, যোগালীকে ধমক দেয়। ইলা, মমতাজ, লীলা না পারলে— নিজেই মাল কোঁচা দিয়ে কোদাল নিয়ে 'নেওয়া' কাটা দেখিয়ে বলে, দেখ্ বেটি, এভাবে কাজ কর। আমরা মজুর, গতর খেটে মালিকের মন রাখি। গতর নেই, পয়সাও নেই। নিজে সেপটিন ভেঙ্গে কিশোরী মেয়ে কমলাকে কাজ শেখায়।

দুপুর গড়াতেই মালতী মশলা 'কুনির' পিঠ দিয়ে দ্রুত ঘষতে ঘষতে ইলাকে বলে, চেয়ে আছ

যে, ইট টান, 'সলটা' সোজা করে ধর। আজ পয়লা মে-র মিছিলে যেতে হবে। কিছু দূরে মালিক ইজিচেয়ারে শুয়ে সিগারেট টানছেন। তিনি বলছেন, তোমরা মিছিলে যাবে নাকি? মালতী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোমরটা বাম হাতে ঘষতে ঘষতে বলল, হ্যাঁ বাবু, আজ মিছিল, একটু আগে ছাড়বেন।

ধীরেনবাবু বললেন, পয়লা মে-র মিছিল কেন হয় জান? আকবর বললে, বাবু, শুনেছি একটা কিস্ছা আছে। পার্টির লোকেরা ডাকে, —লাল ঝান্ডা আর ফেস্টুন উড়ায়ে যাই, পায়ে পায়ে হাঁটি, টান টান হয়ে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, দুনিয়ার মজদুর এক হও, বলে শ্লোগান দি। মিটিং-এ অনেক কথা শুনি, কিস্ছাটা শুনি নাই। মইনুদ্দিন বলেছিল, লাল ঝান্ডার অনেক কিস্ছা। আগরতলার বড় বাবুরা বলে, আমরা কমিউনিস্টদের ভোটের ক্ষেত। আমরা মুখ্যু মানুষ, বাড়ি বাড়ি যাই, কত বাবু কত রকম দেখি, কে কোন মতের জানি না, তাই মুখ খুলি না।

ধীরেনবাবু বললেন, তোমরা পয়লা মের গল্পটা শুনবে? তাহলে বলি, শোন।

আমাদের এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দেশ আছে। আমেরিকাও একটা দেশ। ওখানেই শিকাগো নামে একটা শহর। কি একটা হিসেব করে ধীরেন দেববর্মা বলতে থাকেন, আটানব্বই বছর আগে ঐ শহরে অনেক রাজমিস্ত্রি বাস করতো। রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা মালিকদের বাড়ি কাজ আর কাজ। বিশ্রাম ছিল না, আনন্দ ছিল না, কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। ধীরেনবাবুর মুখে রাজমিস্ত্রি কথাটা শুনেই বিষ্ণু, কমলা, ইলা দাঁড়িয়ে পড়ে! মালতী কপালে ঘাম মুছে দাঁড়ায়। ধীরেনবাবু বলতে থাকেন, —এই মজুররা দল বেঁধে সভা করে। পয়লা মে-তে ওরা আট ঘন্টা বিশ্রাম আর আট ঘন্টা ছেলে-মেয়ে নিয়ে আনন্দ, এই দাবি নিয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো। মালিকরা দাবি মানলো না। পুলিশ গুলি ছুঁড়লো। বিষ্ণু, ইলা, কমলা চমকে ওঠে! চারজন শ্রমিক গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। অন্য শ্রমিকরা ওদের রক্ত দিয়ে সাদা পতাকা লাল করে নিল। মালতী চোখ বড় বড় করে বললে, —এ জন্যই আমাদের পতাকা লালে লাল।

আকবর আলী বললে, —বলেন বাবু, কিস্ছাটা কন বাবু, ভাল লাগছে।

ধীরেনবাবু বলে চলেন, সারা দুনিয়াব্যাপী লাল ঝান্ডার অনেক কাহিনি। তারপর বিচারের নামে প্রহসন হল। শ্রমিক নেতাদের নিয়ে জেলে পুরলো। চারজনের ফাঁসি হল। পারসন নামে এক নেতা ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পরতে বললেন, স্বাধীনতাই রুটি, রুটিই স্বাধীনতা। অনেক অনেক পরে সারা দুনিয়া মেনে নিল আট ঘন্টার কাজ। তাই-তো দশটায় আস পাঁচটায় যাও। শিকল ছাড়া মজুরের হারাবার কিছু নেই, মুক্তি ছাড়া পাবার কি আছে? সারা ভারতব্যাপী রুটি কাপড়া মোকানের লড়াই। সংগ্রামের ময়দানে মানুষের অনেক কৃত্রিম বেড়া ভেঙ্গে যায়।

মিছিল চলছে। পয়লা মে-র মিছিল। মালতী, বিষ্ণু, মমতাজ আগে আগে এসে ঝান্ডা তুলছে। অকবর, শচীন্দ্র দু-ধারে ফেস্টুন ধরেছে। কিস্ছা শুনে তারা যেন হাতে কোমরে পায়ে ভীষণ জোর পেয়েছে। চিলড্রেন পার্কে মিটিং-এর শেষের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি। ওরা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরে।

সারা রাতভর বৃষ্টি। দোসরা মে-তেও বৃষ্টি। আগরতলার আকাশ গাঢ় মেঘে ঢেকে আছে। শুনেছে বড়মুড়ার উজানে বেদম বৃষ্টি হচ্ছে। কাটাখালের উত্তর তীরের মানুষের চোখে ঘুম নেই! কাটাখালের তীর ভেসে ঘর-বাড়ি ডুবছে। ভাতের হাঁড়ি ভাসিয়ে নেবার স্রোত আসবে কাটাখালে। পাহাড়ি নদী এমনিতে শান্ত, রাগলে শুখরো সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে।

প্রগতি স্কুলের দোতলায় আশ্রয় নিয়েছে উত্তর পাড়ের মানুষ। আকবর আলীর বাড়ি টিলার ওপর। আকবর, মালতী আর তার দুটো মেয়েকে নিয়ে ছুটে আসে আশ্রয়ের খোঁজে। স্কুলের রুমগুলোতে মানুষ গিজগিজ করছে। অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, শিশু একাকার। এম এল এ, এম পি, কমিশনাররা দেখে গেছেন। সরকার থেকে দু-মুঠো চিঁড়া তিনটে বাতাসা দিয়েছে। এস ডি ও অফিসের বাবু—নামের লিস্ট করছে। মাথাপিছু তিন টাকা, পাঁচশ গ্রাম চাল দেবে। বছরে বর্ষার সময় দু-তিনবার এমন হয়।

মালতী তার দুটি মেয়ে সহ ভিজে কাপড়ে বসে আছে। আকবর মালতীকে শরীর গরম করার জন্যে একটা বিড়ি দিল। মালতীর সোয়ামী কয় বছর আগে মালতীকে ছেড়ে বিশালগড় চলে যায়। ওখানে একটি লস্কর মেয়েকে বিয়ে করে দু'জনে রবার বাগানে কাজ করে। এখন তিন জনের ছোট সংসার মালতীর রোজগারে চলে। উপোষ দেওয়ার কথা শুনলেই মালতীর শরীর হিম হয়ে পড়ে, পেট মোচড় দিয়ে ওঠে!

শচীন্দ্র অনেক দিন থেকেই খেপে আছে। শুধু মওকা পাচ্ছে না। একবার মসজিদ কমিটির কাছে নালিশ করবে ভেবেছিল। আজ দুটো কথা না বলে শচীন্দ্র ছাড়বে না। পাড়ার সকলের সামনে আকবর আলী মালতীকে বিড়ি দিয়েছে। আড্ডা মেরেছে। এটা শচীন্দ্র সহ্য করতে পারে না। সে চোখ লাল করে বললে, ও মিএগ, তোমার মান-ইজ্জত, লাজ-শরম নাই ? পথ দেখ।

আকবর আলী বের হয়ে এল। বাঁধের ওপর হাজার হাজার মানুষ জল দেখেছে। মরাখাল মুট মুট করে পাড় ভেঙ্গে যেন টিফিন করছে। সবাই মজা দেখছে। টইটুম্বুর মরাখালের সেতুর ওপর দিয়ে আকবর সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে। বাড়ি ঢুকেই আকবর দেখে নসরত হরি নাস্‌তা করছে, খিল খিল করে হাসছে, পাশে লাল ডুরে শাড়ি। আকবর আলীর মাথায় রক্ত টগবগ করে ওঠে। ঘরজামাই আকবরের শাসন করার অধিকার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। হরির বিরাট বুকের আড়ালে নসরত অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। আকবর ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বের হয়ে এল।

আকবর আগরতলার পুরোন বাসিন্দা। কৃষ্ণনগর নতুন পল্লীতে বাড়ি ছিল। আকবর যেখানে মায়ের সঙ্গে আম কুড়োত, ওখানে এখন তিনতলা বাড়ি। কালো টাকার উত্তাপে অনেকের সঙ্গে আকবরও নদীর পাড়ে ঘর বেঁধেছে। এমনি ভাবে সে, মালতী, নসরত সকল মানুষ সারা পৃথিবী ভাসছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মচারীরা বড় বড় টর্চের আলো ফেলে বাঁধ দেখে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ধীরে ধীরে বাঁধের ওপর চলছে। আকবর ঘোলাজল দেখছে। স্রোতের শন্‌শন্ শোঁ শোঁ শব্দ শুনছে।

আকবর হঠাৎ দেখলে একজন মেয়েলোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। আকবর অবাক হল—তারই বিবি নসরত! নসরত বলল, হরি বাড়ি যেতে পারেনি। রাস্তাঘাট জলে ডুবে গেছে। সিমনা, মোহনপুর, কামালঘাট, লেম্বুছড়ার বাস বন্ধ। নসরত আরও বলল, আমি বুড়াবেটি গিঁট দিয়ে কাপড় পরলেও কেউ দেখার নেই। হরির কচি বৌ। একটা কাপড় এনেছি, রাগ করো না।

আকবর দেখলো নসরতের দশহাতি কাপড়টা বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে প্যাঁচানো , তার ওপর গিঁট দিয়ে জড়ানো। আকবর থমকে দাঁড়ায়! ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ির আলো আকবর নসরতের চোখে পড়ে। ঐ আলোতে আকবর নসরতের ছেঁড়া শাড়ি দেখলো। মরা নদীতে বান আসার মত বুকটা ফুলে ওঠে। তার জমাট বাঁধা রক্ত কোমরে, পায়ে, হাতে তেজি ঘোড়ার মত দৌড়ায়। সে নসরতকে নিয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে।

স্বর্গচ্যুত ঈশ্বর

ভবানন্দকে নিয়ে সব চাইতে বেশি চিন্তা কল্যাণীর। একগুঁয়ে বাস্তবজ্ঞান বর্জিত এমন লোকের সংসার না করাই উচিত, এটাই কল্যাণীর স্বামী সম্পর্কে দিব্যজ্ঞান। আজও ভবানন্দ ফিরে এসে টিফিন সেরে বললে, কাল নয়টায় রান্নাবান্না সেরে ফেলো, দশটায় পরীক্ষার ডিউটি। কল্যাণী মোড় ফিরে বললে,—এবারও ইনভিজিলেশন ডিউটি নিলে? সেবারের কথা মনে নেই? আসলে তোমার হেডমাস্টার, এমন হাবা গোবা পাবে কোথায়? তাও আবার অন্য স্কুলে ডিউটি।

বিরাট দোতলা বিদ্যাপীঠ। ঢং ঢং ঢং করে ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেছে। ভবানন্দ কমনরুমে বসে চারমিনার টানছে। পিয়ন এসে ছত্রিশটি খাতা, হল সিট, কিছু সুতো ওর সামনে রাখল। দশ মিনিট পরে ভবানন্দকে আট নম্বর রুমে যেতে হবে। ওদেরই ইস্কুলের পন্ডিতমশায় ওর কাছ ঘেঁষে বসে বললেন,ডিউটিটা যাতে বেশি দিন পড়ে, দেখবেন। সাড়ে তিন টাকা রোজ। মাস শেষের দিকে গড়িয়ে গেছে। আকতার বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে পন্ডিতমশায় এগার নম্বর রুমের খাতা গুনে নিচ্ছেন। ভবানন্দ জানে ডিউটির হেরফের নিয়ে প্রত্যেক বছর বহিরাগত শিক্ষক শিক্ষিকাদের মাঝে বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই স্কুলের শিক্ষকগণ পর পর ষোল দিন ডিউটি দেয়। আর এদের কপালে জুটে মাত্তর পাঁচ থেকে সাত দিন ডিউটি। এবার একটা হেস্তনেস্ত হোক। এখানেও নোংরামি!

হাতে খাতা নিয়ে ভবানন্দ আট নম্বর রুমের দিকে এগুতেই চুপি চুপি দরজায় একটা ছেলে ভেতরের বন্ধুদের বললে,—ভবানন্দ আসছে। ভবানন্দ ঢুকলো। ছেলেরা কেউ বসে রইল, কেউ দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে ওরা সবাই এসে ভবানন্দের পায়ে পড়ে প্রণাম করার জন্যে তাড়াহুড়ো লাগাল। ভবানন্দ কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে ঈশ্বরের তুল্য ভেবে গর্ব অনুভব করল। এত সম্মান ওকে কে করে? কোন্ বজ্জাত বলে, শিক্ষকের ইজ্জত নেই?

একটা মোটাসোটা একুশ বাইশ বছরের ছেলে বলল,— স্যার বুঝেন তো, আমরা কয়েক বারের সব ফেলমারা। অন্য একটা ছেলে রুমটার কোণ থেকে বলল,—তোরা চুপ কর, স্যার ভাল মানুষ। কেউ কেউ কোমরে গেঞ্জির নিচে বই লুকোচ্ছে। ডেস্কের ভেতরে কেউ ভাঁজ করে বই রাখছে। কেউ বা কাগজে লেখা নকলগুলো পকেটে রাখছে। ভবানন্দ সবাইকে খাতা দিয়ে এসে প্রশ্নপত্রের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওরা সব এক্সটারনাল স্টুডেন্ট।

একজন মাস্টার মশায় এসে প্রশ্নপত্র দিয়ে বললেন, ঘন্টা পড়লে দেবেন। ভদ্রলোক দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন। একটা ছেলে বলল, —প্রশ্ন দিয়ে দেন স্যার। ভবানন্দ ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নপত্র দিয়ে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল। কচমচ শব্দ হচ্ছে! ছোট বড় টুকলির কাগজ, বইয়ের পৃষ্ঠা , মোটা মোটা বই বের হ'তে আরম্ভ করল। দু'চারটি ছেলে তখনও প্রশ্ন পড়ছে।

ভবানন্দের মনে হল চার দেয়ালের মাঝে ঘরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। ফ্যান ঘুরছে ভোঁ-ভোঁ। ভবানন্দ নিজের টেবিলের ওপর পা দুটো ঝুলিয়ে বটগাছের নিচে মাটির গাদার পিঠে শীতলার মূর্তির মত বসে রইল। ছত্রিশ জন পরীক্ষার্থীই বই খুলে ফেলেছে। এখন ওরা বাড়ি থেকে টুকে আনার পরিশ্রম করতেও রাজি নয়। বড় বড় বই, মোটা মোটা বই, ছোট অভিধান, পকেটে রাখার মত নোট বই! ওরা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নোট বইয়ের উত্তর মিলিয়ে নিচ্ছে। ভবানন্দ একটি ছেলেকেও

দেখেছে না, যার দিকে মুখ ফেরাতে পারে। দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবির মত তার চোখ দু'টো নিথর।

ভবানন্দ একবার ভাবল, কি করা যায়? কি করা উচিত? কি করতে পারে সে। উঠে দাঁড়াবে কি? বইগুলো ছিনিয়ে আনবে কি? তারপর কি হবে? ভবানন্দর মাথা ঝিম ঝিম করছে! ভবানন্দ উঠে দাঁড়াতে চাইলেও কোমর আর পা দুটো ভীষণভাবে অস্বীকার করছে। ভবানন্দ ভাবল, এখন তার খেপে যাওয়া উচিত হবে না। ভবানন্দ উঠল। দরজার সম্মুখ দিয়ে পায়চারি করতে লাগল। ছেলেরা কেয়ারই করলো না ওকে! দু'সারির মাঝে সরু পথটায় এগিয়ে গেল, ফিরে এল। দু একটা ছেলে মৃদু দুললো, বইয়ের পৃষ্ঠাকে সামান্য আড়াল করল, আর কোন পরিবর্তন তার চোখে পড়ে নি। ভবানন্দ একটা ছেলেকে সামনের বেঞ্চিতে বসেই নকল করতে দেখে বইয়ের পৃষ্ঠাটা আস্তে নিয়ে নিজের পকেটে রাখলে। পরিবেশটা এমন বিশ্রী রূপ নিল যে, ভবানন্দর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

ভবানন্দ আর বসে বসে এমন অঘটনের সাক্ষী হতে পারছেনা। টেবিল ছেড়ে বারান্দায় এল। নয় নম্বরের মাস্টারমশায় ভিতরের দিকের একটা ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছেন। অন্যরা দিব্যি বই দেখে লিখছে। সাত নম্বরের ইনভিজিলেটর ওপরের পাখার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভবানন্দ নিজের রুমের দরজা ঘেঁষে একটু দাঁড়াল। পাঁচজন যুবক শিক্ষককে আসতে দেখে ভবানন্দ কিছুটা সাহস পেল। কথা ছিল, ওরা পাঁচজন ফ্লাইংগার্ড— রুমে রুমে গিয়ে ছেলেদের কাছ থেকে বই নকলের টুকরো কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে আসবেন। মাস্টার মশায়দের দেখে ভবানন্দ ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালেন। শিক্ষকগণ দল বেঁধে আট নম্বর রুমে ঢুকলেন। ছেলেদের অঙ্গভঙ্গীতে সামাল সামাল ভাব। কচমচ শব্দ। মাস্টার মশায়গণ ছেলেদের ডেস্ক থেকে রাশি রাশি বই টেবিলে জড় করতে থাকেন। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে নকল বের করে আনা হল। কোন ছেলে ভীষণ বিরক্ত বোধ করছে। সব বই টেবিলে জড় হলে মনে হল একটি অগোছালো ছোট একটা পুরোন বইয়ের দোকান। একজন মাস্টার মশায় বললেন, বইগুলো লাইব্রেরীতে জমা রাখা হবে, পরীক্ষার পর তোমরা নিয়ে এসো। অমনি চার পাঁচজন তাগড়া ছেলে দাঁড়িয়ে বললে,—না স্যার, বই এখানেই থাকবে, হারালে কে দায়ী হবে? মাস্টার মশায়গণ ভয় না পেলেও কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। তখনই ঠিক হ'ল বইগুলো দরজার কাছে ভেতরের দিকে রাখা হবে। ভবানন্দ একটু সরে এসে একজনের কানে কানে ফিসফিস করে বললে, ধরেছেন ত মশায়, বইগুলো নিয়ে যান? এতটা ঝুঁকি নিতে কেউ সাহস করলেন না। ভবানন্দ ছাড়া সবাই চলে গেলেন। জল ছাড়া মাছের মত ছেলেরা অসুবিধা বোধ করতে লাগল। কেউ কেউ শরীরের অন্যাংশে লুকানো নকলগুলো বের করে ফেলছে। পিঠ থেকে, কোমর থেকে, বই বের হল। দু'তিনটি ছেলে ভবানন্দকে ঘিরে ধরে বললে, স্যার এটা কি ঠিক হয়েছে? ভবানন্দ বললে, তোমরা বই দেখে নকল করবে, আর স্যাররা বাধা দেবেন না ত কি করবেন? ঠিকই হয়েছে। এ দিকে অন্য ছেলেরা এসে যার যার বই নিয়ে যাচ্ছে। কার কোন্ বই এ নিয়ে হৈ চৈ শুরু হল। কারো কারো মেজাজ এতই তুঙ্গে যে হাতাহাতি হয় হয়। কার আগে কে বেশি নকল করবে, তা নিয়ে তাড়াহুড়া পড়ে যায়। একটা বলিষ্ঠ ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, চুপ কর। বাড়াবাড়ি করলে কিছুই লিখতে পারবিনে। একজন ছেলে ভবানন্দকে বলল, দেখছেন স্যার, মারামারি করছে, কি বিশ্রী গালি দিচ্ছে। ভবানন্দ বলল, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। রুশ জার্মান যুদ্ধ। ভবানন্দ মৃদু হাসল। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, স্যার একটু বলে দিন না। ভবানন্দ খেপে গিয়ে বলল, বল কি

তুমি, উত্তর বলে দেবো? ছেলেটা থতমত খেয়ে পেছনে সরে গেল। এখন আবার চুপচাপ। কেউ কেউ বেদম লিখছে। কেউ কেউ সিট ছেড়ে উঠে এসে নকলের পৃষ্ঠা বদল করে নিচ্ছে অন্য ছেলের কাছ থেকে!

ভবানন্দ বার বার ঘড়ি দেখছে, আরও এক ঘন্টা দু'মিনিট নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে! সে সেকেন্ড, মিনিট গুনে চলেছে। ভবানন্দ দরজা সোজা দেখল, স্কুল-মাঠের ও পাশের হল ঘরটায় মেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে। ওখানে দু'শ ছাত্রী। কমজোরি বলেই একটা হল ঘরে দু'শ ছাত্রীকে গাদা-গাদি করে রাখা হয়েছে। এখন ত যেতে পারলনা, ছুটির পর একবার সে ওখানে যাবে। এই স্কুলে ডিউটি পড়েছে শুনে পাড়ার সাব-পোস্ট মাস্টার ভবানন্দকে বাড়ি এসে অনুরোধ করে গেছেন, যাতে ভবানন্দ মেয়েটাকে একটু সাহায্য করে। রোল নাম্বার দিয়েছেন, মেয়ের আকৃতি প্রকৃতি, গায়ের রং শাড়ি সব বলে গেছেন, যাতে ভবানন্দের চিনতে অসুবিধে না হয়। মেয়েটা ইংরেজিতে দুর্বল। মাস্টার মশায় আরও বলে গেছেন, মেয়েটি বড় বেশি হাবাগোবা। ওর সঙ্গের পাড়ার মেয়েরা নকল করে পাশ করে ভাল বর পেয়ে ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে আছে। সাপলিমেন্টারী আর কমপার্টমেন্টাল পাচ্ছে। একবার একটায় অন্যবার অন্যটায় ফেল মারছে। দুবছর আগে ওকে সব নকল সামনে ছুঁড়ে দিয়ে এলেও সে নিতে পারল না। অন্য একটি মেয়ে লুফে নিয়ে ইংরেজিতে পাশ করে এখন এক এস.ডি.ও-র বৌ হয়ে গেছে। ওর কেবল ভয় দিদিমনিরা কি বলবে। পোস্টমাস্টার মশায় যাবার আগে বিনীত হয়ে বললেন, দেখুন মাস্টারবাবু, ভদ্রঘরের মেয়ে পাশ না করলে উপায় আছে?

মেয়েদের দিকে চোখ পড়তেই ভবানন্দর চোখে পোস্টমাস্টারবাবুর করুণ চোখ দু'টো বার বার চোখে ভেসে উঠছে। ভবানন্দের সঙ্গে পোস্টমাস্টারের অনেক দিনের খাতির। ভদ্রলোক ভাল গীতা ও ভাগবতের ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবসর সময়ে দু'জনে পোস্টমাস্টারবাবুর ঘরে বসে বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন।

পোস্টমাস্টারের মেয়ের কথা ভেবে, ভবানন্দ বেঁচে আছে বলে মনে করে। মেয়েটির প্রতি দুঃখ হয়। সে এখনও নিজকে আস্তাকুঁড়ে ফেলতে রাজি হয়নি বলে, ঘরে বাইরে নন্দিতা না হয়ে নিন্দিত হচ্ছে। পোস্টমাস্টারবাবুর হাজার অনুরোধেও মেয়েটির সততা চুরি করার সাহস পেল না ভবানন্দ।

ভবানন্দর মনের ব্যথা বেড়ে ওঠে। সে ভাবে আট নম্বর রুমটা যেমন জ্বলছে, বাইরটাও কি পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে? ভবানন্দ বাইরে তাকায়। সব ঠিক আছে। আকাশটা গাঢ় নীল। সাদা সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে ত যাচ্ছেই। সোনালি রোদ ঘাসের উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে।

পুলিশটা রাইফেলটাকে ভিন্ন কায়দায় পেছনের দিকে রেখে পায়চারি কবছেন। মাঠে গরু চরছে। টেপ থেকে ড্রেনে জল গড়িয়ে পড়ছে।

ভবানন্দের মনে পড়ে সাত বছর আগে এমনি পরীক্ষার হলে হাতেনাতে নকল ধরে ফেলেছিল সে। পরে কর্তৃপক্ষ ছেলেটাকে বহিষ্কার করে। সে দিনই বিকালে ভবানন্দ সুধীর মিশ্র, অনিল সরকার বেড়াতে বের হয়েছে। কলেজ টিলার ওদিকে বহিষ্কৃত ছেলেটি দলবল নিয়ে ওদেরে আক্রমণ করে। হঠাৎ ভবানন্দের চোখের সম্মুখে কয়েকটা বড় বড় ছোরা চিক চিক করে ওঠে। ভীষণ ভয় পেয়ে যায় ভবানন্দ। সেদিনের কথা ভেবে চোখ মুদে আসে। পরে ভবানন্দ শুনেছিলে, ঐ ছেলেগুলো

ছিল মুখ্যমন্ত্রীর পোষা। ভবানন্দ জানত না যে ওরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে রামকান্ত স্কুল থেকে বিদ্যাপীঠে পরীক্ষা দিতে আসে। সেই কুৎসিত দিনটির কথা আর ভবানন্দ ভাবতে পারে না। থানা পুলিশ পর্যন্ত ঘটনা গড়ায়। পরের দিন পুলিশ সুপার ওদের পরীক্ষার সময় ধরতে আসে, কিন্তু হেডমাস্টার কাকেও চটাতে চান নি। তারপর থেকে ভবানন্দ নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কল্যাণীর বাধ্য স্বামী হয়েছে। কল্যাণী আজও নকল ধরতে বারণ করেছে। ঘর থেকে বের হবার সময় কল্যাণী ঠাকুরের পায়ের তুলসি পকেটে গুঁজে দিয়েছে।

একটা ছেলের দিকে লক্ষ্য পড়ে ভবানন্দের, ছেলেটি দ্রুত বইয়ের পৃষ্ঠা উলটাচ্ছে, উত্তরটা বের করতে পারছে না। ঘামছে হতাশ হয়ে। হাঁটুটাকে জোর করে চেপে ধরছে। পাশের ছেলেটা বলছে, তাড়াতাড়ি কর, সময় নেই। ভবানন্দ ফিক করে হেসে দিল। এই ছেলেটার মুখের সঙ্গে ভবানন্দর ছেলে বিপ্লবের অদ্ভুত মিল। ভবানন্দ ভাবলে দুবছর পর এই ছেলেটির মতই বিপ্লব পরীক্ষা দেবে। নকল করবে, বড় হবে, চাকরি করবে। চুরি করা পয়সা এনে বৃদ্ধ ভবানন্দকে খাওয়াবে। ভবানন্দ পুত্রের অন্যায়ের প্রতি অন্ধ হয়ে মালা জপ করবে। ভবানন্দ বিপ্লবের আগামী দিনগুলো ও নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে হাঁপিয়ে ওঠে।

ভবানন্দ নিজেকে ফাঁকি দেবার জন্যই যেন এখন রুমটাতে হাঁটছে। ছত্রিশটি ছেলে, ছত্রিশটি যুবক, ছত্রিশটি চোর, শয়তান বিপথগামী অমৃতের সন্তান! এই রুমে বসে শিক্ষাকে লুট করছে! ভবানন্দ ওদের দিকে তাকাতে পারছে না! ওরা ভবানন্দকে অসহ্য মনে করেনা, তবে চোখে চোখে পড়ুক এটাও ওরা চায় না। এখানে স্নেহ নেই, নেই শ্রদ্ধা। সততার প্রতি ভালবাসা নেই, আছে ঘৃণা।

ভবানন্দকে ওদের মাস্টারি চাকরির রোজগারি শ্রমিক ছাড়া আর কিছু মনে হল না। ভবানন্দ এক স্বর্গচ্যুত ঈশ্বর। নরকের প্রহরী।

এদের সবার বয়স কুড়ি থেকে বাইশের ভেতর। কারো দু'এক বছর কম বেশি হ'তে পারে। বাইশ থেকে চব্বিশে পৌঁছুবে কিনা এদের কাছে অনিশ্চিত। যুদ্ধকালীন সময়ের মত এরা সারা শহরে কামানের গুলির মত ছোটে। তাদের বলিষ্ঠ দেহে ঘাড় গলিয়ে কাঁধ দুলানো চুল, লম্বা জুল্‌পি, সাহসী গোঁফ। সবটুকু মিলে এরা যুবশক্তি। কারো কারো কপালে মায়ের আশীর্বাদী সিঁদুর আর চন্দনের ফোঁটা। জাতীয় শক্তির এমন অপচয় কোথায় হয়? ভারতবর্ষেও আগে হয়নি। জীবন ও জাতিকে ভালবাসতে পারেনি। তাই অন্যায়ে ঘৃণা নেই, সততায় ভক্তি নেই। কাজ হ'ল আড্ডাবাজি, কথা হ'ল খিস্তি খেউড়; আদর্শ সিনেমার নোংরামি। ভবানন্দর মনে পড়ে, অনেক দিন আগে, ওর বাবা কি একটা ইচ্ছা পূরণে অসমর্থ হলে ওদের লাল গরুটাকে সুপারি গাছে বেঁধে বেদম পিটিয়েছিলেন। গরুটার মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। আজ ভবানন্দ সেই গরুটার কথা ভেবে দুঃখ করলে, নিজেকে লাল গরুটার মত মনে হল। এই ছত্রিশটি ছেলেই পাশ করবে, কিন্তু ভবানন্দমাস্টার কি ফেল করেছে?

ভবানন্দ ভাবল, গত পাঁচ বছর ধরে এদের মত ছেলে-মেয়েকে পরীক্ষা দিতে দেখছে, নকল করতে দেখছে, তারপর এরা জনসমুদ্রে মিশে যায়। দুধে যতটা বিষ ততটা প্রতিক্রিয়া নেই। মনে হয় দেশের মাটিটা অনেক বিষ শুষে নিতে পারে। এমনি পাশ করা ছেলেদের ভবানন্দ অফিসে কেরানি রূপে, থানায় পুলিশ অফিসার হিসেবে, কলেজে অধ্যাপক, বাজারে ব্যবসায়ী, হাসপাতালে ডাক্তার, কোর্টে উকিল রূপে দেখে আসছে। স্ব স্ব স্থানে এরা সুন্দর অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেয়।

কয়দিন আগে ভবানন্দের মতই একজন সহ-শিক্ষক হয়ে এসেছেন। কৈ এদের কাজে ত কোন ত্রুটি নেই? এমনিভাবে নকল করা এক ছাত্রকে ভবানন্দ বিধানসভা ভবনে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী রূপে সুন্দর বক্তৃতা দিতেও দেখেছে। তিনি সম্মানিত বিধান সভা সদস্য। ছাত্রের জ্ঞানগরিমা দেখে ভবানন্দ কৃতার্থ হয়ে যায়। ভবানন্দের এক সহ-শিক্ষক যিনি প্রশ্ন ফাঁস করে নম্বর বাড়িয়ে প্রাইভেট ছেলেকে পাশ করান, তাকেই ভবানন্দ দেখেছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শ দিতে। তিনি শিক্ষক সমিতির আঞ্চলিক সভাপতিও।

ভবানন্দ আরও একটু এগিয়ে ভাবলে, তাহলে কিসের পরীক্ষা, কার পরীক্ষা, কেন নকল ধরা, কেনই বা মানব শিশুকে নিয়ে পরীক্ষার প্রহসন? ভবানন্দর যন্ত্রণা আসলে নিজে নিজে তৈরি করা একটা আতসবাজি। এটা একটা যন্ত্রণাই নয়। ভবানন্দ বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করে। ক্রমাগত আঠার বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ভবানন্দকেএক জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন করল, শিক্ষা আর পরীক্ষা কি এক কথা? মানুষের আবার পরীক্ষা কিসের? আসলে সব মেকি, সব ঝুটা হ্যায়! আঠার বছর আগের প্রথম শিক্ষকতার দিন থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য কচি মুখ যেন একত্রে এসে ওকে দলে দলে বলছে, —কি শিখিয়েছেন, স্যার? শত শত ছেলে বলছে,—কি শিখিয়েছেন, স্যার? ভবানন্দ ভয় পায়, হঠাৎ তাঁর আত্মা কেঁপে ওঠে অসহায় বোধ করে। লুণ্ঠিত মানুষগুলো যেন ওকে মাথায় তুলে আছাড় মারছে। ওরা চিৎকার দিয়ে বলছে, আমরা বিবেক ও মনুষ্যত্বের আততায়ী ভবানন্দ চক্রবর্তীকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। ভবানন্দ ভাবতেও শিউরে ওঠে! ভয়ে ভয়ে আট নম্বর রুমের পরীক্ষার্থীদের দিকে তাকায়, আশ্রয় খোঁজে। তারাও যেন বলছে,— ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওকে পাঠাও জাহান্নামে। আমরা ভয় করেই ওকে ঈশ্বর মনে করেছি। আমরা ভয়ে ভয়ে পঙ্গু হয়ে গেছি। ভবানন্দ এত দিন পর মনে করল, আসলে সে একটা ভ্রান্ত অহমিকার প্রতিমূর্তি ছাড়া কিছু নয়।

একটা ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার জল? ভবানন্দ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে চতুর্থ শ্রেণির একজন কর্মীকে জল নিয়ে আসতে বলে। লোকটা জল এনে দিল। ভবানন্দও এক গ্লাস জল খায়। পরীক্ষা শেষের পনের মিনিটের আগের ঘন্টা পড়ে। ছেলেরা সেকেন্ড আর মিনিটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টুকছে আর টুকছে!

ভবানন্দ যেন আর অপমান সহ্য করতে পারছে না! ভবানন্দ বলতে চাইছে, আমাকে দুর্বল পেয়ে তোমরা অপমান করছ? আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছ কেন? তোমাদের মা বাবা ভুল করলে, কি সামর্থ্যে অপবাগ হলে, ওদের মাথা কি কেটে ফেলবে? আর তোমার ভুল যখন তুমি বুঝবে, তখন কি ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী হয়ে উঠবে? আমার জন্যে কি তোমাদের করুণা নেই?

একটা ছেলে বলে, স্যার লুজ সিট। ভবানন্দ লুজ সিটটা এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখে, ছেলেটি রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর চরিত্রের প্রশ্নের উত্তরের স্থানে ভানুমতিব চরিত্র কথা লিখছে। হঠাৎ ভবানন্দের চিরন্তন শিক্ষকতায় আঘাত পড়ল। আর না বলে পারল না, তুমি ভুল উত্তর লিখছ! ছেলেটি ভীষণ বিনীত হয়ে বইটা ভবানন্দের হাতে তুলে দিয়ে উত্তরটা খুঁজে দিতে বলল।

ভবানন্দ যতটা রাগ করল ততটা প্রকাশ না করে, শুধু বলল,—খোঁজো, খুঁজলেই পাবে। ভবানন্দ ভয়ানক ব্যথিত হয়ে নিজের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল।

ভবানন্দ বিষণ্ণ হয়ে একটি ছেলেকে বললে, পরীক্ষা কেমন হচ্ছে? কাল সংবাদ পত্রিকায় দেখবে প্রথম দিনের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সমাধান হবার জন্য বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থেকে আগরতলার কর্তারা মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অন্য একটা ছেলে যার কাজ সেরে গেছে বলে মনে হয়, সে লুজ সিটে সুতো দিয়ে গিঁট দিতে দিতে বলল, ওটা সরকারি প্রচার , কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন। আমার আপনার কতটা খবর থাকে। কালোবাজারী মজুতদারির মত এটাও খবরের ব্যবসা। ধনতান্ত্রিক সমাজে সবটাই গোঁজামিল। বিশ্বায়ন, বাজার, অর্থনীতি।

ভবানন্দ হঠাৎ চমকে ওঠে! যে ছেলের এমন চমৎকার সুন্দর মেধা ও বুদ্ধি সেও, তিন ঘন্টাই নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে! ভবানন্দের দুঃখ হয় যে;এই ছেলেটির মত বয়সে জীবন পৃথিবী ও চারপাশটাকে সে এত স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি। ভবানন্দ আবার ছেলেটাকে বললে, এতটা বোঝ; তবে নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছ কেন? ছেলেটা উত্তর দেয়, বোর্ডের সিল মারা একটা কাগজের জন্যে।

উত্তরপত্র জমা দেবার পাঁচ মিনিট আগের ঘন্টা পড়ে। ভবানন্দ সব ছেলেকে কাগজ জমা দিতে বলে। কেউ কেউ তখনও নকল করেই চলেছে। কেউ কেউ উত্তরপত্র জমা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ভবানন্দের পায়ে পড়ে প্রণাম করছে। ভবনন্দ 'বেঁচে থাক, বেঁচে থাক' বলে আর্শীবাদ করছে। ভবানন্দ কাগজ নিয়ে কমনরুমে ফিরে এল। উত্তরপত্র সাজিয়ে একটা চারমিনার ধরায়। তারপর উত্তরপত্র জমা দিল। ডিউটি শেষ।

ভবানন্দ খুব বিষণ্ণ মনেই বাড়ি ফিরল। ভবানন্দ দেখল কল্যাণী আজ বেশ আগেই অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছে। জামা খোলার সময় ভবানন্দর পকেট থেকে নকলের পৃষ্ঠাটা মেঝের ওপর পড়ে। কল্যাণী নকলটা তুলেই বললে, তুমি আজও নকল ধরেছ? দেখছি, তুমি একটা কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বেই না! ছেলে, মেয়ে, আমার কথা, তুমি একটুও কি ভাববে না?

ভবানন্দ লুঙ্গি পরতে পরতে বললে, নকল আর ধরলাম কৈ, একটা ছেলে চোখের সামনেই টুকছিল, তাই কাগজটা পকেটে পুরে রেখেছি।

কল্যাণী উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, ছেলেটি রাগ করেনি ত?

—না।

হ্যান্ডিম্যান

শ্যামলী সেজেগুজে স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল। মালিক হরিহর পোদ্দার, শুকলাল ড্রাইভার, আর নিলু হ্যান্ডিম্যান + কনডাক্‌টার + ক্লিনার + পাহারাদার। বিড়ির পাতা আর সুপারীর ব্রেকের দৌলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পড়ে থাকা ট্রাক আজ শ্যামলী হল। পি ডবলিও ডি থেকে ট্রাকটা নিলামে কেনা হয়।

আমেরিকার নিউইয়র্কে জম্মে, আসামের জোরহাট কর্মক্ষেত্র। এখন বুড়োবয়সে জনসেবার কাজ নিয়ে শ্যামলী হেলে-দুলে চলে। যৌবনে গোলাবারুদ বক্ষে নিয়ে কখনও জাপানীর আবার

কখনও সুভাষ বোসের সঙ্গে যুদ্ধ করছে সে। কত কথা কত স্মৃতি শ্যামলীর বক্ষে।

হরিহর পোদ্দারের মেয়ের নাম শ্যামলী। তাই বাসের নামও শ্যামলী। মেয়ের বয়স ষোল, বাসের বয়সও ষোল। গত ষোল বছর ধরে মাঝে মাঝে সামান্য জ্বরজারিতে অসুস্থ থাকা ছাড়া পিচঢালা পথে পদাবলী গান গেয়ে চলেছে শ্যামলী।

এক্ষুণি শ্যামলী ড্রপগেটে এসে থামল। পুলিশ হাত দেখিয়েছে। ড্রাইভার পকেট থেকে পাঁচটা টাকা নিলুকে ডেকে দিলে। নিলু দৌড়ে গিয়ে টাকাটা ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ হেড্ কোয়ার্টারের মেইন গেটের বিপরীত পাশের পানের দোকানে দিয়ে এল। টং করে একটা শব্দ হল, শ্যামলী চলতে শুরু করে। এটা ওদের প্রাপ্য। ঠিক স্থানে জামা পড়লে বাসের চাকাতে কয়টা লোক বেঁধে নিলেও দোষ নেই। এতে দু'এক জনের দম বন্ধ হলেই বা কি? যাত্রীদের চোখের সম্মুখে ব্যাপারটা হল। খুব সাধারণ ঘটনা। কেউ কিছু ভাবলে না। শুধু একজন যুবক ছেলে বললে, কি ভাই, কুত্তার রুটি দিয়ে এলে বুঝি? দু'চার জন মৃদু হাসল।

আজ ওভাব লোড। যাত্রী উঠেছে আটাশের স্থানে আটান্ন। নিলু চেঁচিয়ে লোক তুলেছে বেশি। সেই কর্কশ চেঁচানোর শব্দ, আসেন, আসেন, এক্ষুণি ছাড়ছি, অনেক সীট খালি। বিশালগড়-বিশ্রামগঞ্জ-নলছর-মেলাঘর-সোনামুড়া। মালিক স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে পান চিবুতে চিবুতে দেখছিল —কী করে মানুষেব ঘামগুলো রূপোলী টাকায় জমাট বাঁধছে। মালিকের উপস্থিতিতে নিলু নিজেকে জাহির করল, সে পাকা হ্যান্‌ডিম্যান, বিশুদ্ধ, অনুগত, কর্তব্যপরায়ণ, বাধ্য আর ভীষণ চালাক।

শ্যামলী বিশালগড়ের বড় সেতুটি পেবিয়ে থামল। তিনজন পুলিশম্যান দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে ওভারলোড হলে ওদের বড় আনন্দ। মনের আনাচে-কানাচে খুশির উল্লাস। গাড়িতে কম লোক হলে আর মানুষগুলো আরামে আয়াসে বসে থাকত দেখলে, মালিকের চাইতে ওদেব দুঃখ অনেক বেশি। শুকলাল পকেট থেকে একটা দুটাকাব মযলা নোট পুলিশবাবুর হাতে দিল। কনস্টেবল কাতরে বলল, না ভাই, আমরা তিনজন মিলিয়ে দাও। শুকলাল হেসে বলল, নেন্ দাদা। আমরা ত অপনাগো বেগুন ক্ষেত। ধরলেই পাবেন। আসার সময় রোদিজলার কুঁচো চিংড়ি খাওয়াবো। কনস্টেবল বলল, আসার সময় আসার কথা। এখনকার কথা এখন। শুকলাল থেকে আর এক টাকা পেয়ে বেচারা কনস্টেবল বিজ্ঞের মত হেসে ওঠে। বাসশুদ্ধ লোকগুলো দুঃখিত হল না। ভাগবতে নাকি লিখা আছে কলিযুগের শেষে গঙ্গা, তুলসি দেবীরা বিদায় নেবে। তারা বিদায় নিয়েছে কিনা জানা নেই। তবে শ্যামলী বাসের লোকদের লজ্জা বিবেক আত্মমর্যাদা বিদায় নিয়েছে। একজন শুধু বললে, কি ভাই, বিশালগড় থানার সঙ্গে কনট্রাক হয় নাই? ড্রাইভার বলল, ওসিটা ভীষণ বদ। এক পয়সাও ছোঁয় না। বেটা বদলি হলে দেখা যাবে। আগের ওসি লোকটা ভাল ছিল।

শ্যামলী স্টার্ট নিচ্ছে। একজন ভদ্রমহিলা দ্রুত এসে হাত দেখিয়ে বললে, একটু থামুন, আমি যাবো। এদিকে গাড়িতে ঠেলাঠেলি। যাত্রীরা বলে, ও ভাই, পাছাটা একটু সোজা করে নেও না। আরে, আমার পাটা চেপ্টা করে ফেলছ! শিশুটা মায়ের কোলে কাতরাতে কাতরাতে ঝিমিয়ে পড়েছে। ও মশায়, বাইরে হাত রেখেছেন কেন, ঘেচাং হবে যে! নিলু ভদ্রমহিলাকে বলল, জায়গা নেই। যাওয়া হবে না। ভদ্রমহিলা বিনীতভাবে আবার বলল, না ভাই, একটু জায়গা করে দিতেই হবে। বাড়িতে খুব ঠেকা, বাচ্চার অসুখ, না গেলেই নয়। ভাই নাও না! নাও না ভাই! নিলু চিন্তা করল, চড়িলাম গেলে চার পাঁচ জন লোক নেমে যাবে। তিন মাইল মাত্র পথ। সে দুজনকে অনুরোধ,

তিন জনকে চোখ টিপে চার জনকে ঠেলে মহিলাকে বাসের ভিতর গলিয়ে দিল। ভর্তি মুরগির খাঁচায় ব্যবসায়ীরা যেমন নতুন মুরগি কিনে ছুঁড়ে ফেললে — পা চাপা খাওয়া মুরগিগুলো কাঁ-কোঁ চিৎকার করে থেমে যায়, এখানেও সমন্বয়ের গুঞ্জরণ হল, থেমেও গেল। পরিপূর্ণ মহিলাটি বেশ চালু। একটা সুযোগ বুঝেই মুখোমুখি বসা দুজন যাত্রীর একটা হাঁটু টেনে চার হাঁটুর তৈরি সামন্তরিকের মধ্যে গলে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুটা দূরে একজন লোক হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে আছে, চোখ ফেলেছে না। মহিলাটি মনে মনে বললে, বেয়াদপ।

বাস চলছে। ডায়নামো সিলেনডারে শব্দ হচ্ছে। কারবোরেটার এক্সেলেটার কাজ করে যাচ্ছে। গিয়ারে আলতোভাবে পা রেখে শুকলাল স্টিয়ারিং ধরে গাড়ির গতি ঠিক রাখছে। একজন যাত্রী নিলুকে বললো, হ্যান্ডিম্যান, সোনামুড়া গাড়ি কখন পৌঁছাবে। নিলু হেসে বললো, বিশ্বকর্মার ইচ্ছা যখন, তিনি পৌঁছান। দুই তিনজন যাত্রী হেসে ওঠে।

চড়িলামে কিছু যাত্রী উঠেছে, নেমেছে সামান্য। গাড়ি চলছে। একখানা জীপ এসে মুখোমুখি থামল। জীপের ড্রাইভার কানে কানে কী যেন শুকলালকে বলে গেল। শুকলালের চোখে মুখে একটা বুঝছি বুঝছি ভাব। বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের কাছে এসে হঠাৎ ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে নিচে নেমে এল। গাড়ির পাদানির কাছে এসে বলল, আপনারা নামুন। সর্বনাশ 'মোবাইল কোর্ট!' এস. ডি. ও দলবল নিয়ে বাজারে বসে আছেন। আপনাদের জন্যই আমার বিপদ। পরের গাড়িতে যাবেন। ড্রাইভার আবার বলল, — আপনারা না হয় অন্য গাড়িতে যাবেন। আমার লাইসেন্স ক্যান্সেল করবে, জরিমানা ত আছেই।

যাত্রীরা মনে করে — জরিমানা ড্রাইভারের হোক দোষ কি? কিন্তু তাদের যে বসে থাকতে হবে? ড্রাইভার মনে করে যাত্রীদের কষ্ট হোক, তার লাইসেন্স ঠিক থাক। শুকলাল এবার বিজ্ঞের মত বললো, ভয় নেই, তবে একটু হাঁটতে হবে। আপনারা হেঁটে গিয়ে বাজার পার করে রাস্তার ধারে ঝোপের কাছে বসে থাকুন। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবো। আঠাশ জন যাত্রী ছাড়া বাকি সব হেঁটে চলল। শুকলাল পকেট থেকে চিরুণী বের করে বাবরি চুল পাট করে স্টিয়ারিং ধরে।

শ্যামলী বিশ্রামগঞ্জ বাজারে এসে দাঁড়াল। একজন কনষ্টেবল ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। সামান্য দূরে এস. ডি. ও একটা চেয়ারে বসে আছেন। আশেপাশে চার পাঁচজন বাজারের মাতব্বর ব্যক্তি বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কনস্টেবল গুনে দেখল ড্রাইভার সহ আঠাশ জনই আছে। শ্যামলীর গায়ে লিখা ক্যাপাসিটিঃ আঠাশ। শুকলাল হাসতে হাসতে এসে এস. ডি. ও সাহেবকে বললে, স্যার ওভারলোড ছেড়ে দিয়েছি। এস. ডি. ও হাতের ছড়িটা ঘুরিয়ে বললেন, বেশ ভাল। ওভার লোড নেবেন না। ইট ইজ ভেরী ব্যাড।

শুকলাল গাড়িতে উঠে আবার স্টার্ট দেয়। বাজার পার করে আগের সব যাত্রীদের তুলে নিল। এবার জোরে গাড়ি ছেড়ে বলল, তারাই কেবল পলিটিক্স জানে, আমরা আর জানিনা, না? সেকেন্ড ক্লাস থেকে মাঝারি বয়সী একজন যাত্রী বলল, নেহেরু মরে ভালই করেছে। এখন পথে ঘাটেও পলিটিক্স। একজন বৃদ্ধ বললে, তবে ইন্দিরা বাপ কা বেটী। বাপের নাম রাখছেন। ব্যাঙ্ক নেশানালাইজ করে সবুজ বিপ্লব আরম্ভ করেছেন। অন্য একজন লোক মনে হয় লোকটা বামপন্থী। সে বলল, থোন সবুজ বিপ্লব, কৃষকরা কি পাচ্ছে? চোখওয়ালার চোখ উপড়ে দেওয়াই আমাদের পলিটিক্স। শ্যামলী বৈরাগীর বাজার নলচর পেরিয়ে মেলাঘর পৌঁছে। রাস্তার ধারে একটা ছোট

বাংলো বাড়ির সম্মুখে এসে বিশালগড়ে ওঠা ভদ্রমহিলা নেমে পড়লেন।

আজ সারা রাত শ্যামলী সোনামুড়া মটরস্ট্যান্ডে থাকবে। সন্ধ্যায় শুকলাল বিড়ি টানতে টানতে সিন্ডিকেট আফিসে এল। আবার কবে ট্রিপ পড়বে, খবরটা জেনে যাবে। অন্যদিকে নিলুকে দিয়ে হাত-পাটা মলিয়ে নেবে। দুপুরের পর থেকে শরীরটা মেজমেজ করছে।

শুকলাল গাড়িতে ঢুকে মাঝের টুলটাতে শুয়ে বলল, নিলুরে বেটা শরীরটা একটু মলে দে। নিলু খুশি হ'ল। কেন না এরূপ অবসর সময় ড্রাইভাররা হ্যানডিম্যানকে কিছু কিছু কাজ শেখায়। নিলু পিঠের চামড়া টানতে টানতে বলল, আচ্ছা দাদা, গাড়ি ওপরে উঠতে বুঝি টপ গিয়ারে পা রাখতে হয়? ড্রাইভার বললে, হ্যাঁ। নিলুর ওপর ড্রাইভারের মেজাজ আজ তেমন ভাল নয়। কেন না পথে এতগুলো কাঁচা পয়সা পাওয়া গেল। কিন্তু হাতানো গেল না। বেটা সব যাত্রীর টিকেট কেটে ফেলেছে। বাঁদর হারামি! অন্য হ্যান্ডিম্যান হলে বেশ দু'জনে ভাগ করে নেওয়া যেত। নিলু আবার প্রশ্ন করে, দাদা রং সাইডে যদি মানুষ চাপা পড়ে, তাহলে কি বিচার হয়? আগে মুড়ানি খাবি, তারপর জেল ফাঁসি। নিলু বিশ্বকর্মার নাম স্মরণ করে গাড়িটাকে প্রণাম করে। এবার কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলল, জানেন দাদা, আমাদের শ্যামলী নাকি এখনও একটা কুত্তা বেড়ালকেও চাপা দেয় নাই! সেদিন মালিকের বৌ বলেছিলেন। শুকলাল উত্তেজিত হয়ে বলল, বেটা ফুটানি করিস্ না! একসিডেন্ট হতে কতক্ষণ? চৌদ্দ দেবতার নাম নে। ড্রাইভার হতে চাস্ নাকি? আমরা ওস্তাদের পায়ে তেল মেখে কাজ শিখেছি। ওস্তাদদের পীরের মত মনে করি। তোরা কাজ শিখবি কিরে? ড্রাইভারকে কেয়ারই করিস না! নিলু দেখল ড্রাইভার চটে গেছে। এখন কিছু না বলাই ভাল। কথায় কথায় রাত অনেক হয়ে গেছে। ড্রাইভার ঘুমাতে যাবে। শুকলাল উঠে বসল। নিলু ড্রাইভারকে হাসাতে চেষ্টা করে বলল, আগরতলায় দেখছি বেটিরাও গাড়ি চালায়। গাড়ি চালায় না বল পুতুল চালায়। ম্যাকানিকস্ এর কি বুঝবে? অ্যাম্ব্যাস্যাড্যার আবার গাড়ি নাকি? —বলে শুকলাল।

নিলু রাতের খাবার খেয়ে এসেছে। গাড়িতে শোবে। শুকলাল গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। আজ কতগুলো কাঁচা পয়সা হাত ছাড়া হওয়াতে গা জ্বালা করছে! ইচ্ছে ছিল নিলুকে কিছু বাস্তব জ্ঞান দেবে। কিন্তু বেটা হারামি বোকা। নিজের ভাল বোঝে না।

ট্রিপের পর ট্রিপ পড়ছে। চাকা ঘুরছে। নিলু আর শ্যামলী এক হয়ে আছে। কখনও হাঁকছে — আসেন, আসেন, অনেক সিট খালি, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ, নলচর, মেলাঘর, সোনামুড়া? আসেন, আসেন, ও দিদিমনি যাবেন নাকি? নিলু এগিয়ে আসা যাত্রীর বাচ্চার হাত ধরে তুলে দিল।

সেদিনের সেই দিদিমনিকে নিলু প্রায়ই দেখে। ভাল লাগে বলে বেশি বেশি আলাপ করে। ইতিমধ্যে মহিলাটি তার গাড়িতে কয়েক বার আসা যাওয়া করেছেন। তাই ওদের মধ্যে একটা জানাশোনা সম্ভাব তৈরি হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা শিক্ষিকা। বাসা থেকে চার মাইল দূরে একটা স্কুলে যান। পথে আসতে যেতে দিদিমনিকে দেখলে নিলু গাড়ি থামায়। স্কুলের কাছে নামিয়ে দেয়। পঞ্চাশ পয়সা ভাড়া। ভদ্রমহিলা নিজ ইচ্ছায় পয়সা দিলে নেয়; নতুবা চেয়ে নেয় না।

প্রথম দিনের ভাই ডাকটা নিলুকে আকৃষ্ট করে তুলেছে। কতদিন কত সন্ধ্যায় অবসর সময়ে সে দিদিকে ভেবেছে। কতদিন রাস্তার অন্য মহিলাকে দিদি মনে করে লজ্জায় চোখ ফিরিয়েছে। মাঝে মাঝে অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে। তার বাড়ির কথা। মার কথা। দিদির কথা। বাবা ছিল গ্রাম্য কবিরাজ। সে বাড়িটা গোমতী নদীর ওপারে। আসা যাওয়ায় বড় বেশি সরকারি বাধা।

তারপর বাবা গত হলে ওরা মামার বাড়ি আসে। কী হ'তে কী হ'ল সব গোলমাল হয়ে গেছে! হারিয়ে গেছে মা আর দিদি। এখন সে একা।

খুব ধুলা জমেছে শ্যামলীর গায়। ছেঁড়া গেঞ্জিটা দিয়ে নিলু শ্যামলীর গা মুছে দেয়। সে ভাবছে এবার মালিককে বলে শ্যামলীর গায়ে রং লাগাবে। যেমন মেয়েরা সাজে। নিলু শ্যামলীকে মেয়েমানুষ মনে করে। সম্মুখের বড় লাইট দু'টা শ্যামলীর চোখ। দু'পাশের সেড দুটা শ্যামলীর বাহু, ইঞ্জিনটা শ্যামলীর বক্ষস্থল। বড় পেট্রলের ড্রামটা পেট। সম্মুখের বড় লোহার রডটা দাঁত। হর্ণের ভাষায় কথা বলে। পেট্রোল খায়। মবিল দিয়ে টিফিন করে। পিপাসা পেলে জল চেয়ে নেয়। চাক্কাগুলো শ্যামলীর পা। বৃষ্টিতে পায়ে কাদা জড়ালে, বালতি বালতি জল এনে পরিষ্কার করে দেয় নিলু। শ্যামলীকে মুছে নিলু একটা আক্তার বিড়ি ধরায়। লুকিয়ে বিড়ির টান দেবার জন্য 'সুচিত্রার' হ্যান্‌ডিম্যান অমল এসে পড়ে। বিড়িতে সুখ টান দিয়ে অমল বলল, তোর কীরে? যে দিদি জুটালি তাতেই তোর কপাল খুলবে। ভাইফোঁটা নিতে যাবি না? নিলু রেগে বললে, দেখ, অনেক দিন ইয়ারকি সহ্য করেছি, ফের দিদির নামে কিছু বলবি ত এক চড়ে সব কয়টা দাঁত ফেলে দেবো। মটরস্ট্যান্ডের বুড়ো পাগলাটা বললে, জল খাবার জন্য একটা বিড়ি রাখ না নিলু। অমল পাগলের মুখে ধুঁয়ো ছুঁড়ে পালায়।

গত কয়দিন ধরে ড্রাইভার নিলুর মিছামিছি খুঁত ধরে নানা অছিলায় খিস্তি খেউর পাড়তে থাকে। মা বাপ তুলে গালি দিতেও ছাড়ে না। মালিকের কানে বানানো চুকলি ঢেলে নিলুকে হালকা করে তুলেছে শুকলাল।

শ্যামলী থার্ড ট্রিপ নিয়ে আগরতলা রওনা হচ্ছে। যাত্রিরা কেউ পান চিবাচ্ছে, কেউ বিড়িতে টান দিচ্ছে। ড্রাইভার পাশের রেঁস্তোরায় চা খাচ্ছে। হরিহর পোদ্দার ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। নিলু ভাবল, এবার সে শ্যামলীকে নতুন রং-এ সাজাবার কথা বলবে। কাছে এসেই হরিহর নিলুকে বলল, হ্যান্ডব্যাগ দে, টিকেটের বই দে, গাড়ি থেকে নাম। নিলু বলল, কী হয়েছে বাবু?

—তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ? ফাজিল শয়তান। ড্রাইভার হতে চাস্? কাল গাড়ি চালিয়ে গর্তে ফেললি কেন? এখন বুঝলাম, গাড়ি খারাপ হয় কেন। হ্যান্ডিম্যানগিরি করতে হবে না! এই বলে অন্য একটা ছোকরাকে গাড়িতে তুলে দেয়।

নিলুর আঠার বছরের মেজাজে আগুন ধরতে চাইল। কিন্তু দুতিন জন ড্রাইভার তাকে জোর করে নিয়ে আসে একটা স্টলে। নিলুর চোখের সম্মুখে শ্যামলী স্টার্ট নিল। চাকা ঘুরল। সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শ্যামলীর দিকে! টপ টপ করে কয় ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। এই বয়সের ছেলেরা কাঁদতে লজ্জা পায়। মুহূর্তে চোখ মুছে পাশের স্টলের কিশোর ছেলেটাকে বলল, দে, এক কাপ গরম চা দে। একটা চোর আর একটা চুকলিবাজ। চা খেয়েই বিদ্যুতের মত বেরিয়ে সে পথে পথে ঘুরছে। রাত্রে না খেয়েই শুয়ে পড়ে। সারারাত বিড়বিড় করেছে, আগরতলা — বিশালগড়-বিশ্রামগঞ্জ? আসেন, আসেন অনেক সিট খালি? ও দাদা যাবেন নাকি? এক্ষুণি ছাড়ছি।

ভোর হল। দিদির বাড়ি যাবার ইচ্ছাটা মাথায় পৌঁছে ঘুরপাক খাচ্ছে। দিদির বর বড় অফিসার। একটা চাকুরি জুটিয়ে দিতে পারবেন। পিয়ন-টিয়ন যা হোক। এখন না হয় বাসার চাকরিই করবে। জামা প্যান্ট পরে নেয় নিলু। জুতাটা মুছে নেয়। আয়নাতে মুখ দেখে। এক রাতের বাঁচার চিন্তায় চোখটা গর্তে ঢুকে গেছে। একবার ভাবল, যাবে ত দিদির বাড়ি, একটা কিছু নিলে ভাল হয় না?

শাড়ি ব্লাউজ পিস, হ্যান্‌ডিম্যানি চিন্তা। আবার কী মনে করে শেষ পর্যন্ত খোকার জন্য এক বাক্‌স বিস্কুট নেওয়া স্থির করল।

নিলু বারান্দায় ঢুকেই দিদিকে দেখে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। দিদি বললেন, কী মনে করে নিলু। বস।

— এমনি।

— হাতে ওট কী।

— খোকার জন্য বিস্কুট এনেছি।

— আচছা বেশ, এক কাপ চা না খেয়ে যেও না।

নিলুর দিদি পাশের টেবিলে কুশিকাঁটা রেখে রান্না ঘরে গেলেন। নিলু সোফায় বসে দেওয়ালে টাঙ্গানো গান্ধী, জহরলাল, লেনিন, রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে ভাবল, আঃ এখানে কত সুখ কত শান্তি!

গায়ে ত্রিপুরার তৈরি মোটা হাউস্‌কোট পরা, হাতে আই পি সির আইনের বইটা হাতে ভদ্রলোক পাশের রুম থেকে এগিয়ে এলেন। নিলু টপ করে উঠে প্রণাম করতে গেলো। পা সরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, তুই কে রে?

আমি নিলু, শ্যামলী বাসের হ্যান্‌ডিম্যান।

— কী চাস্‌?

— কিছু না।

— তবে?

— দিদির কাছে এসেছি।

শয়তান, দিদি জুটিয়েছিস্‌? বের'হ, বেব'হ! নতুবা পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেব! উপহার এনেছে, নিয়ে যা ওটা?

হতভম্ব নিলু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হ'য়ে পড়ে। একটু এসেই থমকে দাঁড়ায়। শ্যামলী বাসটা আসছে। সে গেটের পাশে লিচু গাছের তলায় গা ঢাকা দেয়। তখন সে শুনছে, দিদির সঙ্গে ভদ্রলোকের বেশ কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

— ছিঃ ছিঃ, তুমি এ কী করলে! ছেলেটাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে!

— বেশ করেছি। যত সব লোফার শয়তান, বাড়িতে এসে আড্ডা দেবে!

— কে বলেছে ছেলেটা লোফার? তুমি ওর কতটুকু জান? জান সে আমাদের কত উপকার করে? তুমি ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে? আমাকে একটু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও মনে করলে না? ছিঃ ছিঃ!

— তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিছু করতে হবে নাকি?

— সে কথা বলছি না, তুমি ভুল বুঝছ কেন?

— তবে শোন। এটা স্পষ্ট জেনে রাখ, ভাস্বতী, আমি এটা চাইনা যে চাকরবাকর, হ্যান্‌ডিম্যান, কুলি, মজুর, তোমাকে দিদি বলে ডাকে; আর বাড়ি আসে!

— কেন? সভাসমিতিতে দেখি লম্বা লম্বা কথা ছাড়। তখন খেয়াল থাকে না? তোমাদের মুখে জাতীয় সংহতির কথা। —জয় জোয়ান জয় কিষাণ মানায় না!

—ওগুলো সভার কথা, ঘরের কথা নয়।

— আচ্ছা, ভেতরের আমি আর বাইরের আমি যদি দুজন হয়ে পড়ি, সেটা কি তোমার ভাল লাগবে? যাক সে কথা। তোমার এতটুকু মায়া হল না, ছেলেটাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে? আমাকে যদি ক্রমাগত বেত মারতে—তাতেও আমার এতটুকু কষ্ট হতে না! —ভাস্বতী কাঁদতে কাঁদতে চোখ মোছে।

— ছিলে স্কুল মাস্টারের মেয়ে, হয়েছ অফিসারের বৌ, অ্যারিস্টক্রাসির তুমি কী বুঝবে? ইডিয়েট! স্টুপিড!

— হাত কাটা ব্লাউজ পরে, গোল টেবিলে বসে চিবিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যা কথা বলা কি অ্যারিস্টক্র্যাসি? মুখে বল হরিজন, ভেতরে ভাব হরিবল। ইট ইস বিয়ন্ড মাই কালচার! ওটা আমি কোনদিন পারব না। ছিঃ ছিঃ, তুমি এত হিংসুক। আমার মরা বাপের নাম তুলে আমাকে অপমান করছ? উঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি কত ভাল। থাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। স্কুল মাস্টারের মেয়ে সে আমার চরম গর্বের পরিচয়। আজ আমার কাঁদতে ইচেছ করছে।

— অ্যারিস্টক্রাসির অর্থ বোঝ, ভাস্বতী? আই মিন, আই এ্যাম ইওর হাজব্যানড।

— তোমারও এটিকেট শিখে নেওয়া উচিত। পত্নীর পরিচিত কাউকেও সম্মুখে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দেওয়া কোন্ দেশী এটিকেট? পুলিশ অফিসারের ছেলে। চোর আর কনস্টেবলের মাথায় চড়ে বড় হয়েছ, এটিকেট শিখবে কী করে? আই এ্যাম নট অনলি এ অনারেবল ওয়াইফ, ব্যাট এ উইমেন টু। প্লিজ রিমেমবার। এ্যাডুকেশন উইদ্আউট ক্যালচার ইজ্ জিরো।

— সাট-আপ ভাস্বতী!

— ধমক দিচ্ছ? ওটা যুক্তিহীন শয়তানের অলঙ্কার। এক্সকিউজ মি। না বলে পারলাম না।

— তোমার মত উগ্র মেজাজি মেয়েছেলেকে ধমক দিতেই হয়!

— সত্যের জন্যে ন্যায়ের জন্যে প্রতিবাদ করলেই উগ্র হয়। জেনে রাখ, আমি স্বাবলম্বী। তাই বলে যৌতুকের ফর্দটা কম দীর্ঘ করেননি তোমার অনারেবল বাবা?—কথাটা বলে কপালে হাত ঠেকায় ভাস্বতী।

— তোমার বাবা পুরো ফর্দটা পুরে দেন নি।

— আঃ কী সুন্দর, কী সুন্দর বলছ! ভাল ছাত্র, আই পি এস, সম্মানিত আমলা। আচকানের নিচে দীর্ঘ দিন কথাটা লুকিয়ে রাখতে পেরেছ? পণপ্রথার বিরোধী সৈনিক!

—গেল, গেল? মরল, মরল? ধর, ধর, ইঃ ছেলেটা চাপা পড়ল বুঝি? একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে, বাঘিনীর মত গোঙরাচ্ছে শ্যামলী।

ছুটে আসে ভাস্বতী, আর মিঃ চ্যাটার্জী। ছেলেটি তখন নিরাপদে গাড়ির এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ চ্যাটার্জী ছেলেকে কোলে তুলে বললেন, কে বাঁচালো বাপি? খোকা গাড়ির অন্য পাশে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখিয়ে দেয়। পিছনের চাকাটা নিলুর পায়ের আঙ্গুলের উপর দিয়ে পিষে গেছে। দৌড়ে যায় ভাস্বতী।

— এ কী, এ যে নিলু!

— দিদি!

সুখেন্দু দাস

সুচেতার জীবন-সাথি

জীবনে এই প্রথম মা'র অজান্তে এক দুঃসাহসিক কাজ করে ঘরে ফিরল শুভঙ্কর। কিন্তু মা'-র উগ্রমূর্তি দর্শনে তার ঠোঁট মুখ শুকিয়ে কাঠ। সে ভালো করেই জানতো তার মা স্রষ্টার এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি। মাতা-পুত্রের সম্পর্ক শেষপর্যন্ত কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে, তা নিয়ে শুভঙ্কর খুবই উদ্বিগ্ন, বিচলিত। এক অজানা আশংকায় এখন তার দিন কাটছে।

পিতার বড়ো ছেলে শুভঙ্কর। মা'র যত্ন ও চেষ্টাতেই সে বড়ো হয়ে উঠেছে, বি-এ পাশ করেছে। বর্তমানে এক অফিসে ভালো মাইনের চাকুরিও করে। শৈশব থেকেই সে তার মাকে যতটুকু না শ্রদ্ধা করে আসছে, তার চেয়ে ভয় করছে অনেক বেশি।

নারী বহুরূপা। নারী কল্যাণী, শুভঙ্করী। সে নারী-ই আবাব পরিবারে, কিংবা সমাজে উগ্রতায়, একগুঁয়েমিতে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্করী। নারীর এ দু'টি রূপ পিতার জীবিত কালেই শুভঙ্কর তার মা'র মধ্যে আবিষ্কার করেছে। তাই দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই আজ তার মনে মা সম্পর্কে এতো সংশয়, এতো সন্দেহ। পিতার জীবিতকালে দিনরাত তাকে অস্বস্তিতে থাকতে দেখেছে শুভঙ্কর। তার পিতা ছিলেন বন বিভাগের কর্মী। সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে স্ত্রীর বচসায় তিনি সর্বদাই থাকতেন নির্বাক। পরে ব্লাড্-প্রেসারে অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান।

প্রত্যুৎপন্না মা হিরন্ময়ী পুত্রের অসামাজিক বিয়ে মেনে নিতে অপ্রস্তুত থাকলেও সাময়িক নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'এমন সুলক্ষণা মেয়ে জানতে পারলে, তবে কি আর আমি আপত্তি করি? কী বলিস্ শংকরীর মা? আজকাল এসব ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।'

শংকরীর মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়, বলে, 'গাছ অনুপাতে গোটা। রক্তের গুণ যাবে কোথায়? হাবা-বোবা ছেলে কি আর দিগ্বিজয় করে সপ্নের অপ্সরী ঘরে নিয়ে আসতে পারে? ভারী সুন্দর মুখটা দেখতে।'

হিরন্ময়ীর ইঙ্গিতে শংকরীর মা চট্‌পট্ এক গোছা দুর্বা তুলে নিয়ে আসে বাইরের উঠোন থেকে। হিরন্ময়ী নিজে ঘর থেকে নিয়ে আসে গুটি কয়েক ধান। পাড়াপড়শীরা মিলে বর-কনেকে আশীর্বাদ করে ঘরে তুলে নেয় হুলুধ্বনি দিয়ে।

আধা-শহুরে পরিবেশে সুচেতার জন্ম। শিক্ষার শুরু ও সমাপ্তি সেখানেই। 'কল্যাণী নারী সমিতি'র সদস্যা ছিল সে। ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে সমিতির নেত্রী। মা-বাবার মৃত্যুর পর মাসিই তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করে। অফিসিয়াল কাজে 'কল্যাণী নারী সমিতি'তে গিয়ে শুভঙ্করের সাথে সুচেতার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুচেতা সম্পর্কে শুভঙ্কর আগেই তার মাকে তার পছন্দের কথা জানিয়েছিল। কোর্ট-ম্যারেজ হবার পর বাড়িতে গিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান করবে—এটাই ছিল শুভঙ্করের উদ্দেশ্য। অন্য এক ধনাঢ্য পাত্রের খপ্পর থেকে বাঁচাতে সুচেতার প্রস্তাবে তাড়াহুড়ো করে কোর্ট-ম্যারেজে রাজি হয় শুভঙ্কর। পরে বউ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। মা হিরন্ময়ী তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ। এমন কি কোন সামাজিক অনুষ্ঠান বাড়িতে হোক— তাও তিনি চান না।

একদিন, দু'দিন করে—দিন, মাস, বছর গড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বাড়ি এলে

যথাসময়ে কর্মস্থলে যেতে চায়না শুভঙ্কর। বড় ছেলের মিলন-মধুর দাম্পত্য-জীবনের দৃশ্য মা হিরন্ময়ীর প্রাণে তার অতীতের অতৃপ্ত জীবনস্মৃতি জাগিয়ে তুলে তাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। কী ভুলই না করেছিল সে শুভঙ্করের নিরপরাধ বাবাকে অহেতুক অবজ্ঞা করে। শুভঙ্করের বাবা ছিল ধীর, স্থির, বাক্-সংযমী পুরুষ। হিরন্ময়ী দেবী স্বামীকে তামাশার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল ঘরে-বাইরে। পনের বছর হলো সে স্বামীহারা। দুই সন্তানকে বাঁচিয়ে তুলে লেখা-পড়া শেখাতে গিয়ে হিরন্ময়ী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে—কত ধানে কত চাল।

তাই ছেলের সাথে লড়াইটা চালাতে গিয়ে খুব হিসেব কষে পা ফেলতে হচ্ছে হিরন্ময়ীকে। তার হাতের তাস ছোট ছেলে রতন। তাকে ব্যবহার করে সে শুভঙ্করকে উচিত শিক্ষা দিতে চায়।

আত্মীয় স্বজনের বিষ-নজর থেকে অব্যাহতি পেতে স্বামীর মৃত্যুর পর একদিন রাতে ত্রিপুরা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিতে চেয়েছিল হিরন্ময়ী, দুই সন্তানকে নিয়ে। শুভঙ্করের দূর সম্পর্কীয় এক কাকা তাকে বাধা দিয়ে দুই সন্তানের দেখ্‌ভালের দায়িত্ব নেয়। স্বামীর পেনশনের টাকায় সংসারটা কায়-ক্লেশে চলে যেতো। অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় শুভঙ্করকে কলেজে পড়ানোর সময়। হিরন্ময়ী সে সময় অতিকষ্টে কিছু অর্থোপার্জন করে ঘাট্‌তি মিটিয়ে নিতো। সে সযত্নেই এতোদিন দুই ছেলেকে আগ্‌লে রেখেছে।

পদস্থ অফিসার হয়ে শুভঙ্কর এখন অফিস কোয়ার্টারেই থাকে। সুচেতা থাকে বাড়িতে শাশুড়ির তত্ত্বাবধানে। রতন কলেজে পড়ছে বিজ্ঞান নিয়ে।

নিজের হাতে গড়া সংসার থেকে শুভঙ্কর ছিট্‌কে যাক্— এটা হিরন্ময়ী কোনদিন মেনে নিতে পারছে না। বরং কৌশলে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করার নোংরা খেলায় মেতে ওঠে সে।

একদিন শুভঙ্কর বাড়ি এসে দেখে তার মার সঙ্গে সুচেতা নিবিড় আলাপে মগ্ন। সহজ, সরল পতি-পরায়না সুচেতাকে তার মা'র সঙ্গে আলাপ করতে দেখে শুভঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে তার মাকে চিনেছে জন্মের পর থেকেই, বিভিন্ন সাংসারিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। মানিয়েও নিয়েছে নিজেকে, কিন্তু মা'র প্রতি সন্দেহের ছায়া মুছে যায়নি এখনো। কল্যাণী রূপে সে তার মাকে কখনোই দেখেনি। তার মা'র অনন্ত চাহিদা, কুটিল মন, বহুরূপী ব্যবহার। চিরটাকাল তার বাবা তাকে অজস্র সম্পদ জোগান দিয়েও সুখী করতে পারেন নি। তার মা'র কাছ থেকে তার বাবা প্রীতি, প্রণয়, প্রেম, ভালবাসা বিন্দুবিসর্গ পেয়েছেন কিনা বিধাতাই জানেন। পেয়ে থাক্‌লে বাবা কেন সর্বদাই বন্ধু মহলে আড্ডা দিয়ে দিন কাটাতো! মা'র কাছ থেকে পলায়ন-প্রবৃত্তি ছিল বাবার নিত্য দিনের অভ্যাস। এসব নানা প্রশ্ন এখন শুভঙ্করকে ভাবিয়ে তুলছে।

নব-পরিণীতা সুচেতাকে একান্ত পারিবারিক ব্যাপার বুঝিয়ে বলাব সময় হয়েছে কি? নিজেকে প্রশ্ন করে এসবের সদুত্তর খুঁজে পায়না শুভঙ্কর। যদি স্ত্রী ভুল বুঝে বসে! অনেক ভেবে চিন্তে শুভঙ্কর এ যাত্রা চুপ মেরে রইল। ছেলেকে দেখে হিরন্ময়ী সবজান্তা শাশুড়ির মতো বলে উঠ্‌লো— 'মা, সুচেতা, তুমি তোমার ঘরে যাও।' এই বলে গম্ভীর হয়ে হিরন্ময়ী স্থান ত্যাগ করে।

শুভঙ্কর ধীর-পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে বৈদ্যুতিক পাখা ছেড়ে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেয়।

সুচেতা ভাবে— তারই মতো তার শাশুড়িও একদিন নববধূ সেজে এই ঘরে এসেছিলেন,কত আশাআকাঙক্ষা নিয়ে। কিন্তু শ্বশুর তাকে মর্যাদা দিতে পারেন নি। বরং তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে

কাঠ-কয়লা বানিয়ে ছেড়েছেন। 'বাপ্ কা বেটা'— ছেলেও এর চেয়ে কতটুকুই বা ভালো হতে পারে! ক্রমেই সুচেতা শাশুড়ির অনুগতা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সত্য যে কত গভীরে সুচেতার সহজ-সরল প্রাণ তখনও এর হদিশ পেয়ে উঠেনি।

সুচেতা! তুমি জাননা, প্রতিটা ঘর-সংসার, প্রতিটা মানুষ কত বিচিত্র। কত বিচিত্র তাদের অভিব্যক্তি, আরও বিচিত্র তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কূট-কৌশল, ফন্দি-ফিকির, সুযোগ পেলেই বাগে এনে তিলে তিলে পিষে মারার মায়াজাল। পশু-পাখি আর প্রাণীরা নিজ নিজ শিশু শাবকের টানে নিজে না খেয়ে এদের আহার জোগায়, বাঁচিয়ে রাখে, বেঁচে থাকতে সক্ষম করে তোলে। বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ অন্য মানুষকে মেরে ফেলার অপকৌশল প্রয়োগে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনা। এই তো আধুনিক সভ্যতার ঘৃণ্য চেহারা!

সুচেতার আজ প্রধান জিজ্ঞাসা— কেন শিক্ষিত লোকেরা প্রলোভন দেখিয়ে নিষ্পাপ মেয়েদের বিবাহের নাম করে বিলাসের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে; রাত প্রভাতে দলিত-পত্রের মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়?

এই অনুভূতি জেগে ওঠার ইঙ্গিতই হিরন্ময়ী দিতে চেয়েছিল বালিকা-বধূ সুচেতাকে। তার স্বপ্ন অনেকটাই সফল। ভয় শুধু তার ছেলেকে নিয়ে। যদি শুভঙ্কর মা'র অতীত ইতিহাস সুচেতার কাছে ফাঁস করে দেয়!

গভীর নিশীথে শুভঙ্কর সুচেতাকে সাবধান করে বলে, 'সুচেতা, তুমি জাননা আমার মাতৃ-রূপিনী মহিলাটি কোন্ ধাতুতে গড়া। ও পারেনা, জগতে এমন কোন কাজ নেই। ও তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।' স্বামী অনুরাগে রক্তিম হয়ে ওঠে সুচেতার দেহ-মন-প্রাণ। স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে সুচেতা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'তুমি আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবেনা, কথা দাও। যে নদী গিরি কন্দর ভেদ করে সমতলে নেমে আসে, সে কি আর কখনো ফিরে যেতে পারে ঐ গিরি গহ্বরে? আমি চিরকাল তোমার ছায়া হয়ে পাশে পাশে থাকতে চাই, শুভঙ্কর।'

শুভঙ্কর আবেগে সুচেতাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বুঝেছি, কোথায় তোমার আশংকা। সমুদ্র মন্থনে বিষামৃত একই সঙ্গে ভেসে উঠেছিল। অমৃত পান করে দেবতারা অমর হয়। অসুরেরা লুটেপুটে নেয় বিষ। অসুরের তৃতীয় নেত্র নেই, দেবতাদের আছে। মানুষ সাধনা করে তৃতীয় নেত্র জাগিয়ে তুলতে পারে। আমি ঐ নেত্রে প্রত্যক্ষ করেই অমৃতময়ী তোমাকে ঘরে তুলে এনেছি।'

সুচেতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, আর বলে, 'মা'-র স্নেহ, পিতার সোহাগ— বুঝে উঠবার আগেই বিধাতা তাদের নিয়ে গেলেন। আমি এক অসহায়া, অনাথা মেয়ে, শুভঙ্কর। মাসির দরিদ্র কুটিরে মানুষ হয়েছি। এর পরেই পেলাম জীবনের পরম আশ্রয়, তোমাকে।'

এসব বলার পর সুচেতা গুন্‌গুনিয়ে গান গাইতে থাকে—

'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা,

আমি যে পথ চিনি না।'

রাতে মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে সারাটা রাত কাটিয়েছে হিরন্ময়ী। তার ভয় পাছে সুচেতার কাছে শুভঙ্কর তার মা'র অতীত কাহিনি খুলে বলে। সে ভাবে সুচেতাকে মিথ্যার জালে কত দিন আট্‌কে রাখা যাবে? সুচেতাকে পুরোপুরি হাতের মুঠোয় না আনা পর্যন্ত তার নিজের পরিকল্পনা

হাসিলের কোন উপায় নেই।

পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে ক্লান্ত সুচেতা রাতের শেষ প্রহরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শুভঙ্কর ঘুম থেকে উঠলেই মা তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বলে, 'সুচেতার গতিবিধি আমার মোটেই পছন্দ নয়। সেদিন কোন এক ছোক্‌ড়া এসে তাকে নিয়ে যেতে চাইল মাসির বাড়ি। অনেক কষ্টে সুচেতাকে বুঝিয়ে বারণ করেছি। আমার অনুমতি ছাড়াই পরে দু'জন এক ক্লাবে রাত দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছে।' তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকে, 'রাস্তার মেয়েকে ধরে এনে ঘরের বউ করা যায়? এমনটি যে ঘটবে, তা আমি আগেই আন্দাজ করেছি। ছাড়া গরুকে পোষ মানাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, জেনে রেখো।' এই বলে, হিরন্ময়ী শুভঙ্করের প্রতি ক্রোধান্বিত চাহনি দিয়ে স্থান ত্যাগ করে।

শুভঙ্করও টুঁ-শব্দটি না করে তড়িঘড়ি অফিসের কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মা তার খাবারের কথা বলারও ফুরসৎ পায়নি।

এক, দুই করে তিনটি মাস কেটে গেল, বাড়িতে টাকা পাঠায়, কিন্তু বাড়ি আসার তাগিদ নেই শুভঙ্করের। এটা কী করে সম্ভব সুচেতা ভেবে চিন্তে কূল-কিনারা পায়না। প্রতি সপ্তাহে একটি করে ডাকযোগে শংকরীর মার হাত দিয়ে স্বামীর কাছে চিঠি পাঠায়। তিনটি পত্র সুচেতার হাতে এলেও, ঐসব পত্রে সুচেতার লেখা চিঠির কোন উল্লেখ নেই। কারণটা খুঁজে পায়না সুচেতা। প্রতিটা রাত্রই যেন তার কাছে এক একটি অভিশাপ হয়ে ফিরে আসে। রাগে, অভিমানে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বালিশ ভিজিয়ে দেয়; তারপর আর একটি বালিশ জড়িয়ে ধরে তার অজ্ঞাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। সে যে সন্তানের মা হতে চলেছে—এখবরটি পর্যন্ত জানবার আগ্রহ বোধ করেনা স্বামী। বাল্মীকির আশ্রমে অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে পাঠিয়ে শ্রীরামচন্দ্র কী হালে দিন কাটিয়েছিলেন- একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রই জানেন। এসব কথা সুচেতার স্মৃতিতে সততই আসে। এরপরও দু'মাস কেটে গেল, শুভঙ্করের কোন চিঠি আসে নি!

হঠাৎ হিরন্ময়ী দেবী বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চলে যায়। সুচেতার জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে শুভঙ্কর বাড়ি আসে। এসে দেখে বাড়িটি যেন জন-মানব শূন্য মরুভূমি। পাশের বাড়ি থেকে শংকরীর মা ছুটে এসে দরজা খুলে দেয়। শুভঙ্করকে ঘরে যেতে বলে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, 'বড়বাবু, সুচেতার সব পত্র পেয়েছেন তো? আমি নিজের হাতে ডাকবাক্সে খামে-আঁটা পত্রগুলি ফেলে দিতাম। বড় ভাগ্যে এমন বউ পেয়েছেন। বেচারি চিন্তায় কেমন হয়ে গেছে।'

শুভঙ্কর বলে, 'সুচেতার টেলিগ্রাম পেয়েই বাড়ি এলাম। ওর আর কোন পত্র পাইনি। মার লেখা পত্রগুলি নিয়মিত পেয়েছি।'

শংকরীর মা ভালো লিখতে জানেনা, কিন্তু অন্যের লেখা চিঠি পড়তে তার অসুবিধা হয়না। সুচেতার সব চিঠিই সে পাশে দাঁড়িয়ে কম বেশি পড়েছে। অথচ পত্রগুলি শুভঙ্করের হাতে পৌঁছেনি কেন! তবে কি হিরন্ময়ী একই খামে পত্র পাঠাবার ভান করে সুচেতার পত্রগুলি হাতে রেখে শুধুই নিজের লেখা পত্র খামে পুরে আঠা লাগিয়ে দিত! আরও কতকিছু ভাবতে ভাবতে সে তাদের ঘর থেকে চলে যায়।

শুভঙ্করের মনেও সিড়্‌-বেড়ে নবাঙ্কুরের মতো অজস্র ভাবনা-চিন্তা উঁকি মারতে থাকে। সুচেতা

ঘরে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে তার রুমে প্রবেশ করে। শুভঙ্কর জানতে চায়, ওর মা কেমন আছে। ঝাঁজ মিশ্রিত কথার প্রত্যুত্তরে সুচেতা বলে, 'ভালো না, আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে আবার হাসপাতালে যাব।'

শুভঙ্কর জানতে চায়,রতন কোথায়।

'ওর খবর আমি জানব কী করে?' সুচেতা উত্তর দেয়।

শুভঙ্কর কড়া সুরে স্ত্রীকে সাবধান করে বলে, 'ঘরের বউ রাত জেগে হাসপাতালে রোগীর শুশ্রূষা করবে— এটা আমি হতে দিতে পারিনা।'

'বাড়ির লোকের সেবা করা আমার ধর্ম। আমি তোমার একার নই। আমি পরিবারের সকলের' সগর্বে উত্তর দেয় সুচেতা।

শুভঙ্কর জানিয়ে দেয় প্রয়োজনে সে রোগীর সেবা যত্নের জন্য চব্বিশ ঘন্টাই নার্স রাখার ব্যবস্থা করে দেবে। সুচেতা স্বামীর কথায় কর্ণপাত না করে হাসপাতালের উদ্দেশে পুনরায় বেরিয়ে যায়।

শুভঙ্কর সূচীভেদ্য অন্ধকারে স্ত্রীর পেছন পেছন গিয়ে হাসপাতালের একটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সুচেতার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। ঘন্টা তিনেক হাসপাতাল চত্বরে ঘোরাঘুরি করে সে ঘরে ফিরে আসে। শংকরীর মাকে ডেকে ভোর চারটায় কর্মস্থলে চলে যাবার খবর জানাতে গিয়ে বলে, 'সুচেতার পত্রগুলি তুমি নিজের হাতেই খামে ঢুকিয়ে ডাকঘরে ফেলতে, শংকরীর মা?'

শংকরীর মা নির্দ্বিধায় বলে, 'বৌমা খামে ঢুকিয়ে পত্র দিলেই দিদি ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের পত্র একই খামে পাঠাবে বলে খামটা চেয়ে নিত; ঘরে চলে গিয়ে আঠা দিয়ে খাম বন্ধ করে আমার হাতে ফিরিয়ে দিত। সেভাবেই প্রতিবার আমি ডাকঘরে পত্র ফেলে দিতাম।'

শুভঙ্করের কাছে তার স্ত্রীর লেখা পত্র কেন পৌঁছয়নি, সে ব্যাপারটা তার বুঝতে বাকি থাকেনি। স্ত্রীকে পায়নি বলে তাকে কোন পরামর্শ দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হলোনা। ভোর চারটার ট্রেন ধরে শুভঙ্কর কর্মস্থলে চলে যায়। সুচেতা ভোরে বাড়ি ফিরে জানতে পারে তার স্বামী চলে গেছে।

দু'দিন রতন ঘরমুখী হয়নি। হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে এসে সুচেতাকে বলে, 'দাদা বলেছে পনের-বিশ হাজার টাকা এখনই না দিলে, দাদা তোমার আর মুখদর্শন করবেনা!'

সুচেতা ভাবে, 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টাকায় কেনা-বেচা হয়? সমাজ কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে! পুরুষদের এতো স্পর্ধা! তাদের সেলামি দিয়ে শয্যা-সঙ্গিনী হতে হবে নারীকে! পুরুষ শাসিত সমাজে নারী না থাকলে ভাবী প্রজন্মের পুরুষ কোথা থেকে আসবে? পুরুষদের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় কি?'

রতন জানতে পেরেছে বিভাগীয় অধিকর্তা তার দাদা শুভঙ্করকে অনেক দূরে বদলি করে দিয়েছে। তাই রতনের বড়ো বড়ো হাঁকডাক। শুভঙ্কর বদলির খবর পেয়ে স্তম্ভিত! তবুও সে বাড়িতে খবর না দিয়েই নতুন কর্মস্থলে চলে যায়।

দুপুরবেলা হিরন্ময়ী দেবী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সুচেতার সঙ্গে শাশুড়ি-দেবরের কোন বাক্যালাপ নেই।

রাত দশটায় সুচেতা মেসোকে পত্র লিখতে বসে, 'মেসো, আমি বড়ই অসহায়। পণের টাকার

জন্য শাশুড়ি দেবর মিলে আমাকে উৎপীড়ন শুরু করে দিয়েছে। এযাত্রা আমাকে রক্ষা করো, জীবনে আর কোন কিছুর জন্য তোমাদের কাছে আবদার করবো না। ইতি

তোমাদের —সুচেতা'

গভীর রাতে হিরন্ময়ী রতনকে ডেকে বলে, 'সমস্ত নষ্টামির মূলে— সুচেতা। ওর কু-পরামর্শেই হাসপাতালে শুভঙ্কর আমাকে দেখতে যায়নি। (দাঁত কিড়মিড় করে) আমি সব পারি, জানিস্?'

রতন বলে,'কালই একটা কিছু করব। তুমি ব্যস্ত হয়োনা, মা, ঘুমোও গিয়ে।'

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন সুচেতাকে মুহূর্তের জন্যও বিচলিত করতে পরেনি। ছোটভাই রতন মনে করে বৌদি তাকে ক্ষমার চোখেই দেখে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। শংকরীর মা সুচেতাকে সতর্ক করে বলে, 'শাশুড়ি-দেবর মিলে তোমাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনায় ব্যস্ত।'

আত্ম-প্রত্যয়ে আস্থাশীল সুচেতা এসব উড়ো কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। সংসারে অনভিজ্ঞা সুচেতা! আত্মরক্ষার পথ তোমাকে বেছে নিতেই হবে। যে যুগে মানুষ মানুষকে বলির পাঁঠার মতো কুপিয়ে হত্যা করে, সে যুগে বাঁচার পথ তোমাকে খুঁজে নিতেই হবে। তোমার মতো একটা ক্ষুদ্র প্রাণ ধ্বংস হয়ে গেলে কারোর কিছু যায় আসে না। আত্মরক্ষাই ধর্ম, আত্মশক্তিই পরমশক্তি।

চিড়-ধরা সংসারে হিরন্ময়ী কাকেও সুখী দেখতে চায়না। সংসার তার কাছে সাহারা মরুভূমি। সে আরও দশটা মরুভূমি সৃষ্টি করতে চায়। এখানেই তার অতৃপ্ত মনের পরম তৃপ্তি।

সায়াহ্ন কাল। সুচেতা পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুর মন্দিরে বিগ্রহের সামনে সন্ধ্যারতি করছে। পরিবারের ভবিষ্যৎ বংশধরের কাল্পনিক ছবি তার মানসপটে। স্বামীর পদোন্নতিব কথা ভাবতে ভাবতে সুচেতা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আরাধ্য দেবতাকে বার বার প্রণাম করছে।

ঠাকুর যেন ভ্রূকুটির হাসি হাসছেন। আর যেন বলছেন, 'আসল-নকল বিচার কবে বিবেকের নির্দেশে পথ চলো। জটিল পৃথিবীর কুটিল বেদীমূলে দ্যুলোকের দেব-দেবী অবস্থান করেন না। মনশ্চক্ষু খোলা রেখে এপাশ-ওপাশ দেখে নিও। মানুষের রচিত মায়াজাল মানুষকেই ছিন্ন করতে হয়।'

রতন অনেকক্ষণ বৌদিকে লক্ষ্য করে সামনে এগিয়ে এলো, —বলল, 'বৌদি, তুমি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পূজারিণী, শাড়িটা তোমাকে অদ্ভুত মানিয়েছে। একবার দরজার বাইরে এসো, তোমাকে প্রণাম করে ধন্য হই। তোমার কপালে চন্দনের টিপ্ দেখে মনে হয় যেন কোন মহিয়সী নারী আমার সামনে দণ্ডায়মান।'

সুচেতার কাছে রতনের কথাবার্তা কেমন যেন ঠেকছে। সুচেতা ভাবছে,— 'কোন বদ্‌মতলব নয় তো?' আবার ভাবছে, 'রতন আমার কী-ই বা করতে পারে?' সুচেতা বাইরে পা বাড়াতেই রতন এক বোতল সুগন্ধি জল সুচেতার মাথায় ঢেলে দেয়। সে বলে, 'মা'র আনা ত্রিবেণী সঙ্গমের জল, বৌদি। এ জল মাথায় নিয়ে মরলে স্বর্গধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে রতন বলছে, 'বৌদি, ঠাকুর ঘরের বারান্দায় তুমি অপেক্ষা কর। আমি একটি নতুন শাড়ি নিয়ে আসছি।'

সুচেতা কি জানতো — ঐ শাড়ির মধ্যে রতন আগেভাগেই পেট্রোল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছে! রতনের দেয়া শাড়ি সুচেতা পরছে দেখেও রতন বারান্দা ছেড়ে আসছেনা। শাড়ি পরা শেষ হতেই

রতন ঘরে ঢুকে বৌদির পেছনের দিকের শাড়ির আঁচলে লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঝট্‌পট্‌ বাইরে এসে দরজা খিল মেরে রাখে। সুচেতা বুঝতে পারেনি। হঠাৎ শাড়ির আঁচলে আগুন দেখে সুচেতা চিৎকার করতে থাকে, 'রতন, আগুন, আগুন।' রতন বেপাত্তা। এতোক্ষণে আগুন সুচেতার সারা শরীর গ্রাস করেছে। হিরন্ময়ী গায়ের জোরে কাসর-ঘন্টা বাজাতে থাকে। প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে দেখে সুচেতার দেহ পুড়ে কিম্ভুত-কিমাকার হয়ে গেছে। তারা তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। সুচেতা গলা ফাটিয়ে বলে, 'রতন আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠ আমার গর্ভের সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দিলনা।'

উপায়ান্তর না দেখে হিরন্ময়ী খাটে শুয়ে কাতরানোর ভান করছে। রতন মা'র সেবা যত্নে ব্যস্ত।

সুচেতা কি জানতো— হাসপাতালে শাশুড়ির আশ্রয় নেয়া একটি পরিকল্পিত ছলনা।

পরদিন ভোর চারটে। সুচেতার সর্বাঙ্গে খিঁচুনি। ডাক্তারদের সমুদয় প্রচেষ্ট ব্যর্থ। প্রায় আট-ন ঘন্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে সুচেতা মৃত্যুব কোলে ঢলে পড়ে।

মৃত্যুর আগে সুচেতা, বারবার বলেছে, 'রতন আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ও আমার স্বামীকেও মেরে ফেলবে।'

অচৈতন্য অবস্থায় একবার বলেছে,— 'না! না! রতন আমার কিছুই করেনি। ও আমার দেবর।'

তিন বছর পর নিম্ন আদালত খুনিদের বিরুদ্ধে মৃত্যু-দণ্ডাদেশ দেয়। আসামী পক্ষ নিম্ন আদালতের বায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করে।

আসামী পক্ষীয় ব্যারিষ্টার সুচেতার মুমূর্ষুক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'সুচেতার বক্তব্যানুসারেই রতন নির্দোষ। 'বেনিফিট্‌ অব ডাউটের' পূর্ণ সুযোগ কেন আসামী ভোগ করতে পারবে না? তা ভোগ করার আইনগত অধিকার আসামী পক্ষের রয়েছে। মৃতার দুই ধরনের বক্তব্য। কোনটাই উপেক্ষা করার নয়।'

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মৃতার স্বামীর বক্তব্য শুনতে চাইল। শুভঙ্কর সুচেতাকে জীবনে কখনো ফিরে পাবে না। শুভঙ্করের বক্তব্যের উপরই মা ও ভাই -এব মুক্তি অথবা সাজা দুটোই নির্ভর করে। এই অবস্থায় শুভঙ্কর শুধুই বলল, 'মা ও ভাইকে অবিশ্বাস করলে আমি কখনোই অন্তঃসত্ত্বা সুচেতাকে ওদের তত্ত্বাবধানে রেখে নিশ্চিত থাকতে পারতাম না।'

সরকার পক্ষীয় ব্যারিষ্টার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলে, 'এটা শুভঙ্করের মনের কথা নয়। নিজের বিচক্ষণতার অভাবে সে যখন সহধর্মিনীকে হারিয়েই ফেলেছে, এখন সে অদৃষ্টকে দোষারূপ করে মা ও ভাইকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। সর্বসমক্ষে সুচেতার বাবম্বার উক্তি কখনোই মিথ্যে হতে পারে না, মহামান্য আদালত! সুচেতার শেষ উক্তি তার চৈতন্যলুপ্তির পরক্ষণের বিভ্রান্তিকর প্রলাপ।

মাননীয় বিচারপতি, আমি সমাজ সচেতন পাড়া-প্রতিবেশীদের সত্যভাষণকে স্বাগত জানাচ্ছি। তারাই সুস্থ সমাজ জন্ম দিতে পারে।

পক্ষান্তরে আমি পুলিশের দায়সারা ইনভেস্টিগেশন এর নিন্দা করছি। রতনের বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে লক্ষ্মণরূপী রতন সুচেতাকে সীতার মতোই শ্রদ্ধা ভক্তি করতো, তাই সে ত্রিবেণী

সঙ্গমের জলে আতর মিশিয়ে পূজারিণী বেশে সজ্জিতা সুচেতার মাথায় ঢেলে দেয়। পুলিশ এর কারণটা খতিয়ে দেখেনি।

ভিজে কাপড় বদলানোর জন্য রতনই সুচেতাকে পেট্রোল ছিটানো শাড়ি জোগান দেয়। পেট্রোলের গন্ধ ধামাচাপা দেবার জন্যই আগেভাগে রতন সুচেতার মাথায় সুগন্ধি জল ঢেলেছিল।

ধর্মাবতার ঘটনাটা গভীর ষড়যন্ত্র মূলক। আমি থানায় গচ্ছিত সুচেতার অগ্নিদগ্ধ কাপড়ের অবশিষ্টাংশে পেট্রোলের গন্ধ পেয়েছি। পুলিশকে তা বলিনি। পুলিশ ও অনুসন্ধান করেনি।

আসামীরা বেনিফিট্ অব ডাউটের সুযোগ কখনোই গ্রহণ করার যোগ্য নয়।'

আদালতেই পুলিশের গচ্ছিত বস্ত্রাংশ পরীক্ষা করে সত্য উদ্ঘাটিত হলে ব্যারিষ্টার কাতর আবেদন জানিয়ে বলেন, 'সমাজে লক্ষ্মণরূপী রতনদের যোগ্য শাস্তি না দিলে, নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে সমাজ একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ, ধর্মাবতার!'

উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ সুচেতা মামলার রায়ে শ্রীমতী হিরন্ময়ী গোপ ও শ্রীরতন লাল গোপকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

গল্পের আঙ্গিকে রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা

পার্বতী ত্রিপুরার রূপবৈচিত্র্য, আঁকাবাঁকা পথঘাট, বন্য-পশু-পাখির ডাক, সবুজ বনানী মানুষকে চুম্বকের মতো টানে চিরকাল। অবস্থানগত আকর্ষণেই ত্রিপুরাকে মানুষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে চায়। উপজাতি শ্রেণির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক ভাব-বিনিময় রাজতন্ত্রের আমল থেকেই মানুষের জীবনকে আকর্ষণীয় সুখকর ও মধুময় করে তুলতে সাহায্য করে আসছে। তাই জাতি-উপজাতি সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে মেল-বন্ধনের একটা ঐতিহ্য সহজভাবেই গড়ে উঠেছে। যদিও ইদানীংকালে একটা ব্যতিক্রমী মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। উভয় সম্প্রদায় আজ তার পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করে পরস্পর পরস্পরকে আবারও বুকে টেনে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

অরণ্যবাসীরা অরণ্য-জীবনে অভ্যস্ত। শহরবাসীর কাছে অরণ্য-জীবন রোমাঞ্চকর ও উপভোগ্য। আজকাল অরণ্যে বসবাসকারী যুবক-যুবতীরাও শিক্ষাদীক্ষায় স্বাবলম্বী হয়ে নব্য-সভ্যতার যাদু-স্পর্শে অরণ্যকে ভুলতে বসেছে। এই প্রবণতার রাশ টেনে ধরার মধ্যেই ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করে। বিভাগীয় ও আঞ্চলিক শহরগুলোকে ঢেলে সাজিয়ে তুলতে পারলে অরণ্য-জীবন ও শহুরে জীবনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়ে উঠবে। জাতি উপজাতি নির্বিশেষে যে কেউ ত্রিপুরার যে কোন স্থানে কর্মে বৃত হলে শহরমুখী মনোভাব ক্রমেই হ্রাস পাবে। ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশ সম্ভব হবে।

ত্রিপুরার অগ্রগতির এই মৌলিক ধারা পঞ্চাশ বছর আগেও অনেকে পোষণ করতেন। তাই তারা দুর্গম অরণ্যে জীবন বিপন্ন করে নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করেছেন।

প্রদীপ গুহ তাদেরই অন্যতম। তিনি ভূমি ও রাজস্ব বিভাগে আমিনের পদে ব্রতী ছিলেন। শিক্ষা বিভাগেও এমন শত শত শিক্ষক ছিলেন যাঁরা অরণ্য-জীবনকেই অন্তরের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা ত্রিপুরার উন্নতিকে অনেকটা ত্বরান্বিত করেছেন। এদের ঋণ আমাদের ভুললে চলবেনা।

এই গল্পে আমি প্রদীপ গুহের অভিজ্ঞতার নিরিখে রোমহর্ষক একগুচ্ছ কাহিনি উপস্থাপন করছি। আজ তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত তহশিলদার।

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' কবি-সাহিত্যিকের এই শাশ্বত অভিব্যক্তি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক যুগেও সমান ভাবে সত্য।

১৯৬২ ইংরেজি সনে প্রদীপ গুহকে জরিপের কাজে প্রথম খোয়াই বিভাগে, পরে অন্যান্য বিভাগের দুর্গম অরণ্যে পাঠানো হয়। আগরতলার আশপাশের জরিপের কাজ শেষ করে প্রদীপ গুহ তাঁর টীম নিয়ে খোয়াই বিভাগের আমপুরা অঞ্চলে চলে যান। তখন জাতি-উপজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল যেন হরিহরাত্মা। হিংস্র বন্যপ্রাণী ছাড়া মানুষ মানুষকে হত্যা করবে— সে সময় স্বপ্নেও তা কেউ ভাবতো না। নিত্যদিনের জীবন যাত্রা ছিল সাদামাটা। মাসিক ত্রিশ টাকায় নরেন্দ্র দাশের হোটেলে দু'বার মিল হিসেবে খেয়ে জীবন ধারণ করা যেতো। স্কুল ফাইন্যাল পাশ একজন শিক্ষকের বেতন ছিল একশত আড়াই টাকা। বি-এ-পাশ একজন শিক্ষক বেতন পেতেন ১৬৫ টাকা মাসে। সাড়ে তিন টাকায় দেড়কিলো ওজনের একটি মাছ পাওয়া যেতো। সরিষার তৈলের লিটার ছিল এক টাকা বারো আনা। মণ প্রতি চালের দাম ছিল আট টাকা থেকে দশটাকা।

আমপুরা থানা সংলগ্ন একটি টিনের ঘরে তাঁদের অস্থায়ী অফিস করা হয়। সে ঘরেই তাঁদের থাকা খাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। সমতল ভূমির কাজ শেষ করে তারা জংলা ও বনভূমির গভীর অরণ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেন।

প্রতিদিন কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র খাদ্য গ্রহণ, কত রকমের ফল-পসারি ভক্ষণ তাঁদের ভাগ্যে জুটতো তা বর্ণনাতীত। দেহ-মন-প্রাণ হতো পরম তৃপ্ত। আগরতলা হেড্-অফিসে থাকলে, কর্তা ব্যক্তিদের চোখ রাঙানি, খবরদারি, ইন্টারভেলে চা-খাওয়া শেষ না করতেই লোক পাঠিয়ে স্টল থেকে ডেকে আনা—এখানে এ সব কিছুই নেই। নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় অরণ্যের দৈনন্দিন জরিপের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা। তারপর রাতে খেয়ে-দেয়ে অচৈতন্য ঘুম!

এভাবে কিছু দিন কাজ করার পর কাজ যখন অনেকটাই গুটিয়ে এনেছেন—এমন সময় একদিন হলকা-ক্যাম্পে ফেরার পথে তাঁদের নজরে পড়ে দু'টো বাঘের বাচ্চা। দু'টো বাচ্চাই গা-জড়াজড়ি করে খেলছে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মী সুদীপ চিৎকার করে বলে, 'স্যার, বাঘের বাচ্চা!'

কথাটা কানে আসা মাত্রই সকলে সতর্ক হয়ে যায়। অরণ্যের দিকে লক্ষ্য করে দেখে — বাঘ-বাঘিনী কাছাকাছি আছে কিনা।

প্রদীপবাবু সুদীপকে বলেন, 'একটি বাচ্চা নিয়ে আসতে পারবি?' সুদীপ তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে একটি বাচ্চা ধরে নিয়ে আসে। তাঁরা বাচ্চাটিকে নিয়ে দ্রুত বেগে ক্যাম্পে চলে আসে।

এ খবর রটনা হয়ে গেলে থানার ওসি এবং হাবিলদার প্রদীপবাবুকে বললেন, 'বিপদ টেনে আনলেন ঘরে। বাঘের আক্রমণ থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।'

সারারাত বহু চেষ্টা করেও বাচ্চাটিকে, দুধ বা মাংস— কিছুই খাওয়ানো গেলো না। রাতে বাঘের আনাগোনাও কেউ টের পায়নি। রাত নির্বিঘ্নেই কাটল। দিনের বেলাও মাংস টুকরো টুকরো করে বাচ্চাটিকে দেয়া হলো। মুখ হাঁ-করিয়ে মুখে গরুর দুধ ঢেলে দেয়া হলো। কিছুই মুখে রাখেনা। পরে মুখ হাঁ-করিয়ে জল ঢেলে দেয়া হলো। জলও মুখে রাখতে চায় না।

রাত দশটা না বাজতেই কানে এলো বাঘের গর্জন। প্রদীপবাবু অন্যান্যদের সঙ্গে থানার বারান্দায় বসে পরিস্থিতি সভয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন। চাঁদনী রাত। মেঘ মুক্ত আকাশ। বনের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক কানে আসছে। প্রদীপবাবুর ভয়ের কারণ হলো— কোন কর্মরত পুলিশকে বাঘ অতর্কিতে আক্রমণ করে কিনা! একটু পরেই বস্তিতে শোরগোল শোনা গেল। খবর নিয়ে জানলেন— নবীন চৌধুরির একটা ঘোড়াকে বাঘ আক্রমণ করে আহত করেছে। ঘোড়াটির বাঁচার কোন আশা নেই।

বাঘের গর্জন শোনার পর থেকেই বাচ্চাটিও অনবরত ছট্‌ফট্ করছে। মুখে ঘনঘন 'কুঁ' 'কুঁ' শব্দ। বাঘ নাকি ভূমিতে মুখ ঠেকিয়ে গর্জন করে। ভূমি কেঁপে ওঠে।

ভোরে থানার ওসি প্রদীপবাবুকে থানায় ডেকে নিয়ে বাচ্চাটিকে বনের ধারে ছেড়ে দিতে আবারও অনুরোধ করেন। তিনি প্রদীপবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে—বাচ্চাটিকে ছেড়ে না দিলে তিনি বন বিভাগকে জানাতে বাধ্য হবেন।

সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে প্রদীপবাবু বাচ্চাটির গলায় পাটের দড়ি দিয়ে গলাবন্ধ তৈরি করে ছড়ার পাড়ে একটি কদম্ব গাছের ডালে বেঁধে রাখেন এবং দু'টি মোটা ডালের সংযোগ স্থলে দাঁড় করিয়ে দেন। দুই দিকে দড়ি দিয়ে টানা দিয়ে রাখেন যাতে লাফ দিয়ে পড়তে চেষ্টা করলে ঝুলন্ত অবস্থায় মারা না পড়ে। মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচুতে দাঁড়ানো ছিল বাচ্চাটি। সহজাত সন্তানপ্রীতি প্রতিটা প্রাণীতেই বিদ্যমান।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যা রাতেই বাঘটি বস্তিতে আবার হানা দেয়। একটি বাছুরকে মেরে ফেলে। মা-এর আগমন বুঝতে পেরে বাচ্চাটি ঘন ঘন 'কুঁ ' কুঁ' শব্দ করতে থাকে। প্রত্যেকেই অনেকদূর থেকে দেখে অন্ধকারে বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে।

বাঘ বাচ্চাটি দেখে দু'তিনবার লাফ দিয়েও বাচ্চাটি নিচে নামাতে পারেনি। বাঘ তখন অসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে থাবার নখর দিয়ে মাটি আঁচড়াতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল প্রচণ্ড লাফ মেরে বাচ্চাটির ঘাড়ে কামড় দিয়ে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনে। তারপর বাচ্চা নিয়ে গভীর অরণ্যে চলে যায়। বাঘের এই কলাকৌশল দেখে সকলেই বিস্মিত হয়। বস্তির লোকজন, থানার স্টাফ সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

বছর খানেক আগে টি-ভির এক 'ওয়াইল্ড লাইফ' সিরিয়াল দেখে অবাক্ হয়েছিলাম। একটা বনের ধারে এক পাল হরিণ ছোট ছোট হরিণ শাবকদের নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছিল। গভীর বন থেকে শিকারের লোভে বেরিয়ে এলো দু'টি বাঘ। প্রথমটি সামনেই একটা হরিণকে ঘাড় মট্‌কে বনের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয়টি আসার আগেই সব হরিণ দৌড়ে পালিয়ে গেল। একেবারে কচি একটি শাবক না পালিয়ে দ্বিতীয় বাঘটির বাঁটের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করল। এটি হয়তো একটি বাঘিনী হবে। সে তার নাক-মুখ-থোতা দিয়ে শাবকটিকে আদর করার মতো ধাক্কা মারল। শাবকটি আবার বাঁটের দিকে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করল। বাঘটি তখনো স্থির দাঁড়িয়ে! কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর আস্তে আস্তে বনের দিকে চলে গেল। হরিণ শাবকটিও যে রাস্তা ধরে সে-স্থানে এসেছিল সে-রাস্তা দিয়েই গন্তব্য স্থানে চলে গেল।

এমন ঘটনা বিরল হলেও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে! এ সব ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে! বিপদাপন্ন জাহাজকে ডলফিন পথ দেখিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসে। দক্ষিণ ভারতে একটি হাতির অকাল মৃত্যুকে ঘিরে মালিকের অন্যান্য দশ বারোটি হাতি শুঁড় উর্ধ্বে তুলে শোকজ্ঞাপক অভিবাদন জানায়। প্রাচীন ভারতে হিংস্র প্রাণীরা হিংসা ভুলে মুনি ঋষিদের সংশ্রবে জীবন কাটাতো। এসব ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সৈনিক বিভাগে বানর, হাতি, ঘোড়া, কবুতরকে শিক্ষিত করে আজও মানুষ অসাধ্য কাজ সাধন করছে। প্রদীপবাবু এবার আরও অনেকটাই সাবলীল হয়ে আরও তিনটি ঘটনার পরপর বর্ণর্না দিতে থাকেন।

১৯৬৪ ইংরেজি সন। ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা মনুঘাট অফিস করে গভীর অরণ্যে জরিপের কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য এই টীমের ওপর নতুন নির্দেশিকা জারি করেন।

প্রদীপবাবু এবার দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি বলছেন, 'আমি তখন দলের ১২ জন কর্মীর সঙ্গেই পৃথক পৃথক আলোচনা করি। এর মধ্যে দু'জন অফিসারও রয়েছেন। যারা সমতল ভূমিতে কাজ চালাবেন, তাদের গ্রুপে ৩ জন করে লোক থাকবে। বড় গ্রুপের থাকবে ৬ জন। কর্মী থাকবে ৪ জন। আর পর্যবেক্ষক থাকবেন দুই অফিসার।

প্রথম ব্যক্তি নির্দেশ মতো বৃটিশ আমলের নিদর্শন দেখে দেখে পাশ দিয়ে লাল ফ্ল্যাগের খুঁটি বসিয়ে এগিয়ে যাবেন। পরের দু'জন শিকল টেনে মাপজোক করে রেকর্ডারকে জানাবেন। রেকর্ডার নির্ভুল হলে রেকর্ড করবেন। অফিসার দু'জন সঠিক কাজ চলছে কিনা দেখবেন।

প্রদীপবাবু ভাবছেন— অরণ্যবাসীদের চালচলন, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ কিছুই তাঁর জানা ছিল না। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতোই তাঁদের কাজ করে যেতে হবে। অবশ্য তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। সঠিক কাজ করলে যথাসময়ে মূল্যায়ন হবে—অন্তরের বিশ্বাস।

প্রদীপবাবু বললেন, 'মনুঘাটের পূর্ব-দক্ষিণে 'কেনটনমেন্ট' হিলের পাশাপাশি জায়গা প্রথম জরিপের জন্য বেছে নিলাম। রিয়াং বস্তির এক অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে আমাদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা হলো। নিজেরাই বেশির ভাগ সময় পাক করে খেতাম। রিয়াং মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলামেশা ও সহযোগিতা করতো পাকের কাজে। তরিতরকারি, চাল, ডাল, মাছ, শুঁটকি —সবই বাড়ির লোকেরা সরবরাহ করতো। আমরা ন্যায্য মূল্য দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তারা গ্রহণ করতো যৎকিঞ্চিৎ মূল্য। সপ্তাহে দু'দিন মাংসের ব্যবস্থা থাকতো। ঐ গৃহেই ১২ জন বিভিন্ন রুমে মাচার ওপর কম্বল বিছিয়ে ঘুমোতাম। রাতে স্ব স্ব গ্রুপের দৈনন্দিন কাজের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হতো। অফিসার দু'জন সময়োপযোগী পরামর্শ দিতেন। রান্নাবান্নার মাচার ঘরটি ছিল আয়তনে বড়ো। সে ঘরেই খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

পঞ্চম দিন রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা যার যার রুমে ঘুমোতে যাব—এমন সময় বন্য-শূকর আর চিতা-বাঘের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। কয়েক দিন আগে শূকরী বাচ্চা দিয়েছে। ঐ বাচ্চাগুলোর লোভে চিতাবাঘ তাদের আক্রমণ করে। শূকরী এখানে-ওখানে বাচ্চা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। যেখানেই শূকরী আশ্রয় নেয়, সেখানেই চিতাবাঘ ঘাপটি মেরে আক্রমণ চালায়। পুরুষ শূকরটি চিতাবাঘকে দাঁত দিয়ে সাঁড়াশি আক্রমণ করে। এভাবে লড়াই চলে প্রায় দু'ঘণ্টা। মাঝে মাঝে দুই বাঘ দুই দিক থেকে একসঙ্গে আক্রমণ চালাতে শুরু করে।'

বাড়ির মালিক এসে আমাদের আশ্বস্ত করে, 'বাঘে-শুয়রে ঝগড়া করে, আপনাদের ভয় কি?'

'আমরা শহর থেকে গিয়েছি। চিতাবাঘ আর রয়েল বেঙ্গলের হিংস্রতা কোন দিন চোখে দেখিনি। তাই সকলে ভয়ে জড়োসড়ো।

হঠাৎ কানে আসে বাঘের বিকট আওয়াজ। ক্ষিপ্ত পুরুষ শূকরটি বাঘের চোখে দাঁত দিয়ে সজোরে ঘায়েল করে। সকালে মৃত চিতা বাঘটি দেখে তা অনুমান করলাম। পরে শুকরী বাচ্চা নিয়ে টিলার ঢালুগর্তে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পায়। দ্বিতীয় বাঘটিও ভয়ে পালায়। রাত দুটোর পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। আমরা তখন অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সুবল সরকার নামে বি-এ পাশ যুবকটি সারারাত ঘুমোয়নি। সকালে ঘুম থেকে ওঠে তল্পিতল্পা নিয়ে সে শহরে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নেয়। আমি তাকে বুঝিয়ে কিছুতেই চাকুরি না-ছাড়ার প্রস্তাবে রাজি করাতে পারিনি।

খবরটা বাড়িওয়ালাদের কানে যায়। মৈনাক রিয়াং নামে একটি যুবতী মেয়ে রান্না-বান্নার সময় সুবলকে নানাভাবে সাহায্য করতো। সে সুবলের প্রতি অনুরক্তা —এ খবর সুবলও জানতো না। মৈনাক সুবলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কী যেন বলে।

মৈনাক খুবই সুন্দরী মেয়ে, ব্যবহার অসাধারণ ভদ্রোচিত, তার মুখের হাসিতে সুবল বন্দি হয়ে পড়ে। লেখাপড়ায় স্কুল ফাইন্যাল পাশ। সে কমলপুর বাঙালি অধ্যুষিত স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে।

সুবল সবেমাত্র বি-এ পাশ করেছে। বাড়িতে বিধাবা মা, ছোট ভাই সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। দেখতে সুপুরুষ, ধীর, স্থীর ও শান্ত সুবল পরে আমাকে জানায়, সে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে—চাকুরি ইস্তফা না দেবার প্রস্তাবে রাজি আছে। আমি ব্যাপারটা আঁচ করে সে-যাত্রা তাকে কিছুই বলিনি। যেন-তেন- প্রকারেণ আমাদের 'মিশন'-টা সফল হোক এটাই ছিল আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

এদিকে বাড়িওয়ালা পুরুষ শূকরটিকে অর্ধমৃত অবস্থায় বাড়িতে এনে সবাইকে নিয়ে ভোজের আয়োজন করে। সরকারি কর্মচারীদের কাজে না যাবার আবেদন জানায়। বস্তির অনেক লোককে আমন্ত্রণ করে ভোজে অংশ গ্রহণের অনুরোধ রাখে। দুপুরে বেশ জমজমাট আনন্দ উল্লাসে ভোজন পর্ব শেষ হয়। মৈনাক স্কুলে শেখা একটি রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে —

'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।।
পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে, বাজে আমার বুকের মাঝে—
বাজে বেদনায়।।
পূর্ণিমাতে সাগর হতে ছুটে এল বান,
আমার লাগল প্রাণে টান।
আপন মনে মেলে আঁখি আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়।।

এ যেন শকুন্তলারই পতিগৃহে যাত্রার পূর্বাভাস।

মানবিক রুচিবোধ, সহমর্মিতা, স্বচ্ছ জীবন-যাপনের প্রতি অনুরাগ বিশ্বের সব মানুষের মধ্যেই কম-বেশি আছে। যাদের শিক্ষায় তা সম্প্রসারিত হয়, তারাই সুশিক্ষায় শিক্ষিত। যাদের হয়না— তাদের শিক্ষা সার্টিফিকেট সর্বস্ব। তাদের শিক্ষাকে সুশিক্ষা বলা চলে না।

১৯৬৫ ইংরেজি সন। পেঁচারথল থেকে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত এলাকায় ভল্লুকের উপদ্রব বেশি। সেখানে এক জায়গায় জরিপের কাজ করতে গিয়ে টীমের পিয়ন ভল্লুকের খপ্পরে পড়ে। সে টীমের অগ্রবর্তী কাজ করছিল লাল ফ্ল্যাগের খুঁটি মাটিতে পুঁতে পুঁতে। আমরা তিনজন ছিলাম পেছনে। হঠাৎ একজনের নজরে আসে সামনে পুঁতে রাখা লাল ফ্ল্যাগটি নেই। পিয়নটিকে ডেকেও কোন সাড়াশব্দ মিলছে না। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে দু'টি ভল্লুক লাল ফ্ল্যাগটি টুকরো টুকরো করছে। আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া! তিন জনই স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে।

একজন কর্মীকে বস্তির লোক ডেকে আনার জন্য পাঠাই। দলেবলে লোক দা, কুড়াল, খন্তা, লাঠি-সোটা নিয়ে হাজিরা হয়। তাদের মধ্যে একজন বাঁশের চোঙায় কেরোসিন তেল আর কাপড় ঢুকিয়ে মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। বন্য প্রাণী মাত্রই আগুন কে ভীষণ ভয় পায়। ইত্যবসরে ভল্লুক দেয় চম্পট। পিয়নটির নাম ছিল অবনী সূত্রধর। আমরা 'অবনী অবনী' বলে চিৎকার দিয়ে ডাকতে থাকি। কোন সাড়া মিলছে না। বস্তির লোকেরা ধারণা অবনী ৪০ ফুট গভীর ছড়ায় পড়ে গেছে। দশহাত দূরেই এতো গভীর ছড়া আমরা অনুমানই করতে পারিনি। ছড়া দশ ফুট প্রশস্ত হবে। দুই পাড়ের বৃক্ষাদির ডালাপালা জড়াজড়ি করে আছে। তাদের আবার ঘিরে রেখেছে নানা জাতের লতাপাতা। দূর থেকে ছড়াটি চোখেই পড়ে না। মনে হয় যেন লতাপাতায় ঘেরা সমতলভূমি। বস্তির লোকের কথাবার্তায় আমরা আশংকিত হই, আমরা মুষড়ে পড়ি। তবুও আশা ছাড়িনি। তাকে খুঁজে বের করার প্রাণান্ত চেষ্টা করে চলেছি।

একজন রিয়াং যুবক ছড়ার পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে অবনীর মাথা। অবনীও লোকজনের সমাগম দেখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে চলেছে। একজন চিৎকার দিয়ে বলল, 'আর ভয় নেই, আমরা তোমাকে বের করে আনব।'

দুই তিনটি মুলি বাঁশ কেটে, লতাপাতার ওপর ফেলে দিয়ে তাকে ধরতে বলা হলো। কিন্তু বাঁশ অবনীর ভর সহ্য করতে পারছে না। ক্রমেই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর একজন বৃদ্ধ রিয়াং জরিপের শিকলটি তার হাতে ছুড়ে মারার কথা বলল। আর বলল, সে যেন শিকলটি কোমরের প্যাঁচিয়ে দুই হাতে শিকল আঁকড়ে ধরে। অবনী তাই করল, কিন্তু টেনে আনতে গিয়ে তার শরীরের ছড়-বাকল উঠে যায়।

এবার দু'টি বাঁশের মাথা একত্রে বেঁধে শিকলটি ওপরের দিকে ঠেলে ধরে কোন রকমে অবনীকে টেনে পাড়ে নিয়ে আসা হলো। সে বলল, 'ভল্লুকের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে সমতল মনে করে লতানো গাছের পাতায় ঘেরা ছড়াটিতেই লাফ দিয়ে পড়েছিলাম। বিধাতার কৃপায় প্রাণে বেঁচে আছি।'

অনিবার্য মৃত্যুর কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মানুষ কখন কী করে বসে তা কেউ বলতে পারে না, ভাগ্যগুণে কেউ বেঁচে যায়, কেউ বা মারা পড়ে। দুর্ঘটনার মুখে উড়ন্ত প্লেন থেকেও মানুষ

মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচতে চায়। এ সব তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত কোন নিয়মের ধার ধারে না।

সর্বশেষ অভিজ্ঞতাটি আরও ভয়াবহ। ১৯৬৫ ইংরেজি সনের অক্টোবর মাস। মনুঘাট থেকে উল্টা ছড়ার আশপাশ অঞ্চলে জরিপের কাজে গিয়েছি। দুর্গম অরণ্য। করমছড়া থেকে জল বইছে উল্টো দিকে। তাই এর নাম উল্টা ছড়া। ছড়ার মধ্যে প্রবেশের আগে প্রয়োজনীয় জরিপের কাজ শেষ করে এনেছি। এবার ছড়ার মধ্য দিয়ে শিকল টেনে মাপ-জোক করে রেকর্ড করতে হবে। লাল ফ্ল্যাগ এর খুঁটি বসানোর কাজ চলছে। ছড়াতে কোথাও জল, কোথাও চরাভূমি, মাঝে মাঝে ছোট বড় বোল্ডার, স্রোতের টানে ভেসে আসা আস্ত গাছ, আবর্জনা আরও কত কিছু। এসবের মধ্য দিয়েই প্রায় ছয় মাইল পথ এগিয়ে গেছি। স্রোতের অনুকূলে আমাদের যাত্রা। সামনে কোন হাতি বা বন্যপ্রাণী জল ঘোলা করলে সে জল আমাদের দিকে আসে না।

মানুষ যেমন দুষ্কর্মের জন্য সমাজচ্যুত হয়, তেমনি প্রাণীদের মধ্যেও দলছুট প্রাণী থাকে। এরা দলের অন্যান্য স্ব-প্রজাতি প্রাণী থেকে দূরে থাকে। এখানে এমনই এক দলছুট বন্য দাঁতাল হাতির খবর আগেই পেয়েছিলাম। বন্য হাতি মানুষের শব্দ পেলে নীরবে অনড় হয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, একশ গজের মধ্যে একটি বিরাটকায় হাতির অবস্থান টেরও পাওয়া যায় না।

আমরা ছড়ার মধ্য দিয়ে কাজ করতে করতে ঐ দাঁতাল হাতিটির প্রায় সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। হাতিটি হঠাৎ নজরে পড়ায় আতংকে আমাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ! তারপর জল, কাদা, গাছ-গাছালি পাথর ডিঙিয়ে কেবল দৌড়ের পর দৌড়! এক সেকেণ্ড দাঁড়াবার অবকাশ নেই! পাশ কেটে যেতে হয় মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো বোল্ডার। কত বার সকলে আছাড় খেয়ে পড়েছি, তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। বোল্ডারের আঘাতে সুহৃদ রায়চৌধুরি প্রায় অচল হয়ে পড়েন, কিন্তু থেমে থাকার পরিণাম মৃত্যু,— তা জেনে প্রাণপাত দৌড়ানোর চেষ্টা করছেন। সৌরেন দাস অনেকটাই কমবয়সী বলে আমাদের সঙ্গে অনেকটা তাল মিলিয়ে দৌড়োচ্ছেন। হাতি ও উন্মত্ত হয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। হাতির আঘাতে বড় বড় বোল্ডার ভেঙে চুরে দূরে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ছে। সুহৃদ রায়চৌধুরি ও সৌরেন দাস—দুজনই আমাদের অফিসার। সে দিন সঙ্গে গিয়েছিলেন নিজেদের ইচ্ছাতেই। দৈবক্রমে পড়লেন বিপাকে। প্রায় ফার্লং তিনেক পেছনে ফেলে এসেছি। পাঁচ মাইল দৌড়োনোর পর আমরা ছড়া থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তায় এসে পড়লাম। হাতি আমাদের পিছু কিছুতেই ছাড়ছেনা। এবার আমরা ছড়া থেকে বেরিয়ে ধান খেতের আইলে এসে একটু বিশ্রাম নিলাম। সামনেই জনবস্তি। দৌড়ে গিয়ে একজন বস্তিতে খবর পাঠালাম। হৈ হৈ করে এক দেড়শত লোক বস্তি থেকে বনের রাস্তার মুখে এসে দাঁড়াল। হাতি থামল বটে, কিন্তু রাগ কমছে না। বিপদের আশংকা করে ধান জমির শুক্‌নো খড় টালের টাল এনে রাস্তার মুখে জড়ো করা হলো। তারপর আগুন জ্বালিয়ে হাতিকে ভয় দেখানো হলো। আগুনের লেলিহান জিহ্বা পনেরো বিশ হাত ওপরে ওঠায় হাতিটি একটা পাকা ধানের জমিতে নেমে জমিটাকে লণ্ডভণ্ড করে—কাদামময় করে দিয়ে গেল। এই জমি থেকে এক মুঠো ধানও পাবার আর অবস্থা রইল না। ঘণ্টাখানেক পর বনের রাস্তা। ধরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। আমরা যদি হাতির নাগালের মধ্যে পড়তাম, আমাদের অবস্থা কী যে হতো আজও ভাবলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়।

কিছুদিন পর বাকি কাজ সমাধা করে আমরা রাজধানীতে ফিরে এলাম।

জীবন সায়াহ্নে এসব ঘটনা রোমন্থন করে বেঁচে আছি।

শাস্তি

বৃক্ষ থেকে খসে পড়া অপরিণত ফলের মতোই স্বকৃত-অপরাধে প্রতিদিনের অভ্যস্ত শিক্ষা জীবনের অঙ্গন থেকে ছিট্‌কে গেল হরিনাথ দেব। সে ছিল স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ফার্স্ট বয়। জয় কিশোর কল্পই ছিল সেকেণ্ড। ইংরেজি বিষয়ে জয়কিশোরের অসাধারণ প্রতিভার বাস্তব প্রতিফলনকে হরিনাথ ঈর্ষার চোখে দেখতো। পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় তাকে টেক্কা দিতে গিয়ে হরিনাথ অসদ্ উপায়ের জালে গভীরভাবে জড়িয়ে যায়।

দুর্নীতি করার অভ্যাস মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হলে শিক্ষার্থীমাত্রই অনৈতিক পথে কাজ হাসিল করার প্রচেষ্টা চালায়। কখনো গভীর পঙ্কে হাবুডুবু খায়। সেখান থেকে ফিরে আসা অনেকের পক্ষেই আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেই ভয়ানক পরিণতিই ঘটল হরিনাথের জীবনে।

আমি তখন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক। বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাই স্কুল থেকে সবেমাত্র বিবেকানন্দ হায়ার সেকেণ্ডারী নাম নিয়ে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যালয়ে তখন শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী, আসবাব পত্র, শিক্ষাদানের উপযুক্ত ঘর— সব কিছুই ছিল অপ্রতুল। তবুও পড়াশোনার স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যদিও অভিজ্ঞতা অপরিণত—তথাপি উৎসাহ, উদ্দীপনার জোরে সব রকম দুর্বলতাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

একদিন অষ্টম শ্রেণির ক্লাসে বাংলা পড়াতে গিয়েছি। বিষয় ছিল মহাপুরুষদের জীবনী পাঠের উপযোগিতা। ভারতপথিক বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমার আলোচনার সূত্রপাত। আমি বলতে শুরু করি, আমাদের এক হাতে পাঁচটি আঙ্গুল। আঙ্গুলগুলো ঈশ্বরের বিধানেই অসমান। কিন্তু দেহের পক্ষে প্রতিটা আঙ্গুলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীমা। যখন যে আঙ্গুলটা প্রয়োজন, তখন সে আঙ্গুলটাই আমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করি।

সমাজে সমান প্রতিভা নিয়ে সব শিশু জন্মায় না। সব শিশু সমান পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠার সৌভাগ্যও লাভ করেনা। প্রতিটা শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি থাকে, যাকে জাগ্রত করতে পারলে যে কোন শিশু ভাবীকালে অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। প্রতি শিশুর পথ ভিন্ন, বিকাশের ধরন এবং তাদের সাফল্যও আসে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে।

কার জন্য কী কাজ নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, কেউ বলতে পারে না। সৎ মনোবৃত্তি নিয়ে, সাধ্যমতো শিক্ষা সমাপ্ত করে যার যার কর্মময় জীবন তাদের বেছে নিতে হয়। নৈতিক মানদণ্ড হাতছাড়া করলে যে কোন সময় পতন অনিবার্য। জয়কিশোর ও হরিনাথের সম্ভাবনাময় জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি কথাগুলো বলেছিলাম।

তখন হরিনাথ আমাকে প্রশ্ন করে, 'স্যার, সমাজে ক'টা লোক এমন আছে, যারা সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করে এতো অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয়েছে?'

আমি মনে মনে ভাবলাম, হরিনাথের তাৎক্ষণিক লাভের দিকেই বেশি নজর। তবুও আমার উদ্দেশ্যে তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। আমি বললাম, — অর্থ সম্পদ মানব জীবনে উন্নতির মানদণ্ড নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশই প্রকৃত মানদণ্ড। অরণ্যে বনস্পতি সংখ্যায় এক দু'টোই থাকে। দিনের বেলা আকাশে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করছে একটি সূর্যই, আর রাতের আকাশে শান্ত, স্নিগ্ধ,

মমতাময় আলো বিকিরণ করে সেই একটি চাঁদ। ঐ একটি হয়ে ওঠার মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা। এই চাঁদ আর সূর্য কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মুখে হাসি ফোটায়। বনস্পতিকে আশ্রয় করে শতশত প্রাণী জীবন ধারণ করে। বটবৃক্ষ রাতের আঁধারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ নিঃসরণ করে না, তাই তপোবনের ঋষিরা বটবৃক্ষের নিচে সাধনায় মগ্ন থাকতেন।

তারপর বলি, —সুশিক্ষা মানুষকে পরার্থে জীবনদানের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। ভালোমন্দ বিচারের মাধ্যমে আমরা ক্রমোন্নতির পথে কাজ করি, এগিয়ে যাই। এমনি করেই আমরা দেবত্বে উন্নীত হতে পারি।

এসব কথাশুনে হরিনাথ চুপ মেরে যায়। ঘণ্টা পড়ায় আমিও ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসি।

হরিনাথ—অঙ্ক, বাংলা, ইতিহাস ও ভূগোলে —বরাবরই ভালো। জয়কিশোর ইংরেজি বিষয়ে তুলনাহীন।

ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় জয়কিশোর হরিনাথকে বাংলা, ইতিহাস ও ভূগোলে অনেকটাই পেছনে ফেলে দিয়েছে। অঙ্ক বিষয়ে হরিনাথ এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বার্ষিক পরীক্ষায় জয়কিশোর হরিনাথকে। ডিঙিয়ে ফার্স্ট হয়ে যেতে পারে বলে শিক্ষকদের ধারণা। যতই পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসছে, ততই হরিনাথ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীর বিকাশের পথ সুগম করে। কিন্তু সে প্রতিযোগিতা হবে সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত সুস্থ মনে, সুস্থ পরিবেশে। জয়কিশোরের সঙ্গে পাল্লা দেবার প্রতিযোগিতায় হরিনাথ অবতীর্ণ হয়নি। তার মনোবলও সুদৃঢ় নয়। হরিনাথ অন্যের সমর্থন পুষ্ট দুরভিসন্ধিমূলক প্রতিযোগিতার পথ বেছে নেয়।

স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হরিনাথ নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এসব অনুষ্ঠানে মেয়েদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে। ফলে স্কুলের ছাত্রীমহলে তার একটা প্রভাব নিশ্চিতই আছে। তার শিক্ষাগত অবস্থানের হেরফের হলে এ প্রভাবেও ভাঁটা পড়বে। এটা তার মনের আর একটি সংশয়। তা ছাড়াও এতোদিন ভালো ছাত্র হিসেবে শিক্ষকগণ তার অনধিকার চর্চা ও বাহুল্য কাজকে ক্ষমার চোখেই দেখতো, তা থেকেও সে বঞ্চিত হবে। এসব নানা চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত করছে। ফলে যেন-তেন-প্রকারেণ ফার্স্ট প্লেস তার দখলে রাখতে হবে— এটাই তার এখন ধ্যান-জ্ঞান। তাই সে আগে থেকেই বার্ষিক পরীক্ষায় কারচুপি করার চিন্তায় মগ্ন।

কিন্তু সে জানে না—ভাল ছাত্র হিসেবে ক্ষমা পেতে গেলে তার অপরাধগুলোও বালখিল্য আচরণের সমতুল্যই হতে হবে। ভালো ছাত্রের তক্‌মা ঝুলিয়ে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না।

হরিনাথ গোপনে তার অভ্যাসগত দুর্নীতির পথেই হাঁটতে শুরু করে। শিক্ষকগণ ঘূণাক্ষরেও তা আঁচ করে উঠতে পারেন নি।

ডিসেম্বর মাস। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। স্কুলের পরিবেশ মোটামুটি শান্ত। দু'দিন ভালভাবেই কাটল। তৃতীয় দিন পরীক্ষার হল থেকে জনৈক শিক্ষক আমার রুমে এসে অভিযোগ করলেন, 'স্যার, হরিনাথ দুইজন শিক্ষক থেকে পরীক্ষা শুরুর প্রাক্‌কালে হুড়োহুড়ির মধ্যে দুটি খাতা সংগ্রহ করেছে। অথচ জিজ্ঞেস করায় স্রেফ অস্বীকার করে।'

আমি শুধু বললাম, 'আপনারা আরও সতর্ক থাকুন।'

চতুর্থ ও পঞ্চম দিন ভিন্ন দুই শিক্ষককে পেয়ে — দু'টি করে খাতা হরিনাথ আবারও সংগ্রহ করে এবং তারিখ সম্বলিত তাঁদের স্বাক্ষরও আদায় করেছে। পরীক্ষার শেষ হওয়ার পর রিপোর্টটি আমার কাছে আসে।

'অবজারভার' নিয়োগকরণ পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে খাতা অপহরণের কাজ সে বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে স্কুলের পিয়ন গিরীন্দ্র রায়কে কব্জা করে অফিস থেকে খাতা সংগ্রহের কাজ চালিয়েছে।

গিরীন্দ্র রায়ের সঙ্গে তার একটা গোপন যোগাযোগ ছিল দু'বছর আগে থেকেই। পুরোনো শিক্ষকদের আলোচনার পরে তা টের পেয়েছি।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে প্রায় এক সপ্তাহ আগে।

অষ্টম শ্রেণির অঙ্ক পরীক্ষক বার্ষিক পরীক্ষার খাতা দেখে আমাকে বলেন, 'স্যার, একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। ওদের অঙ্ক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অফিসে এসে জয়কিশোর এবং হরিনাথের দুটো খাতাই আমি উল্টে-পাল্টে ভালো করে দেখেছিলাম। সে দিন হরিনাথ-এর সত্তর এবং জয়কিশোরের নম্বর পঁয়ষট্টি 'কারেক্ট' হয়েছে দেখেছিলাম। কিন্তু খাতার বাণ্ডিল বাড়িতে নিয়ে হরিনাথের খাতা খুলেই দেখি পুরোটাই ভিন্ন খাতা। কোন অস্পষ্টতা, কাটাকাটি কিছুই নেই। তাছাড়া সব অঙ্কই নির্ভুল।

পরীক্ষার হলে খাতা চুরির ছবিটা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা প্রশ্নই মনে ঘুরপাক খাচ্ছে —এই খাতা বাণ্ডিলে ঢুকলো কী করে! ড্রয়ারের চাবি তো আমারই হাতে!

ইংরেজি পরীক্ষক রিপোর্ট দিলেন, 'পরীক্ষার হলে লেখা খাতাটি পাল্টিয়ে হরিনাথ কীভাবে নতুন একটি ভিন্ন খাতা বাণ্ডিলে ঢুকিয়ে দিল বুঝতে পারলাম না!'

ইংরেজি পরীক্ষকের কথাবার্তায় মনে হলো এই খাতা বাণ্ডিলে পরে ঢুকেছে। আমি মনে মনে ভাবলাম পিয়ন গিরীন্দ্র রায় এই দুর্নীতির সঙ্গে নিশ্চয়ই যুক্ত। কিন্তু বিকল্প চাবি কী করে সংগ্রহ করল? দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় আমার খাওয়া আর ঘুম সবই প্রায় বন্ধ!

পরে দুই পরীক্ষককেই অফিসে ডেকে বলে দেই, তারা যেন হরিনাথের খাতায় কোন নম্বর না দিয়েই অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর নম্বর সম্বলিত লিস্ট সহ পুরো বাণ্ডিলটাই আমার হাতে জমা দেন।

ফসলের জমি থেকে পোকায় ধরা গাছটি উচ্ছেদের পরিকল্পনাই মনে মনে স্থির করে নিলাম। কিন্তু পিয়নটিকে বরখাস্ত করলে তার বউ-পোলা উপোসে মরবে—এ চিন্তায় আমি বিব্রত।

এরই মধ্যে মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে একজন যুবক ছেলেকে পিয়ন হিসেবে নিয়োগ করলাম। ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারিকে সব কিছু খুলে বলার পর তিনিও অনুমোদন করলেন। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম, কী করে গিরীন্দ্র রায়কে স্কুল থেকে সরিয়ে দেয়া যায়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ খাতা দেখায় ব্যস্ত। এক ছুটির দিনে সন্ধ্যাবেলায় আমি ঘরে বসে আছি—এমন সময় সপ্তম শ্রেণির একটি ছাত্র এসে আমাকে বলল, 'স্যার, আপনি কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি।'

আমি তাকে বললাম, 'তুমি নির্ভয়ে বলো, আমি তোমার সব কথাই শুনব।'

সে তখন কাঁচুমাচু খেয়ে বলল, 'ক্লাশ এইট-এর অঙ্ক পরীক্ষার দিন হরিনাথদা আমার পড়ার ঘরে দরজা লাগিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্য একটি খাতায় আবার অঙ্ক পরীক্ষা দিয়েছে। সন্ধ্যার পর অফিসের দিকে আসতে দেখে আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখি ঘরের ভিতর গিরীন্দ্রদা মোম জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হরিনাথদা এই খাতাটি তার হাতে তুলে দিয়ে আর একটি খাতা পকেটে করে নিয়ে বাড়ি চলে যায়।'

আমি তখন ছেলেটিকে বললাম, 'প্রয়োজন হলে এই কথাটি পরে স্বীকার করবে তো?'

সে তখন কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'ইংরেজি পরীক্ষার দিনও সে নয়ন বণিকের বাসায় নতুন খাতায় পরীক্ষা দিয়ে স্কুলে এসে সন্ধ্যার পর জমা দিয়েছে। নয়নদা আমাকে বলল।'

আমি বললাম, 'সব দেখছি, তোমার কাবোর কাছে এসব কথা বলাবলি করার প্রয়োজন নেই'। এরপর ছেলেটি বাড়ি ফিরে যায়।

পরদিন থেকে আমার অফিসিয়েল সব কাজে গিরীন্দ্রকে বাদ দিয়ে নতুন নিয়োজিত ছেলেটিকে প্রয়োগ করি এবং গিরীন্দ্রকে ঢাকের বাঁয়া করে রেখে দেই। গিরীন্দ্র হাড়ে হাড়ে সব টের পেতে থাকে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার আর মাত্র তিন দিন বাকি। স্কুল থেকে ফিবে আমি ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছি—এমন সময় পার্শ্ববর্তী স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র চিন্ময় আমার বাসায় আসে। সে এসেই একটি 'চাবি' পকেট থেকে বের করে বলে, 'স্যার' এই চাবিটা আপনার কিনা দেখেন।'

আমি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখি— আমার পার্সোন্যাল ড্রয়ারের ডুপ্লিকেট চাবি! তালাবন্ধ ট্রাঙ্ক থেকে এ চাবি কী করে বাইরে গেল ভেবে পাচ্ছিলাম না। তখন মনে হলো গিরীন্দ্র আমাদের ঘরে থেকে সকাল-সন্ধ্যা রান্নাবান্নাও করে। ট্রাঙ্ক খোলা অবস্থায় একদিন চাবি হয়তো সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমি তার প্রতি আরও খড়গহস্ত হয়ে উঠলাম।

সামান্য টাকার বিনিময়ে অবিশ্বস্ত কর্মী কীভাবে বুকে থেকে পেটে ছুরি মারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল। আমি চিন্ময়কে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'অচিরেই এর যোগ্য শাস্তি পাবে গিরীন্দ্র। আর তুমি যে সততার পরিচয় দিলে— আজীবন আমি তা স্মরণে রাখব। ছেলেটি পরে আমাকে প্রণাম করে চলে যায়। যাবার আগে বলে যায়, গত ১২ই ডিসেম্বর গিরীন্দ্র মামাকে সন্ধ্যায় বাড়ি না পেয়ে আমি আপনাদের স্কুলে চলে যাই। ১৩ই ডিসেম্বর আমাদের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠান ছিল। ছুটির দিন বলে মামা আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ করতে পারবে কিনা—জানতে গিয়েছিলাম। আমি বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি গিরীন্দ্র মামা আর হরিনাথ এক বাণ্ডিল কাগজ খুলে কী যেন করলেন। আমি ডাক দিতেই হরিনাথ ঝট্‌পট্ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর মামা ড্রয়ারের তালা বন্ধ করতে লাগল। চাবিটি তালাবন্ধ করে টেবিলে রেখে দেয়, আর আমাকে কিছু না বলেই হরিনাথের সঙ্গে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আলাপ করতে ছুটে যায়। ইত্যবসরে আমি চাবিটি পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। ঘরে ফিরে এসে চাবি না পেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে গিরীন্দ্র মামা। আমার কাছে জানতে চাইলে—আমি চাবির খবর জানি না বলে জানিয়ে দেই। সে বিদায় হলে বুঝতে পারলাম ছেলেটি এই গোপন খবর দিতে পেরে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সেদিন মনে হয়েছিল সব ছেলেমেয়ে যদি চিন্ময় এর মতো সত্যবাদী হতো শিক্ষাঙ্গণগুলো

হয়ে উঠতো এক একটি পীঠস্থান।

পরদিন স্কুলে গিয়েই স্টাফ কাউন্সিল এর সভায় হরিনাথকে স্কুল থেকে বহিষ্কারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেই।

৩১শে ডিসেম্বর ফল ঘোষণার সময় জয়কিশোরকে প্রথম এবং অপর দুই ছাত্রকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী বলে ডিক্ল্যারেশন দেই। তারপর নবম শ্রেণিতে প্রমোশন প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মেরিট অনুসারে নাম ঘোষণা করে পরবর্তী শ্রেণিতে চলে যাই। প্রমোশন লিস্টে হরিনাথের নাম অনুল্লিখিত থাকে।

সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের করণিক সুরেশ দত্তকে নিয়ে হরিনাথ আমার বাসায় আসে। এসেই আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। বলে, 'আমি জীবনে আর এই কাজ করব না, আমাকে ক্ষমা করেন, স্যার।'

আমি বললাম, 'তোমার কাজ ক্ষমার অযোগ্য, আমাকে বিরক্ত না করলেই খুশি হব।'

সুরেশ দত্ত ঘটনার আগাগোড়া কিছুই জানেন না। তিনি বললেন, 'হরিনাথের বিরুদ্ধে কোন নোটিশ তো জারি হয়নি, স্যার অপরাধ কী করে প্রমাণিত হবে?'

আমি বললাম, 'এটা আপনার চিন্তার বিষয় নয়।' সুরেশ দত্ত থমকে যান। তারপর আমি বলি, পরীক্ষার হলে অসদ্ উপায় অবলম্বন করলে ছাত্রের বিরুদ্ধে নোটিশ জারির প্রথা রয়েছে। কিন্তু কোন জালিয়াতকে শাস্তি দিতে গেলে অন্য উপায় গ্রহণ করতে হয়।'

সুরেশ দত্ত তখন ঝিম মেরে থাকেন। আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'আপনাদের আর কিছু বলার আছে?'

বেগতিক অবস্থা দেখে সুরেশ দত্ত তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। তখন রাত দশটা পনেরো।

তিন দিন পর হরিনাথ স্কুলে এসে পাশ সার্টিফিকেট পাবার আবেদন জানায়। আমি তাকে এক সপ্তাহ পর স্কুলে আসতে বলি। সপ্তাহ খানেক পর স্কুলে এসে পাশ সার্টিফিকেট চাইলে আমি তাকে বললাম, 'আমার শর্ত মেনে নিলেই তোমাকে টি-সি দেয়া হবে। পাশ সার্টিফিকেট দেয়া সম্ভব নয়। তাতে তুমি বিগত বছর এই স্কুলে পড়াশোনা করেছো—শুধু এ কথাই উল্লেখ থাকবে। অন্য বাড়তি কথা একটিও থাকবেনা। রাজি থাকলে টি-সি দিয়ে দিতে পারি।'

সে আমার কথায় রাজি হয়। আমি তার নামে টি-সি-তে সই করি। সে টি-সি নিয়ে চলে যাবার সময় বলি, 'তোমার জীবন নষ্ট করার ইচ্ছা আমার নেই। অন্য স্কুলে গিয়ে তুমি উন্নতি কর এটাই আমাদের ইচ্ছা। ভবিষ্যতে তোমার ক্ষতির চিন্তা কোন দিনই আমরা করব না।'

পরে লোকমুখে শুনলাম সে রানিরবাজার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

যত বড় অপরাধীই হোক—একটা ছাত্রকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। অপরাধের মাত্রাটা অনুভবের জন্যই তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই স্কুলে থাকলে তার ছোঁয়াচে রোগে অন্যান্য ছাত্রও আক্রান্ত হতে পারে—এটাই ছিল আমাদের ভয়।

সুরেশ দত্তের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হলে একদিন হরিনাথের অপরাধ সম্পর্কে আমি পুরো ঘটনা তাকে বুঝিয়ে বলি। সুরেশ দত্ত এতোদিন তার সম্পর্কে অন্ধকারেই ছিলেন। তিনি সব শুনে

থ খেয়ে যান। আর বলেন, পড়াশোনায় এতো ভালো ছেলে কী করে এতো বড় দুর্নীতি করতে পারে তিনি ভেবে পাচ্ছেন না!

এরপর যে দিন হরিনাথকে নিয়ে আমার বাসা থেকে রাত দশটায় বাড়ি রওয়ানা হন— সে দিনের ঘটনা তিনি আমাকে বলতে থাকেন।

সুরেশ দত্ত বলেন, তখন সাড়ে দশটা হবে, আমি হরিনাথকে নিয়ে তুইসিন্দ্রাই রওনা হই। এক-দু-পা এগিয়েই সে রাস্তায় বসে পড়ে। সারারাত তেলিয়ামুড়া আগরতলা রাস্তায় গাড়ি চলাচল করছে। গাড়ি আসতে দেখলেই দৌড়ে গিয়ে সে গাড়ির নিচে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাকে ধরে বসিয়ে রাখা আমার সাধ্যের অতীত ছিল। রাস্তায় কোন পরিচিত লোকও পাওয়া যায়নি। গাড়ি চলাচল বন্ধ হলেই তাকে ধরে ধরে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছি। চার পাঁচবার গাড়ির নিচে পড়ার চেষ্টা করেছে। দেড়মাইল রাস্তা চাঁদনী রাতে অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল সাত ঘণ্টা। সে দিন যে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি—সেটাই আমার সাত জনমের তপস্যার ফল।

আমিও খবরটা শুনে খুব বিব্রত বোধ করছি,—একথা সুরেশবাবুকে বললাম। আর বললাম, 'মানুষ জেদের বশে বিষ ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত্যু এসে যখন দ্বারে কড়া নাড়ে তখন কি আর বাঁচানো যায়? হরিনাথের ওপর বিন্দুমাত্র অমানবিক শাস্তি আরোপ করা হয়নি। এখন থেকে সদ্‌ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করলেই তার নিজের এবং সমাজের কল্যাণ।

এর কিছুকাল পরেই হরিনাথের সহযোগী পিয়ন গিরীন্দ্র রায় তেলিয়ামুড়া বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কালু মজুমদারের দোকানে রাত দশটায় চুরি করতে ঢোকে। কালুবাবু দোকানেই ঘুমান, একথা গিরীন্দ্র জানতো না। রাত এগারটায় দোকানে এসে কালুবাবু গিরীন্দ্রকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। খবর যায় ম্যানেজিং কমিটিতে, শিক্ষক প্রতিনিধি আশুতোষ দাসের কাছে। তিনি তাকে থানাতে সমর্পণ না করে সব ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্ত করে আনেন।

যার স্ত্রী-সন্তানের চিন্তা করে আমি তার প্রাপ্য শাস্তি এতো দিন ঝুলিয়ে রেখেছিলাম—ম্যানেজিং কমিটি এক কলমের খোঁচায় তাকে ছাঁটাই করে দিল।

পরিস্থিতি বার বার অপরাধীকে ক্ষমা করে না।

প্রহ্লাদ দাস

অবাক দৃশ্য

খেয়াল?

হ্যাঁ খেয়ালই বটে। কৌতূহলও বলা যায়। এখনই যেতে হবে কলেজ হোস্টেলে, যেখানে বন্ধুবর সমীর থাকে। তাছাড়া রাতও অনেক বেজে গেছে, ১২টা ৩৫ মিনিট। সমীর কি এখনও জেগে আছে? হয়তো বা জেগে নেই। তবুও যেতে হবে। দেখতে হবে সে এখন কী করছে।

বেড়ার ঘরের দরজাটা খুলেই বিষ্ণু বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে নামতেই বিষ্ণুর শরীরটায় একটু কাঁপুনি ধরলো শীতে। তবুও যেতে হবে, যাবই, ভীষণ শীত লাগছে যে! একটু এগোতেই খোলা আকাশের নিচে আসতেই আরও শীত লাগলো। ওরে বাবা! শীত তো মন্দ নয়! ঠিক আছে, কান ঘুরে চাদর মুড়ি দিয়ে যেতে লাগলাম। এই সেরেছে, শীতে গায়ে কাঁটা কাঁটা দিয়ে উঠছে। রাস্তা একেবারে জনশূন্য। কিছুই ত দেখা যাচ্ছে না! এত কুয়াশা যে একটু দূরেই কিছু দেখা যাচ্ছে না। না, ওই তো লাইট পোস্টের তলায় আবছা আলোয় একটি কুকুরকে দেখতে পাচ্ছি। ব্যাটা একেবারে আড়াই প্যাঁচ হয়ে শুয়ে আছে। আড়াই প্যাঁচে বিড়া পাকিয়ে শোবেনা? পৌষের শীতের তীব্রতা কী কম? হাড়মাস শুদ্ধ জ্বালা করে ওঠে।

কলেজ হোস্টেলে গিয়ে দেখা গেল, হোস্টেল একদম নিস্তব্ধ। শুধু প্রতি রুমের ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরের আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যায়। একবার ভাবি ফিরে যাই। আবার ভাবি এতদূর এসেছি যখন দেখেই যাই, সমীরটা কী করছে। সমীরের দরজায় নক করলাম, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কোন শব্দ নেই। আবার দরজায় আঙুলের পৃষ্ঠভাগ দিয়ে শব্দ করতে লাগলাম। ঘুম জড়ানো গলায় শব্দ হলো, কে-এ-এ-এ? এত রাত্রিতে আবার কে এল?

আমি বাইরে থেকে বললাম, সমীর আমি, আমি বিষ্ণু। এবার হোস্টেলের রুমের দরজাটা খুলে গেল। দরজা খোলার মধ্যে যেন কেমন একটা বিরক্তি ভাব। দরজা খুলে আমাকে দেখতে পেয়েই সমীর আমাকে বলল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোক। এবং আমাকে টান মেরে ভিতরে ঢুকিয়ে আবার বলল, বাইরের ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকবে, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে যা।

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কেমন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। গায়ে বেশ গরম গরম বোধ করলাম। একে ত দালান, তদুপরি দরজা জানালা বন্ধ। একটু লক্ষ্য করে দেখলাম, ঘরের ঘুলঘুলিগুলিও ভারি মলাট দিয়ে একেবারে ঢাকা। আমি ত চেয়ারটায় আরাম করেই বসলাম। কিন্তু বন্ধু আমার কাছে হার মানতে নারাজ। তাই বিছানায় পুরো জাঁদরেল তোষকের ওপর লেপমুড়ি দিয়ে এমনভাবে বসল যে আমি আর কী বলবো! ওর নয়ন যুগল ছাড়া আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হলোনা! থাকগে সে কথা। হাজার হলেও তো সে ধনীর দুলাল।

বন্ধুবর লেপের ভিতর মুখ রেখেই বললে, আচ্ছা বলতো বিষ্ণু, কী তীব্র শীত! কী ভয়ানক শীত! ক' বছরের মধ্যে তো এমন শীত পড়েনি। হাত, পা মায় শরীরেও বেশ কাঁপুনি ধরছে। বোঝা গেল, লেপের ভেতরে থেকেও ওর দাঁতে দাঁতে লেগে কাঁপুনির শব্দ হচ্ছে। আর বলছে, জানিস এত শীত আমার হাত পর্যন্ত বের করতে ইচ্ছে করছে না। মুখটা পর্যন্ত বের করা মুশকিল। তুই না এলে তো চক্ষুদ্বয় পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে থাকতাম। তোর আসার আগে যেমন ছিলাম।

আমি কিন্তু সমীরের ঘরে বসে বেশ আরামই বোধ করছি। আমার বাঁশের বেড়ার ঘরের মত নয় তো।

যাই হোক, বন্ধুর কথা শুনছি এবং কথায় কথায় যোগানও দিচ্ছি।

অনেক রাত্র হয়ে গেছে বলে বন্ধুকে আর যন্ত্রণা করলাম না। শীতের প্রকোপে রাস্তাঘাটও জনশূন্য। নিজের ভাড়াটে বাড়ির উদ্দেশে আবার রাস্তায় নামলাম।

বাড়ি আসার পথে আর এক দৃশ্য দেখলাম। যা দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। তবুও তো দেখলাম।

মুক্ত আকাশ শীতের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তারই নিচে কত কিছু রয়েছে, ঘটছে, দেখা যাচ্ছে। তার কতটুকু আমরা খবর রাখি? ওই দিকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফুটপাথের এক পাশে সরকারি বৈদ্যুতিক লাইট পোস্টগুলি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাও আবার ঘন কুয়াশার জন্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তার নিচে কী আছে দূর থেকে তাও স্পষ্ট নয়। তবে ওই দিকে রাস্তার মোড়ে ঘরের খোলা বারান্দার প্রহরী লাইট পোস্টের ক্ষীণ আলোয় কী যেন দেখা যাচ্ছে। ধ্যাত, ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। এত কুয়াশা পড়ছে! একটু এগুতেই এবার দেখা যাচ্ছে দুটা জীব। তবে পশু নয়, মানুষ! যে সকল আঙ্গিক লক্ষণ নিয়ে আমরা মানুষ বলে দাবি করি। ওদের মধ্যেও তার কিছুরই অভাব ছিলনা। শুধু ওদের অভাব ছিল পৌষের শীতের প্রকোপ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে রক্ষা করার বস্ত্রের।

মনে হচ্ছে ওরা গভীর নিদ্রায়ই নিদ্রিত। বেশ আরামেই ঘুমিয়েছে বলে মনে হয়। মাথার নিচে সযত্নে রক্ষিত একটা ভাঙা ইটের আধখানা। আর গায়ে কতদিনের ময়লা শতছিন্ন বস্ত্রে কত চেষ্টা করেই না লজ্জা নিবারণ করছে। তারই এক হাতের বাহুতে ছোট একটি ছেলের মাথা এবং ছেলেটার গায়ে মায়েরই ছিন্ন আঁচলের কিছু অংশ। আরে, ছোট ছেলেটা আবার এদিক ওদিক পাশ ফিরছে কেন? ও বোধ হয় মা-এর দুধ খাবে, না-না-না দুধ খাবে না। ওর মাকে নিদ্রা জড়িত কণ্ঠেই ডাকছে, মা, ওমা, মাগো? অনেকক্ষণ ডাকলো ছেলেটা। মা কোন সাড়া দিল না, বোধ হয় ঘুমটা গাঢ় হয়ে লেগেছে। এবার ছোট ছেলেটা কেঁদেই ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই আবার ডাকলো, মা, ওমা, মাগো, শুনছো?

এবার মহিলাটি জাগলো। কিন্তু নিদ্রাজড়িত কণ্ঠেই বলল, কীরে, কী অইছেরে, বাবা?

—মাগো বেশি কইরা শীত করতাছে!

মা এর জবাব কী দেবে ভেবেও পায় না, খুঁজেও পায় না। শেষপর্যন্ত একটি জবাবই বুঝি খুঁজে পেল এবং বল্‌ল, বাবা আমরার শীত করন নাই। আমরা যে ভিখিরি!

আয়না

অতুল, এই অতুল, আমার একটা জায়গা রাখিস।

— আচ্ছা-আ। প্রণব, তুই তাড়াতাড়ি উঠে আয়।

— আরে লোকের ধাক্কাধাক্কিতে ত উঠতেই পারছি না!

— জোর করে ওঠ।

—আমার সামনে কয়েকজন মহিলা রয়েছেন, ওদেরকে রক্ষা করতেই ত পিছনের লোকের ধাক্কা খাচ্ছি।

—আরে, নিজে বাঁচলে বাপের নাম!

—তা হয় নারে। অমি তা পারি না। ওরাও তো যাবেন, শুধু যাবেনই নয় ওদেরকেও যেতে হবে। ধাক্কাধাক্কির হাত থেকে ওদেরকে রক্ষা করা আমার মর‍্যাল ডিউটি।

— তবে তোর মর‍্যাল ডিউটি নিয়েই তুই থাক্।

যাক্ শেষপর্যন্ত প্রণব বাসে উঠলো। বাসে একদম জায়গা নেই। বাসটা কানায় কানায় পূর্ণ। পেছনের দিকে প্রণব একটা বসার সিট পেল। অতুল প্রণবকে ডেকে বলছে, প্রণব, বসার সিট পেয়েছিস্?

—হ্যাঁ, পেয়েছি। পেছনের চাকার ওপরে যে সিটটা থাকে, সেখানে বসার সিট পেয়েছি।

—যাক, আমিও একটা বসার সিট পেয়েছি। তোর জন্য সিট রাখতে পারলাম না রে। আমি দুঃখিত!

—কিচ্ছু হবে না, আমি ত বসেছি-ই।

বাস কন্ডাক্টর বলছেন, দাদারা যারা বাসে দাঁড়িয়ে আছেন দয়া করে নেমে যান, দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জার নিয়ে বাস চললে ট্রাফিক পুলিশ ধরে, জরিমানা দিতে হয়। কন্ডাক্টরের কথা শুনে দাঁড়ানো প্যাসেঞ্জার সবাই বাস থেকে নেমে গেল। বাস ছাড়লো।

বাস মোটরস্ট্যাণ্ড থেকে ছাড়লো। শহর ছেড়ে লম্বা রাস্তায় নামলো। বাস বেশ দ্রুত গতিতেই চললো। দু'দিকে শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। প্রণব জানালা দিয়ে মাথাটা একটু বের করে প্রকৃতির হাওয়া মাথায় লাগাতে বেশ আরাম পেল। এতক্ষণ ধাক্কাধাক্কিতে যে পরিশ্রম হয়েছে তা সম্পূর্ণ লাঘব হয়েছে। এবার মাথাটা বাসের ভিতরে নিয়ে এসে একটু নড়ে চড়ে আরাম করে বসলো। বাসের চারিদিকে চোখটা একটু ঘুরালো। বাসে ড্রাইভারের মাথার ওপরে ক্যাবিনের পেছনে ক্যাবিনের বাইরে এবং প্যাসেঞ্জার বসার কোঠার সামনের দিকে একটি নাতিদীর্ঘ আয়না রাখা থাকে। প্রণবের চোখটা হঠাৎ সেই আয়নার ওপর পড়লো। প্রণব যেখানে বসা ছিল, সেখান থেকে কৌণিক দূরত্বে ক্যাবিনের উল্টো দিকে রক্ষিত আয়নায় ভরা যৌবনা একজন যুবতীর চেহারা দেখতে পেল। যুবতীটি বাসে ওঠার সময় বোধ হয় প্যাসেঞ্জারের ঘিঞ্জিতে তার মাথার অগোছালো এলোমেলো চুলগুলি গোছাচ্ছিল, তাই প্রণব মেয়েটির মুখটি ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। তবুও প্রণব আয়নাতে মেয়েটিকে ভাল করে দেখার জন্য চেয়ে রইল।

বাসের চারিদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ বাসের সেই আয়নায় মেয়েটির চোখ পড়লো। দেখলো, ছেলেটি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। তা দেখেই মেয়েটি তার নিজের শরীরের বেআব্রু জায়গাগুলি শাড়ির আঁচল দিয়ে ভাল করে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। প্রণব মেয়েটির সমস্ত কাণ্ড কারখানাই ঐ আয়নার মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল। প্রণব পলকহীন দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল।

মেয়েটি অনেকটা লজ্জায় আয়না থেকে তার চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি ছেলেটিকে

পরখ করার জন্য আবার আয়নায় চোখ রাখলো। দেখলো, ছেলেটি ঠিকই মেয়েটির দিকেই চেয়ে রয়েছে। এবং মেয়েটি আরও লজ্জায় পড়ে গেল। অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ওকি মেয়েলোক কোন দিনও দেখে নাই নাকি?

প্রণব ভাবছে, "মেয়েটা আমার তাকানো দেখে নিশ্চয়ই লজ্জা পেয়ে গেছে। তা তার নড়নচড়ন দেখেই বোঝা যাচ্ছে"।

মেয়েটি আবারও যখন ঐ আয়নায় তাকালো, দেখলো, ছেলেটি তার দিকেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তাই মেয়েটি মনে মনেই নয় শুধু নিজে নিজে গজগজ করে বলছে, আশ্চর্য লোক তো, ভদ্রলোকের বাড়িতে মা-বোন নেই নাকি যে, এমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে?

এবার মেয়েটির মুখের ঠোঁট নাড়ানো দেখে প্রণব তার দৃষ্টি অন্যদিকে সরালো। এবং মনে মনে ভাবতে লাগলো, মেয়েটা বেশ দেখতে, কার সাথে যেন হুবহু মিল রয়েছে। হঠাৎ মিল খুঁজে পেল এবং আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়েই রইল। মেয়েটিও অন্যদিকে তার দৃষ্টি ফেরাল। কিছুক্ষণ পর অজান্তেই সেই আয়নায় মেয়েটির চোখ পড়ল। দেখা গেল আবারও ছেলেটি তার দিকেই পলকহীন ভাবে চেয়ে রয়েছে। এবার মেয়েটি রেগে গেল। নিজে নিজে ছেলেটিকে অস্পষ্ট স্বরে বকতে লাগলো ছিঃ, নির্লজ্জের মত কী ভাবে এখনও চেয়ে রয়েছে! বেহায়া কোথাকার! জন্মেও বোধ হয় মেয়েছেলে দেখে নি, এমন অসভ্য!"

আয়নায় মেয়েটির ঠোঁট নাড়ানো দেখেই প্রণব এবার বুঝতে পেরেছে, মেয়েটি নিশ্চয়ই তাকে বকাবকি করছে। আবার ভাবছে মেয়েটিকে ওর এত আপন মনে হচ্ছে কেন? দেখা যাক্ সে কোথায় নামে। যেখানেই সে নামুক ওকেও নামতে হবে সেখানে এবং তার বাড়িটি চিনে আসতে হবে। এই কথা ভাবতে ভাবতে প্রণব তার নিজের গন্তব্য স্থানের বাস স্টপেজ কখন পেরিয়ে গেছে তার খেয়াল নেই!

মেয়েটি ছেলেটির এভাবে তার দিকে তাকানো দেখে ভাবছে, বাসে কী আর অন্য কোন মেয়ে নেই? এভাবে আমার পেছনে লেগেছে কেন? ছেলেটি নামবে কোথায়? নেমে গেলেই তো নিশ্চিন্তে বসতে পারি। বাব্বা, চেয়ে রয়েছে তো চেয়েই রয়েছে! এতটুকুও চোখের পলক পড়ে না। তার কোন কু-মতলব আছে কি না কে জানে? কিন্তু চোখের ভাব দেখে তো তেমন মনে হয় না? ধ্যাৎ, কী ছাইপাশ ভাবছি।

একসময় মেয়েটি গন্তব্য স্থানে আসতেই বাস থেকে নামার জন্য উঠে দাঁড়ালো এবং বাসের সামনের দরজা দিয়ে নামলো। বাস থেকে নেমে একবার পেছন ফিরে তাকালো। নাঃ, নামে নি, বাঁচা গেল। আমার পেছনে লাগে নি, হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম! মেয়েটি তখন নিঃসঙ্কোচে তার বাড়ির উদ্দেশে চলতে লাগলো। অন্যান্য লোকও ছিল রাস্তায়।

বাস কন্ডাক্টর বাস ছাড়ার সংকেত জানানো মাত্রই প্রণবের মনে হলো এবং চেয়ে দেখলো, মেয়েটি তো বাস থেকে নেমে গেছে! তাই প্রণব বাসকন্ডাক্টরকে ডেকে বলল, ও দাদা, বাস থামান্। আমি নামবো। বাস-কন্ডাক্টর প্রণবকে ঝাঁজালো কণ্ঠে বললো, এতক্ষণ কী করছিলেন? কন্ডাক্টর বাস থামালো এবং ধমকের সুরেই বলল, নামুন মশাই, নামুন।

প্রণব বাস থেকে নামলো এবং রাস্তার এদিক ওদিক তাকালো। কিন্তু কোথায়ও মেয়েটিকে

দেখা গেল না। মেয়েটিকে না দেখে প্রণবের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল এবং অজান্তেই বলে ফেলল, পেয়েও হারালাম! কিছুদূর তাকাতেই প্রণব দেখলো মেয়েটি যাচ্ছে। ওর মনটা আবার খুশিতে ভরে গেল, নাঃ হারাই নি, ঐ তো মেয়েটি যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। সে হন্‌হন্‌ করে মেয়েটিকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল।

মেয়েটি বাড়ি যাওয়ার পথে যেতে যেতে দেখলে রাস্তায় যারা ছিল সকলেই আস্তে আস্তে যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। এবার রাস্তা একেবারে জনশূন্য। তাই এদিক সেদিক তাকিয়ে পেছনের দিকে তাকালো, দেখলো, বাসের সেই লোকটি তার পেছনে পেছনে দ্রুত তার দিকেই আসছে! ভীষণ বিরক্ত হয়ে মেয়েটি ভাবছে, ঈস্ কী জ্বালায় পড়লাম রে বাবা! বাসে ছেলেটির চোখের ভাব দেখে ত মনে হয়েছিল ছেলেটি ভালই, এবার দেখছি ব্যাটা খুবই খারাপ! নতুবা আমার পেছনে পেছনে আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করছে কেন? যতসব আজেবাজে বদমায়েশ! বখাটে লোক! ছিঃ মেয়ে ছেলে দেখলেই জিবে জল এসে যায়! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। আমার পেছনে লাগা বের করছি। এবার ত আমার পাড়ায়ই এসে পড়েছি। সব্বাইকে ডেকে এমন পিটুনি খাওয়াব যে মেয়ের পেছনে ঘুরঘুর করে চলা জন্মের মত ভুলে যাবে। এই বলে বুকে সাহস নিয়ে পেছন ফিরে রুখে দাঁড়াল। এখন রাস্তায় লোক নেই বলে কী হবে? লোক ডাকতে আর কতক্ষণ?

প্রণব দেখলো মেয়েটি রণচণ্ডীর মূর্তি ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালো। তাই ভাবলো, এই রে! কী থেকে কী বলে ফেলে! আবার ভাবছে, এ পাড়ায় আমি কোন দিনও আসিনি আব কেউ আমাকে চেনেও না। কোন অঘটন না জানি ঘটে যায়। তাতে কী হয়েছে একটি মেয়ের সাথে একটি ছেলে কী কথা বলতে পারে না? এই সব চিন্তা করতে করতে যেই মাত্র মেয়েটির খুব কাছাকাছি চলে গেছে। মেয়েটি রণমূর্তি ত আগেই ধরা ছিল; এবার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুখ ভ্যাংচিয়ে চোখ বড় করে বলল, এই মশাই, আমার পেছনে লেগেছেন কেন? আপনাব ঘরে কী আপনার মা বোন নেই? আমার মধ্যে কী দেখেছেন? অ্যাঃ, কী ফাজিল লোকবে বাবা!

— তোমার মধ্যে আমি অনেক কিছু দেখেছি, আর আমার অনেক কিছুই তোমার মধ্যে পাওয়ার আছে।

— কী বললে? দুষ্ট, নষ্ট বদমায়েশ ছেলে? বলেই মেয়েটি দুঃখে ও রাগে কাঁপছিল এবং আবার বলছিল, আমার মধ্যে তোর অনেক কিছুই পাওয়ার আছে তো? তা দেখাচ্ছি এক্ষণি, দাঁড়া, বলে ডান হাত তুলে ছেলেটির গালে যেই মাত্র চড় মারতে গেল, অমনি প্রণব মেয়েটির হাতটি চেপে ধরে অনেকটা কাঁদো কাঁদো স্বরেই বলল, ঘরে মা আছেন, বোন নেই, বোনও ছিল। কিন্তু বোনটি বছর দু-এক আগে মারা গেছে। সেই বোনের সব কিছুই বোন তোমার মধ্যে আমার পাওয়ার আছে। বোনটি ছিল অবিকল তোমারই মত।

মেয়েটির রাগ হঠাৎ থেমে ঝরে গেল। হাতটি আব ছাড়ালো না। শুধু শান্ত স্নিগ্ধ গলায় বলল, কাকে কী বললাম? এ কী করলাম আমি? তুমি আমার দাদা! মেয়েটি কেঁদেই ফেলল এবং বলল, জান দাদা আমারও দাদা নেই!

মিথ্যের বাহাদুরি

—তুই কিছু ভাবিস না। আমি সব ঠিক করে দেব।

ধর্মনগর থেকে এসে আগরতলার এই অফিসে প্রথমই প্রতীক কমলেশকে খুব কাছে পেয়েছে, কমলেশই প্রতীককে খুব আপন করে নিয়েছে। তাই ওরা দুজনে পরস্পরের কাছে আপনি থেকে তুই সম্বোধনে এসে গেছে। প্রতীক যে শহরের কোথাও ঘরভাড়া পাচ্ছে না, একদিন কথায় কথায় কমলেশকে প্রতীক বলল। শুনে কমলেশ বলল, ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কমলেশের—সব ঠিক হয়ে যাবে, কথাটা শুনে প্রতীকের মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠলো, এবং বলল, তুই সত্যি সত্যিই ঘর ভাড়া ঠিক করে দিবি? পরক্ষণেই বাদলা দিনের মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে যাওয়ার মতই হাসিটা আবার মিলিয়ে গেল।

আরে কমলেশ, আমি যে ব্যাচেলার। আমাকে ঘরভাড়া কে দেবে? তাই তো ঘর পেয়েও হারিয়েছি অনেক বার!

কমলেশ কী যেন চিন্তা করলো কতক্ষণ। প্রতীক ওর মুখের দিকে চেয়ে আরও ভাবনায় পড়ে গেল। হঠাৎ উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লো কমলেশ। হয়েছে রে বন্ধু, হয়েছে!

—আরে কী হয়েছে? আমাকে বলবি তো? আমার তো তোর ব্যাপার-স্যাপার কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

— বন্ধু কমলেশ পাল যা ভাবে সেটা করেই দেখায়।

— কী দেখাবি? কেমন করে দেখাবি, কিছুই তো বুঝতে পারছিনা!

— সব বুঝতে পারবি, স-ব বু-ঝ-তে পারবি, কয়েকবার ঘর পেয়েও তো হারিয়েছিস্? এবার আর হারাবে না, দেখিস।

—কী ভাবে তা সম্ভব?

—শুধু এ স্মল ওয়ার্ড।

— সেই ওয়ার্ডটি কী আমি জানতে পারি কি?

— হ্যাঁ, জানতে পারিস্। তবে কাছে আয়। বলে প্রতীকের কানে কানে একটি কথা বললো।

—কিন্তু?

—আর কোন কিন্তু-টিন্তুই তোর মুখ থেকে শুনতে চাই না। ভাড়াটে ঘর ঠিক করতে আমাদের পাড়ায়ই তুই আমার সাথে যাবি এবং আমি যা যা বলবো তাতেই তুই রাজি হয়ে যাবি। প্রয়োজনে শুধু 'হ্যাঁ' ও 'না' এই শব্দ দুটি বলে যাবি।

—ঠিক আছে। তাই হবে।

পরদিন ছিল রোববার। বিকেলে প্রতীক কমলেশের বাড়ি এলো। বৈকালিক চা পান করে দু'জনেই ভাড়াটে ঘর খোঁজায় বেরিয়ে পড়লো।

বেশ কয়েকটা বাড়িই দেখলো। কিন্তু ঘর পছন্দ হলে বাড়ির পরিবেশ পছন্দ হয়না আবার পরিবেশ পছন্দ হলে ঘর পছন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত একটা বাড়িতে ওরা গেল। বাড়িটি পাড়ায় নতুন

বসতি। কমলেশ বলল, এ বাড়িটি আমাদের পাড়ায় নতুন বসতি, ভালই হবে। ওরা ঘর দেখল। মোটামুটি দুজনেরই পছন্দ হল।

তারপর। কমলেশের কথামত প্রতীক ভাড়াটে বাড়িতে উঠলো। এখন প্রতীকের চোখে মুখে কোন ভাবনা চিন্তার রেখা নেই। কাজে রীতিমত উৎসাহ বেড়েছে। সাহেবও নাকি তার কাজের জন্য সুখ্যাতি করেন।

কমলেশ ছুটি কাটিয়ে আসার পর, একদিন অফিসের টিফিনের সময় হয়েছে। সকলেই টিফিন করতে ক্যানটিন গেছেন। প্রতীক কিন্তু তখনও কাজ করেই চলছে। কমলেশ হাসতে হাসতে প্রতীকের টেবিলের কাছে গিয়ে আস্তে বলল, কিরে এখনও কাজ করছিস্? টিফিনে যাবি না? চল্।

—আরে কখন অফিসে এলি? আজকে তোকে খুঁজছিলাম।

—আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। আজই জয়েন করেছি। চল্ টিফিন করতে করতেই শোনা যাবে, কিভাবে ভাড়াটে বাড়িতে ঢুকলি।

—চল।

কমলেশ টিফিন করতে করতেই আবার বলল, হ্যাঁরে, আমি যে ভাবে বলেছিলাম সেভাবেই তো বলেছিলি? বলতে পেরেছিলি তো?

—আলবৎ বলেছি। তা না হলে কি আর ভাড়াটে বাড়িতে ঢোকা যেত?

—এ না হলে কী আব চলে, বন্ধু। যখন যেমন তখন তেমন ভাবেই চলতে হয়। বুঝলি?

—হ্যাঁ বুঝলাম।

—এবার বল কেমন করে তা সম্ভব হলো? আর ভদ্রমহিলা তোকে কী কী জিজ্ঞাসা করল?

প্রতীক চা এর কাপে চুমুক দিয়ে বলল, আমি প্রথমই ঐ ভদ্রমহিলাকে মাসিমা ডেকে ফেললাম। বলেই দুজনে হাসিতে ফেটে পড়লো। তারপর আবার কমলেশ বলল, তারপর?

—তারপর ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা বিয়েথা করেছো? আমি চোখ মুখ বন্ধ করে তোর কথা স্মরণ করে ঠাস্ করে বলে ফেললাম, হ্যাঁ মাসিমা, আমি বিয়ে করেছি, কয়েক মাস হলো।

আবার দু'জনে হাসিতে ফেটে পড়লো। মাসিমা আবার বললেন কে কে আছেন তোমার?

—সবাই আছে, ভাই-বোন, মা-বাবা এবং আমার স্ত্রী, সকলেই আছেন।

— বৌমাকে আনলে না কেন?

—মাসিমা, নতুন চাকরি পেয়েছি তো? তাছাড়া জায়গাটাও আমার কাছে একেবারে নতুন। আগে নিজে ঘরে ঠিকঠাক হয়ে বসি, তারপর বৌকে নিয়ে আসবো। তাছাড়া আপনার বৌমার সপ্তাহখানেক আগে টাইফয়েড হয়েছিল। তাই শরীরটা একটু দুর্বল। একটু শরীরটা সুস্থ হলেই নিয়ে আসবো।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বেটাছেলেদের হাত পুড়ে ভাত রেঁধে কি আর চলে বাছা?

প্রতীক চায়ের কাপে আবার শেষ চুমুক দিয়েই বললো, বুঝলে কমলেশ, মিথ্যেটাকে সত্যি করেই ঘুছিয়ে বলেছিলাম আর কি!

দু'জনে এবার পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চল এবার ওঠা যাক।

দু'মাস যেতে না যেতেই কমলেশ বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেল। কমলেশ নেই বলে তার কাছে আর ভালো লাগছে না, কারণ কমলেশের মত অন্যান্যরা প্রতীককে তেমন আপন ও কাছের লোক হিসাবে নিতে পারছেন না। তবে প্রতীক সকলের সাথেই বন্ধুত্বের ভাব রেখেই চলেছে।

কমলেশ এই অফিস থেকে চলে গেছে প্রায় দু'বছর হয়ে গেছে। কমলেশ বাড়িতে আসলেই প্রতীকের কাছে চলে আসে। দুজনে বসে কত রকমারি গল্প করে। এছাড়া দুজনের মধ্যে সেল ফোনের কথাবার্তা ত হয়ই।

প্রতীক অফিসের কাজে ফাঁকি দিতে চায়না। যতক্ষণ পারে কাজই করে যায়। তাই তার পদোন্নতিও হয়ে চলছে। তবে বাড়িওয়ালি মাসিমার সাথে ফাঁকি না দিয়ে তার কোন উপায় নেই। তাই মাসিমা প্রায় দু'বছর পর প্রতীককে বললেন, কী হে বাপু প্রতীক, তুমি না বলেছিলে বৌমার অসুখ সারলেই এখানে নিয়ে আসবে? সে তো প্রায় দু'বছর হয়ে গেল। বৌমা কী এখনও অসুস্থ?

প্রতীক মাসিমার কথায় যেন হকচকিয়ে গেল! তাই সে অপ্রস্তুত হয়েই আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ মাসিমা সে অসুস্থই। তবে আপনাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছি।

—আরে, কী অসুখ করেছে বল না? আহা রে, বেচারা সংসারে ঢুকতে না ঢুকতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে!

—আজ্ঞে মাসিমা, এ অসুখ যে অসুখ নয়।

—তবে কী অসুখ বাপু?

—আজ্ঞে মানে, ইয়ে আর কী!

মাসীমা বুদ্ধিমতী। তাছাড়া বয়স্কা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্না। তাই বললেন, ও বুঝেছি, বৌমা পোয়াতি হয়েছে! মাসিমা এক গাল হাসি হেসেই বললেন, বেশ হয়েছে ভালই হয়েছে, এ না হলে কী আর সংসার বাড়ে বাপু?

প্রতীক অনেকটা বোকার মতই শুকনো হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ মাসিমা, ঠিক তাই। আর এ সময় নাকি মেয়েদের তার মায়ের বাড়িতে থাকাই শ্রেয়ঃ, আমার মা তাই বলেছেন। তাই মা বৌকে তার মায়ের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—খু-উ-ব ভাল করেছেন। বুদ্ধিমতীর কাজ করেছেন। ষাট্ ষাট্। বলেই আকাশের দিকে হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে বললেন, ঠাকুর, বৌমা যেন জিউস নাড়ী হয়।

ডাকে-খোঁজে আচার-আচরণে ও স্বভাব-চরিত্রে প্রতীক শুধু মাসিমাই নয়, বাড়ির সকলেরই মন কেড়ে নিয়েছে।

মাসিমার পরিবারের সকলেই মানে। ছোটরা শ্রদ্ধার চোখে এবং বড়রা স্নেহের চোখে দেখতেন। প্রতীকও নিজের বাড়ি ঘরের মতই অবাধে চলা ফেরা করতো। সে যেন ঐ পরিবারের একজন। সুখে দুঃখে, রোগ শোকে প্রতীকও তাদের পাশে থাকতো। তেমন প্রতীকের পাশে থাকতেন মাসিমার পরিবারের লোকেরাও। তাই প্রতীককে বড়রা তার নাম ধরেই ডাকতো।

আরও বছর খানেক কেটে গেল। এরই মধ্যে প্রতীক আর বাড়িতে আসা যাওয়া করল না। জিজ্ঞাসা করলেই শুধু বলতো অফিসে ভীষণ কাজের ভিড়, তাই আর বাড়িতে যাওয়া আসা করা সম্ভব হয় না। তায় আবার প্রতীকের চোখে মুখে বৌমা বাচ্চার জন্য কোন উদ্বেগের ছাপও দেখা

যাচ্ছে না। মাসিমার মনে সন্দেহ হলো। তাকে এত আপন করে নিয়েছে যে তাকে অন্যরকম কিছু বলতেও সাহস পাচ্ছেন না।

একদিন প্রতীককে জিজ্ঞসা করেই বসলেন, কি হে বাপু প্রতীক, তোমার ছেলে হয়েছে, না মেয়ে হয়েছে, একদিনও ত এই মাসিমাকে বললে না?

প্রতীক অনেকদিন থেকে এই আশঙ্কাই করছিল। কখন মাসিমা কী জিজ্ঞাসা করে ফেলে। মাসিমার কথা শুনে সে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো! মাটির দিকে মুখ করে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে পথের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমতা আমতা করে বলতে লাগলো, মাসিমা, ইয়ে মানে কী আর বলবো।

—বাছা, তোমাকে আর কিছুই বলতে হবে না। আমিই বলছি, আদপে তুমি বিয়েই করো নি!

এবার প্রতীক মাসিমাকে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শুধু এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। প্রতীকের দিকে মাসিমা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ফিক্ করে হেসে ফেললেন। প্রতীকও মাসিমার সাথে হেসে ফেলল এবং বলল, মানে বিয়ে করবো আর কি!

—তা হলে এতদিন ববাবর মিথ্যে কথাই বলে এসেছ মাসিমার সাথে?

—মাসিমা গো, যদি প্রথমদিনই এইটুকু 'মিথ্যে' না বলতাম, তবে কি আপনি আমাকে আপনার বাড়িতে ঢুকতে দিতেন?

বাছা, তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি?

জলি

আপনাদের এমন একটি পশুজগতের কথা বলবো যেটা আপনারা সকলেই জানেন এবং চেনেন্। জানি না কতটুকু গ্রহণ যোগ্য হবে তবুও বলবো। সে জগৎটা আমাদেরই সুললিত, সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত ও সুশোভন পার্থিব জগতেরই একটি অংশ। সেটা অনেকেই ভালবাসে, কেউ কেউ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, কেউ আবার ভয়ের চোখেও দেখে। কেউ দেখে ঘৃণার চোখে। এছাড়া আমাদেরই সুসভ্য মানব সমাজের প্রায় প্রতি পাড়ায়ই কিছু না কিছু অথবা দু-একটি হলেও বেওয়ারিস নেড়ি কুকুর কুকুরি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এদেবকে কিছু না করলে এরা কাউকে কিছু করে না। এরা বিনে পয়সায় রাত জেগে পাড়ায় পাড়ায় পাহারা দিয়ে চোর-ডাকাতের হাত থেকে পাড়া প্রতিবেশীদের রক্ষা করার চেষ্টা করে। ওদের কাছে তো আর ঢাল, তলোয়ার বা বর্তমান অত্যাধুনিক যুগের আগ্নেয়াস্ত্র নেই? আছে শুধু তাদের মুখে বসানো সূঁচালো দাঁত এবং গলায় আছে বিকট্ শব্দ। তা দিয়েই নিশি কুটুম্বদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে নয়। কখনও কখনও নিশি কুটুম্বদের হাতে তাদের প্রাণনাশও হয়ে যায়। তাতেও কোন গৃহস্বামী রাত্রিতে ঘুম ভাঙানোর দায়ে তাদেরকে ভীষণ ভাবে প্রহার করেন।

তবুও ওরা কিছু মনে করে না। কষ্ট পেয়েও সহজে সহ্য করে নেয়। কেন জানেনা? মানবকুল

সুষম এবং সুগন্ধযুক্ত খাদ্য খাওয়ার পর যা উচ্ছিষ্ট থাকে তা তো আস্তাকুঁড়েই ফেলে দেয়। আস্তাকুঁড় থেকেই খোঁজাখুঁজি করে সেই উচ্ছিষ্ট খেয়েই ওরা বেঁচে থাকে। কোন কোন প্রতিবেশী আবার নিজেদের খাবার থেকেই একটু আধটু রেখে দেয়, যা ওদেরকে ডেকে খেতেও দেয়। কারও কোন দিন আদর পেলে তার স্বীকৃতি দেয় এবং আমৃত্যু তা ভুলে না। কেউ কোন নাম ধরে ডাকলে তো আর কথা-ই নেই; লেজ নাড়িয়ে কু-উ-উ-উ শব্দ করে তাঁর কাছে যায়, যদি আরও একটু আদর পাওয়া যায়। কেন জানেন ওরা নাম ছাড়া বেওয়ারিসই নয় শুধু, ওরা অবহেলিত, ধিকৃত, নিগৃহীত ও ঘৃণিত নেড়ে কুকুর বলে।

পশু জগতেরই একটি জীব "জলি"। জলি আমাদেরই নাম দেয়া শঙ্কর জাতীয় এবং আমাদেরই প্রতিপালিত একটি কুকুরি।

জলি জার্মান (spitz) স্পিজ কুকুর ও খাঁটি দেশি নেড়ে কুকুরির শঙ্করায়নের কন্যা সন্তান। জলির বাবা জ্যাঁক ও মা জকি। জলি তার মায়ের প্রথম খেপের সন্তান। জলির একটি ছোট ভাই 'জন'। জনও শঙ্কর জাতীয় কুকুর। জলির একটি প্রথম খেপের কন্যাসন্তান আছে। তার নাম জিম্পি। ওরা সকলেই আমাদের প্রতিপালিত কুকুর কুকুরি। জলির সম্বন্ধে লেখার সময় জ্যাঁকের বয়স হয়েছিল ১২ বছর ৩ মাস। জ্যাঁকের বয়স যখন ১২ বছর ৬ মাস তখন শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে। আর জকির বয়স হয়েছিল ১২ বছর ২ মাস। কিন্তু জকির যখন ১২ বছর তিন মাস বয়স হয়েছিল তখন জকিও আমাদের মায়ামমতাকে উপেক্ষা করে চিরবিদায় নিয়েছে।

আমাদের পরিবারেই অন্যান্য সদস্য সদস্যাদের মত ওরাও ছিল। আমরা সকলেই ওদের সমান ভালবাসি। অসুখ-বিসুখে তাদের ডাক্তার বদ্যি দেখানোর কোন কৃপণতা নেই। ওদের সন্তান সন্ততি হলে আমরা খুব চিন্তায় পড়ে যাই; কোন পরিবারে গেলে যে ওরা আদরযত্ন পাবে ও সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে, সে চিন্তাই সব সময় করতাম।

বাবার অনেক বন্ধু বান্ধবও চেনা অচেনা অনেক ভদ্রলোক যারা কুকুরপ্রেমী তারাই জকি ও জলির বাচ্চা নিয়েছেন। নেয়ার সময় শুধু অনুনয় করে একটি কথাই বলতাম, দেখুন ওদেরকে নিজের পরিবারের মত একজন মনে করলেই আমি ও আমরা খুশি হবো। আর টাকা পয়সার কথা এখানে আনা নিরর্থক। কারণ আমরা সন্তান বিক্রী করিনা।

মিথ্যে বলবো না, যারাই নিয়েছেন তারা সকলেই নিজের পরিবারের একজন মনে করেই প্রতিপালন করছেন। আমরা দেখে ও শুনে খু-উ-ব আনন্দ পাই এবং ভাল লাগে। যারাই নিয়েছেন তাদের সাথে আমাদের এক নতুন আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

জলি তার মায়ের ছোট সন্তান ছিল বলে, ভীষণ কৃশ ছিল। চলতে ফিরতে অন্য বাচ্চাদের মত জলি ছোটাছুটি করতে পারত না, খুবই কষ্ট হতো। জলি দুর্বল ছিল বলে কাউকেও দেয়া হয়নি। ও ওর মায়ের সাথে থেকে থেকেই একদিন বড় হয়েছে। জলি ছোটকালে মায়ের দুধ তো খেতই। তারপরও ভাত নরম করে চট্‌কিয়ে চিকন চালনি দিয়ে ছেঁকে দুধের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হতো, যাতে ওর দুর্বলতা তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। জনকে দেয়ার মত তখন তেমন কোন কুকুর প্রেমী পাচ্ছিলাম না। এই জন আমাদের এখানে থেকে তিন সাড়ে তিন মাসের বাচ্চা হয়ে গিয়েছিল।

তাই তার প্রতি আমাদের মায়াও বেড়ে গিয়েছিল বলে জন আমাদের কাছেই রয়ে গেল। জলি তার ছোট ভাই জনের সাথেই বেশি খেলা করতো।

জলিও একদিন বাচ্চা দেয়ার উপযুক্ত হলো এবং তিন খেপে মোট নয়টি বাচ্চা প্রসব করেছিল। প্রথম খেপে চারটি মেয়ে বাচ্চা। তারই মধ্যে জিম্পি হলো একটি। জিম্পির রং ও লোম তার দাদু জ্যাকের মতই লম্বা ও সাদা। তবে জলি ছিল তার মা বাবার মিশ্রিত বাদামি ও সাদা রং এর। লোম ছিল তার বাবার মতই লম্বা। জলির বাকি তিন বাচ্চা তিন ভদ্রলোক নিয়েছেন। জলির দ্বিতীয় খেপের বাচ্চা দুটোর মধ্যে একটি কন্যা সন্তান, যার রং সাদা। অন্যটি ছিল পুত্রসন্তান। কিন্তু জন্মের কিছু দিন পরই মারা গিয়েছিল। সাদা বাচ্চাটি আর একজন কুকুরপ্রেমী প্রতিপালন করছেন।

জলি ছোটকালে দুর্বল ছিল বলে বাবা জলির জন্য খুবই চিন্তা করতেন। তাই তাকে ছোটকাল থেকে স্পেশাল কেয়ার নিয়ে বড় করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বিদেশী কুকুরের বছরে দু'বার বাচ্চা দেওয়ার প্রবৃত্তি হয়। তবে জলির ১ম ও ২য় খেপের মধ্যে এক বছর গ্যাপ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খেপের মধ্যে মাত্র ছয় মাস ব্যবধান ছিল। ৩য় বার তিনটি ফুটফুটে বাচ্চা দিয়ে কখন সে আস্তে আস্তে অসুস্থতায় পড়ে গেছে, আমরা তা বুঝতেই পারিনি। বাচ্চা দেয়ার পর খাওয়া খাদ্য একটু বেশি করে, ভাল করে এবং ভিটামিন জাতীয় খাবার দেয়া হত। এই সময় ভালো ভালো ভিটামিন জাতীয় খাদ্য দেয়া একান্ত প্রয়োজন, সেটা বাবাও জানতেন। জলির ৩য় বার বাচ্চা দেয়ার পর তাকে ডিম, দুধ খাওয়ানো হতো ঠিকই, কিন্তু তা শরীরের অভাব অনুযায়ী পরিমাণ মত হতো না বোধ হয়। তাই চৌদ্দদিন পব বাচ্চাগুলির চোখ ফোটা পর্যন্তই বোধ হয় জলি অপেক্ষা করছিল। তাই পনের দিনের দিন জলি আমাদের মায়ামমতা ত্যাগ করে রাত্র ৮টায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। সবচেযে বড় দুঃখ জলিকে চিকিৎসা করার সুযোগই পেলাম না! ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, তার নাকি অ্যাক্রেমশিয়া হয়েছিল।

এখন আমাদের সকলেরই এক চিন্তা, বাচ্চাগুলিকে কীভাবে বাঁচানো যায়। আমি বাবাকে বলেছি, বাবা তুমি চিন্তা করো না। আমি জলির আদর দিয়েই বাচ্চাগুলিকে বাঁচিয়ে তুলবো, বড় করে তুলবো। কথাটা বলতেই কখন চোখের জলে বুক ভেসে গেছে বুঝতেই পারি নি! তাই দেখে বাবা বলেছেন, কাঁদিস্ নি মা, জলির সময় হয়েছে, সে চলে গেছে। আমরা তো আছি? তুই তো বলেছিস্ই তুই জলির বাচ্চাদের যে ভাবেই হোক বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করবি। জলি ওপর থেকে দেখে খুশি হবে, এই ভেবে যে, সে ওর বাচ্চাগুলিকে অস্থানে ফেলে আসেনি।

জলির বাচ্চাগুলিকে দুধ খাওয়ানোর জন্য আগেই আমি ফিডার ও নিপল্ আনিয়ে রেখেছিলাম। কারণ দেখতাম বাচ্চাগুলি চোখ ফোটার আগেই জলির দুধে মুখ দিয়ে দু-তিনবার টান দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিত। বাচ্চাগুলির পেট ভরত না বলে কান্নাকাটি করতো। ফিডার দিয়ে দুধ খাওয়ালে কিছুক্ষণ পর জলির বুকেই ঘুমিয়ে থাকতো।

জলিকে সমাধিস্থ করে রাত্র ১০টায় বাড়িতে এসে জলির বাচ্চাগুলির দিকে চেয়ে মনটা ভীষণভাবে কেঁদে উঠলো। একদিকে বুক ফুঁড়ে কান্না আসছিল, অন্যদিকে ভগবানকে মনে মনে বলছি, ভগবান তুমি জলিকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছ ঠিকই, ওর বাচ্চাদেরকে সুস্থ শরীরে বাঁচতে দাও ও বড় হতে দাও এবং আমাকে তাদের বড় করতে ও বাঁচাতে সাহায্য কর। বাবাকে বললাম, বাবা আমি বাচ্চাগুলিকে নিয়ে নিচে থাকবো, খাটে থাকলে কখন বাচ্চাগুলি মাটিতে

পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে ও শীতে তুমি কষ্ট পাবে।

তখন ছিল শীতের শেষ সময়। নিচে থাকলে আমার ও বাচ্চাগুলির ঠাণ্ডা লাগবে বলে বাবা আঁতকে উঠেছিলেন। তাই বাবা আমাকে বলেছিলেন, তুমি ওপরে শোও, আমি বাচ্চাগুলিকে নিয়ে নিচে থাকবো, ওদের কষ্ট দেব না।

—জানি, তুমি ওদের কষ্ট দেবেনা। কিন্তু বাবা তা হয়না। কারণ তুমি জলির সোহাগ দিতে পারবে না। আর তাছাড়া কিছুক্ষণ পর পরই তো ওদেরকে দুধ খাওয়াতে হবে? সেটা করতে গেলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, যদি তুমি নিচে থাক। তুমি ওপরেই থাক। নিশ্চিন্তে ঘুমোও। চিন্তা করো না। আমি ঠিকই পারবো। আমার কিছুই হবে না। তুমি আমাকে সেই ব্যবস্থাই করে দাও।

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ও বাচ্চাগুলির যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে বাবা ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু বাবার কি আর ঘুম হয়? কিছুক্ষণ পর পরই বাবা এসে মশারির বাইরে বসে বসে দেখছেন, আমি কী করি। আমি তখন বাচ্চাগুলিকে নিপ্‌ল টিপে দুধ খাওয়াচ্ছি যাতে বেশি দুধ গলায় পড়ে শ্বাসরুদ্ধ না হয়।

এই দৃশ্য দেখে বাবা কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, তোরা সত্যিই মায়ের জাত। আমি তোর মত ঠিকই দুধ খাওয়াতে পারতাম না।

আমি বাবাকে বললাম, বাবা তুমি ঘুমোও নি?

—আমার তো ঘুম পাচ্ছে না, মা! তুই কী করে যে এদেরকে বড় করে তুলবি সেই চিন্তা-ই করছিলাম। একজনকে খাওয়াচ্ছিস্, অন্য দুজন কোথায়?

—ওরা দু-ভাই কম্বলের নিচে দুধ খেয়ে ঘুমুচ্ছে।

বাবা মশারিটা আলতোভাবে তুলে যাতে মশা না ঢুকে মশারির ভিতর দেখেন, দু-ভাই ডাবল লেপের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, যেমন মায়ের কোলেই ঘুমোচ্ছে। পাশেই ওদের বড় বোন জিম্পি সজাগ প্রহরীর মত বাচ্চাগুলির কাছাকাছিই আমার পাশে শুয়ে দেখছে, ওর মা-মরা ভাই-বোনদের ঠিকমত যত্ন হচ্ছে কিনা। আবার আমার বাবাকেও একবার আড় চোখে দেখে নিয়েছে এবং বুঝতে পেরেছে যে কোন শত্রু নয়, ওর ভাই বোনদের কিছুই করবে না। পরক্ষণেই ওর নাকটা ওর পেটের কাছে, ঠ্যাংয়ের নিচে মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে।

সে রাত্রে বাবার তো ঘুম বেশি হলো না! কারণ কতক্ষণ পর পরই দেখি বাবা এসে মশারির বাইরে থেকে দেখে যান। আমার তো ঘুম হলো-ই না। ক্লান্তিতে একটু চোখ লেগেছে তো একটু শব্দ পেলেই সজাগ হয়ে গেছি। সজাগ হয়ে কখনও দেখি বাচ্চাদের কেউ আমার মাথার ওপর, আমার চুলে মুখ গুঁজে, কেউ আমার গলায় মাথা রেখে অন্যটি আমার পেটের কাছে নাকটি নিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি তখন সবগুলিকে একত্র করে আমার বুকের কাছে এনে কম্বলটি ভাল করে গুঁজে দিতাম, যাতে ওদের শীত না লাগে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি, বাবা যতবারই এসেছেন, জিম্পি কিন্তু ততবারই মাথা উঁচু করে তা লক্ষ্য করেছে, কোন শত্রুপক্ষ এলো কিনা।

পরদিন বাচ্চাগুলিকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমার মায়ের ও বড়বোন জিম্পির জিম্মায় রেখে আমি বাবার সাথে পশু হাসপাতালে গেলাম এবং ডাক্তার কাকুকে (ডাক্তারবাবুকে আমি কাকু

বলেই সম্বোধন করি) জলির চিরতরে বিদায়ের কথা জানালাম। জলির মৃত্যুর আগের দিন এই ডাক্তার কাকুই চিকিৎসা করেছিলেন। তাই তিনি বললেন, বাচ্চাগুলোর চোখ ফুটেছে তো?

— হ্যাঁ, চোখ ফুটেছে, যেদিন হাসপাতালে জলিকে অসুস্থ অবস্থায় আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলাম, সেদিনই।

—তবে আর চিন্তা কী?

—চিন্তা তো একটাই। কী করে বাচ্চাগুলিকে বাঁচাবো, ভেবে পাচ্ছি না, কাকু!

—আরে বাঁচবে, বাঁচবে। এত ভাবছো কেন? চোখ যখন ফুটেছে তখন বাঁচবে। কাল রাত্রিতে কী দুধ খাইয়েছিল?

—হ্যাঁ, ডেয়ারির প্যাকেটের দুধ, অর্দ্ধেক জল মিশিয়ে খাইয়েছি।

—তা হলো তো চলবে না। মায়ের দুধে যে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্স থাকে ডেয়ারির দুধে তা থাকেনা।

—তা হলে?

—এক কাজ করো। নেস্‌লে কোম্পানির ল্যাকটোজেন - ১ এবং সাথে গমের সেরিল্যাক মিশিয়ে খাওয়াও, তাতে ভালো হবে আর ABTAC ভিটামিনটা তিনফোঁটা করে খাওয়াও।

—আচ্ছা কাকু।

ডাক্তার কাকুর পরামর্শ মতই বাচ্চাগুলির খাওয়া-দাওয়া ও পরিচর্যা চলতে লাগলো।

সময় তো আর বসে থাকে না। দিন অতিক্রম হতে লাগলো। আমিও সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া, যত্মা-আত্তি ও পরিচর্যার দিকে সব সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগলাম। মা একদিন বললে, কীরে মা, তোর নাওয়া খাওয়া হবে না?

—মাগো, ওদেরকে একটু খাইয়ে নেই, তারপরই আমি খাব।

বাবা আদর করে বাচ্চাদের কোলে নিতে গেলেই আমার ভয় হয়, পাছে হাত থেকে ফসকে পড়ে না যায়! তাই বাবাকে বললাম, দেখ বাবা, হাত থেকে ফস্‌কে যেন পড়ে না যায়। তাহলে কিন্তু বাছা আমার ব্যথা পাবে। বাচ্চাগুলি ছোট বলে মা পড়ে যাওয়ার ভয়ে হাতে নেয় না। আর জিম্পির কথা ত বলেই শেষ করা যাবে না।

যদিই বা জিম্পির পায়খানা বা পেচ্ছাপের বেগ হলো, তখন এক দৌড়ে বাইরে গিয়ে কোনক্রমে কাজ সমাপন করে আবার বাচ্চাদের কাছেই বাচ্চাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। জিম্পিও তার মা জলির মতই বাচ্চাদের শুশ্রূষা করে। অর্থাৎ ছোটকালে তার মা যেমন বাচ্চাগুলির পায়খানা পেচ্ছাপ করলে জলি নিজেই খেয়ে ফেলতো, তার মা থাকতেই জিম্পিও তেমন করতো। এখন মায়ের কাজটা জিম্পিই করে থাকে। জিম্পি তার মা-এর মৃত্যুতে এমন শোকার্ত হয়েছে যে, মা-এর মৃত্যুর পর থেকে এখন পর্যন্ত নিজে নিজে কিছুই খায়না। দুধ, ভাত, মাছ, মাংস এমন কি বিস্কুট পর্যন্ত খায় না। পনের দিন তো একেবারে নির্জলা উপোস থেকে থেকে একেবারে মরণোন্মুখ হয়ে গিয়েছিল! বাবা জোর করে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ খুলে কখনও দুধ, কখনও সেরিল্যাক পাতলা করে মিশিয়ে খাওয়াতো। এখন অবশ্য দুধ, মাছ ও মাংস ভাতের সাথে লেই করে মিশিয়ে বাবা বা আমি জিম্পির মুখ হাঁ করে ধরে গলায় দিয়ে দিলে খেয়ে ফেলে। কিন্তু এখনও নিজে নিজে মোটেও

খায় না। যাক্, জিম্পি এখন ভালই আছে। কেউ যদি আমাদের সদর দরজায় এসে কিছু শব্দ করে, সে ঘাড় উঁচু করে সেদিকে লক্ষ্য করে এবং বাচ্চাদের কাছে ঘেঁষে শুয়ে থাকে, পাছে তার ভাই-বোনদের কেউ নিয়ে যায়।

বাচ্চাগুলির কিছুদিন বয়েস হয়েছে। হাঁটতে পারে। তবে ভাল করে নয়। তাই যে বাচ্চাটি হেঁটে হেঁটে কোথাও যায় জিম্পিও সাথে সাথে যায়, যদি সে পড়ে যায় এই ভয়ে।

এক রাত্রিতে যখন আমার ঘুমটা পাতলা হলো, দেখি, একটি বাচ্চা আমার বুকের কাছে নেই। চেয়ে দেখি মশারির কিনারায় গিয়ে শুয়ে আছে। জিম্পিও বাচ্চাটিকে আগলে মশারি ঘেঁষে তাকে নিয়ে শুয়ে আছে। আমার ঘুম ভাঙার ভয়ে আমাকে ডাকেনি বা ঘুম ভাঙায়নি। নতুবা বাচ্চাদের কিছু হলেই দৌড়ে এসে আমার হাত নতুবা আমার গাল পা দিয়ে টানে।

অন্যদিকে চেয়ে দেখি আমার বাবা কখন যেন মশারির বাইরে বসে জিম্পির সোহাগ করা দেখছে। এবং আমাকে বলছে, তোর ঘুম ভেঙ্গেছে মা? আমি জিম্পির ছোট ছোট ভাই বোনদের প্রতি সোহাগ করা দেখছি, বাচ্চাটির গায়ে শীত লাগবে বলে তার গা ঘেঁষে জিম্পিও শুয়ে রয়েছে।

আমি বাবাকে বললাম, বাবা আমার চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল টের পাইনি। কখন বাচ্চাটি মশারির কাছে চলে গেছে।

—ঠিক আছে, তুই উঠিস্নি মা, আমিই বাচ্চাটিকে তোর কাছে এনে দিচ্ছি।

অন্য এক রাত্রিতে দেখি আমার মা বিছানায় জিম্পি ও বাচ্চাদের পাশে শুয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখ খুলতেই দেখি, মা বাচ্চাদের আগলে শুয়ে আছে এবং বলছে, তুই কী রে মা, বাচ্চারা পেচ্ছাপ করে প্রায় সবটা লেপই ভিজিয়ে ফেলেছে। তুই তাদের নিচে বড় বেড্ কভারটা ৪/৫ ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়ে নিজে আধা পেচ্ছাপযুক্ত লেপের ওপর পড়ে রয়েছিস?

—আমার এই দিকটা তো মা ভিজা হবে না। মা অমনি আমার শরীরের নিচে হাত দিয়ে বলছেন, একেবারে ভিজা না ঠিকই, তবে ঠাণ্ডা লাগতে তো পারে?

—না মা, আমার একটুকুও ঠাণ্ডা লাগবে না, তুমি চিন্তা করো না।

—ঠিকই তো তোর ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাচ্চাদের যত্ন করবে কে?

—আমার কিছু হবেনা মা, আমার বাচ্চারা কষ্টেসৃষ্টে বড় হয়ে উঠুক, তখন সবই ঠিকই হয়ে যাবে।

মা আমার শোয়ার জায়গায়ও আর একটি বিছানার চাদর বিছিয়ে দিলেন।

বাচ্চাদের বয়স এক মাসের ওপর হয়ে গেছে, এখন ওদের পাত্রস্থ করতে হবে। এক দেড়মাস বয়স হলেই কুকুরপ্রেমীদের আমরা বাচ্চা দিয়ে দিই। ওদের পাত্রস্থ করার কথা মনে হলেই মনটা ভেঙ্গে যায়। ভাবি কী ভাবে ওদেরকে ছেড়ে থাকব। কিন্তু পাত্রস্থ ত করতেই হবে। যেমন মা মেয়েকে পাত্রস্থ করেন।

মনে যত দুঃখই হোক না কেন ওদেরকে পাত্রস্থ করার চিন্তাই মনে বেশি। কারণ, জলি ও জন ঘটনা পরম্পরায় আমাদের কাছেই থেকে গেছে। জকি ও জলির অন্যান্য বাচ্চাদের যেমন পাত্রস্থ করেছিলাম, তেমন এদেরও পাত্রস্থ করতেই হবে নতুবা শহরের বাড়িতে এতগুলোকে প্রতিপালন করা ভীষণ অসুবিধা ও কষ্টকর। এগুলোকেও পাত্রস্থ করবো এটাই মুখ্য চিন্তা। তাই বাবাকে

বললাম, বাবা ডাক্তার কাকুকে বাড়িতে একবার আসতে অনুরোধ কর না, যাতে বাচ্চাদের পাত্রস্থ করার আগে একবার দেখে যান, ওরা সুস্থ আছে কিনা।

ডাক্তার কাকু এলেন এবং বাচ্চাদের দেখে বললেন, ওরা সুস্থ আছে, এখন পাত্রস্থ করা যাবে।

বাচ্চাদের আমরা কোন নাম রাখি না। পাত্রস্থ করার পর বাচ্চার প্রতিপালকরাই নিজেদের রুচিমত নাম রাখেন। জলির শেষ তিনটি বাচ্চার মধ্যে প্রথম বাচ্চাটি কন্যা সন্তান এবং বাকি দুটি পুত্র সন্তান। কন্যা সন্তানটি আবার আমার ন্যাওটা বেশি। কারণে অকারণে আমার কাছেই চলে আসে, আর বাকি দুটো আপনমনেই নিজেরাই খেলা করে। ওরাও আমার কাছে আসে তবে বড়টির মত নয়। পেট ভরা থাকলে এখানে সেখানে একটি অন্যটির পেটে ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকে। জলি ও তার মা জলির অন্যান্য বাচ্চাগুলি যাদের দিয়েছিলাম, তারা সত্যি সত্যিই তাদের নিজেদের পরিবারেরই একজন সদস্যা সদস্য মনে করেন। ঐ রকম লোকই আমরা খুঁজছি। পেয়েও গেলাম একজন কুকুরপ্রেমী। জলির প্রথম খেপের প্রথম বাচ্চাটি যিনি নিয়েছিলেন, তিনি তার কুকুর বাচ্চাটির নাম রেখেছেন জেনী। তিনিই তাব এক আত্মীয়কে নিয়ে এসেছেন একটি কুকুরের বাচ্চা নেবেন বলে। আমি আর কোন চিন্তা করিনি। তারা তাদের পছন্দমত কন্যা সন্তানটিই নিলেন। আমি বাবা সহ বাচ্চাটি ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওর সাথে খেলা করে ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাত্র প্রায় এগারোটায় বাড়িতে এলাম। বাড়িতে এসে দেখি, ওর বড়বোন জিম্পি ওকে এ'ঘর ও'ঘর করে খোঁজাখুজি করছে। ঘুমায়নি! অন্য বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি ও বাবা যেই মাত্র ঘরে এসে ঢুকলাম, বাবাকে ও আমাকে দেখে আমাদের কাছে এক দৌড়ে এসে ভক্ ভক্ করে বক্‌ছে আর যেন কী বলতে চাইছে! জিম্পিকে কোলে নিয়ে ঐ ঘুমন্ত বাচ্চা দুটোর কাছে গিয়ে অনেক কিছু বললাম, বোঝালাম, সে কী বুঝলো জানি না। একটু পরে চুপচাপ ঐ ঘুমন্ত ভাইদুটোকে ঘেঁষে শুয়ে রইল। আমিও খেয়েদেয়ে এবং জিম্পি সহ বাচ্চাদের খাইয়ে ওদেরকে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। এক সময় ঘুম এসে গেল।

পরদিন সকালে জলির দ্বিতীয় খেপের বাচ্চাটি যিনি নিয়েছিলেন তিনি আর একজন কুকুরপ্রেমীকে নিয়ে আসলেন। তিনি দুটো পুরুষ বাচ্চাই নিয়ে গেলেন। আর তাঁর বড়িতে একটি ময়না পাখিও তিনি প্রতিপালন করেন। ওদের বাড়িতেও আমি ও বাবাই নিয়ে গিয়ে ওদের সাথেও খেলাধুলো করে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে চলে এলাম।

বাড়িতে এসে দেখি, জিম্পি পাগলের মত এঘর ওঘব খোঁজাখুজি করছে, আর আমাদের ক্রমান্বয়ে ঘেউ ঘেউ করে বকাবকি করেই চলেছে। যেন বলতে চাইছে, আমার ভাই বোনকে কোথায় রেখে এসেছো? কাছে আসতে বললে, আসতে তো চাইছেই না বরং বেশি করেই বক্‌ছে।

অন্যদিকে, কন্যা সন্তানটি যারা নিয়েছিল তাদের কাছ থেকে টেলিফোন আসছে যে, কন্যা সন্তানটি সারারাত কান্নাকাটি করছে এবং এখন পর্যন্ত কিছুই খাচ্ছে না। এখন বেলা বাজে প্রায় ১১টা। কোলে নিতে গেলেই কামড়াচ্ছে। আর নীরব জায়গায় গিয়ে কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে! ফোনটা শুনে আমার বুকটা যেন কেমন করে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠলো! মনে হলো, কী যেন আমার হারিয়ে গেছে। বাবাকে বললাম, বাবা তাড়াতাড়ি চল, আমার মেয়েটা বোধ হয় কেঁদে কেঁদে গলা শুকিয়ে ফেলেছে। আমার ভাল লাগছে না।

আমরা কন্যা সন্তানটি যে বাড়িতে দিয়েছিলাম, সে বাড়িতে গেলাম। ঘরে ঢোকার সাথে

সাথেই আমার সোনামনি এক লাফ দিয়ে আমার কোলে এসে পড়লো এবং আমাকে সোহাগের কামড় কামড়াতে লাগলো, গালে মুখে হাতে গলায় যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই তার জিব দিয়ে চাট্‌তে লাগলো। ওর আচার-আচরণ দেখে মনে হলো, সে যেন বলতে চাইছে, আমাকে তোমরা ফাঁকি দিয়ে কোথায় রেখে গেছ? বাড়ির মালিক ওর আচার-আচরণ দেখে বলছেন, দেখছেন, তারা কেমন আপনজন চিনে? আফনাগো ছাড়া এই বাচ্চাডি কি এহানে থাকতো পারবো? আমি বললাম, দেখুন নতুন জায়গা তো, আমরা দু'বেলাই এসে ওকে নতুন জায়গায় এডজাস্ট করিয়ে দিয়ে যাবো।

—এড্‌জাস্ট কইরা দিয়া যাইবেন, নাকি একবারেই লইয়া যাইবেন গা?

ভদ্রলোকের কথাটা শুনে মনে ভীষণ আঘাত পেলাম। আমি বাবার দিকে তাকালাম, আর বাবা আমার দিকে তাকালেন। আমরা বুঝলাম তারা কুকুর পালার উপযুক্ত নয়। মুখে মুখেই কুকুর প্রতিপালনের শখ। আসলে মনের দিক থেকে খুবই দুর্বল।

অমনি বাবা বললেন, বাচ্চাটাকে নিয়েই চল। জলি বোধ হয় ওর অভাবটা পূর্ণ করার জন্য ওকে দিয়ে গেছে। জলির জায়গায় ও-ই থাকবে।

বাবা ওকে বাড়িতে নিয়ে আসতে বলতে আমার বুকটা ভরে গেল। মনটাও আনন্দে চাঙা হয়ে উঠলো।

বাড়িতে যখন জলির এই বাচ্চাটি নিয়ে আসলাম, জিম্পির তো আদরের শেষ নেই। ওকে জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে ওর সমস্ত শরীর একেবারে ভিজিয়ে ফেলেছে। বাচ্চাটিও দিদিকে পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে দিদি (জিম্পি) যে ভাবেই চাটে কোন বাধা দেয় না। একবার এভাবে শোয় আবার অন্যভাবে শুয়ে দিদিকে আরও বেশি করে চাটতে দেয়। মাঝে মাঝে সে-ও দিদির মুখে চোখে জিভ দিয়ে চেটে দেয়। আমাদের বাড়িতে আসার পর ওর নাম রাখা হল ঝিনুক। অন্য বাড়িতে ঝিনুকের দু'ভাইকে একদিন দেখতে গেলাম। দেখলাম, ওরা ভালই আছে।

আর ঝিনুক আমার কাছেই আমার মেয়ে হযেই থেকে গেল।

অলৌকিক

পরাশর দাস ও মৃগাঙ্ক সাহা। একই স্কুলে চাকুরি করেন। দুজনের একজন বিজ্ঞান পড়ান অন্যজন সাহিত্য পড়ান। অনেক বছর যাবৎই বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আছেন। দুজনের ভীষণ ভাব। স্কুলে এসে অফ্ পিরিয়ডে যেখানে যাবেন একই সাথে যাবেন। চা পান করতে গেলেও একই সাথে। গল্প করলেও একই সাথে বসে বসে কত রং বেরং-এর গল্প যে করেন, তার কোন শেষ নেই! অনেক বছর একই সাথে সাথে চলেন বলে পারস্পরিক সম্বোধনটা তুই তুকারিতে চলে এসেছে। তাই একদিন কোন কথা প্রসঙ্গে মৃগাঙ্ক পরাশরকে বলল, আচ্ছারে পরাশর,

কেউ যদি কারো কাজে, কথায় বা ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে কাউকে বলেন, তোমার জীবনে এই হবে সেই হবে, তুমি জীবনে ঠেকবে না তা কি কখনও হয়? আমার তো সেগুলো মনে হয় বাতুলতা মাত্র —'কথার কথা'। আমার ভাই ও সব কথায় আস্থা নেই। বিশ্বাসও হয় না, আর তাছাড়া মনেও ধরে না।

—সব কাহিনি এক রকম হয় না রে মৃগাঙ্ক, এক রকম হয় না। সব কথা-ই কাজে আসে না বা ফলপ্রসূ হয় না। আবার কারোও কথা মন্ত্রের মত কাজে লেগে যায়। এমন অনেক কাহিনি আছে যা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। তবে দৈবী প্রভাব কার ওপর কিভাবে কাকে উপলক্ষ করে আসে, তা কেউ জানে না। বলতেও পারে না।

—দূর্। দূর্। এসব কাহিনি আমার মোটেও বিশ্বাস হয় না।

—আমারই কি ছাই বিশ্বাস হয়? তবে আমার জীবনে এমন এক কাহিনি ঘটেছে, যা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। বিশ্বাস করার মত।

—তাই নাকি? তাই নাকি? আচ্ছা আমার কাছে বলা যাবে তো?

— স্বচ্ছন্দে বলা যাবে। অকপটে বলা যাবে।

—তবে বলনা ভাই। তোব জীবনের কাহিনি শুনতে জানতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে।

— তোব ধৈর্য আছে তো? বিরাট কাহিনি কিন্তু।

—আরে আছে, আছে, তুই বল্‌না।

—তবে শোন্।

পরাশর বলতে লাগলো, 'তর বালা-ই অইব' বুঝতে পারছিস্? এই 'ভালই হবে' কথাটার মধ্যে যে কী আছে তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। এই কথাটায় যে কী মন্ত্র, কী যাদু আর কী-ই বা দৈবী প্রভাব আছে, তা আমি চাকুরি জীবনে ভাল করেই অনুভব করেছি। জানি না এই প্রভাবটা আমার জীবনে এভাবে ফলপ্রসূ হলো কেন? আমার অজান্তে কোন সুকর্ম করেছি কিনা তাও জানি না। তবে আমার জ্ঞাতসারে কোন দিনও কারও অমঙ্গল চাই নি আমি।

— দেখতেই তো পাচ্ছি। ঠিক আছে, তুই বলে যা।

—তুই তো জানিস্ বা দেখতেও পাচ্ছিস্, সাধারণত আমাদের এই শিক্ষাক্ষেত্রেই দেখা যায় রাজ্যের কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক বছর একই চাকুরি-স্থলে থাকলে পরও সরকারকে অর্থাৎ আধিকারিককে যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করলেও সেখান থেকে বদলি হয়ে কোন ভাল জায়গায় অর্থাৎ শহরাঞ্চলের কাছাকাছি কোন জায়গায় আসা যায় না! নিজের ইচ্ছায় কোন ইচ্ছামত জায়গায় বদলির আবেদন করলেও সেখানে বদলি হওয়া যায় না।

—ঠিকই বলেছিস্।

—যদিই বা সরকার পাবলিক ইন্টারেষ্ট না দেখিয়ে অউন (own) ইন্টারেস্টে বদলি করেন। তা-ও সরকারের ইচ্ছামতই তা করে থাকেন। নিজের ইচ্ছেমত বদলির কথা সেখানে বাতুলতা মাত্র।

—ঠিকই তো।

—আমার বেলায়ও এমন হয়েছিল। সে ঘটনা সময়ান্তরে বলবো। এখন আসল কথায় আসা

যাক্।

—বল্। আমি শুনছি।

—বলছি রে, বলছি।

১৯৬৯ সালে আমি ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রত্যন্ত অঞ্চল সাব্রুমের ব্রজেন্দ্রনগর সিনিয়ার বেসিক স্কুলে" নতুন জয়েন করেছিলাম। তা-ও ঐ একই সনের জুলাই মাসের প্রায় শেষ দিকে। মাস দেড়েক চাকুরি করার পর আমার ব্যক্তিগত কাজে আগরতলায় এসেছিলাম। খুব সম্ভব সেটা সেপ্টেম্বর মাস হবে। আমি আগরতলা শহরে কিছু কেনা-কাটির জন্য বেরিয়েছি। শকুন্তলা রোডের ওরিয়েন্ট চৌমুহনীর কাছেই হরিভাণ্ডারে গেছি। সেই সময় একজন মণিপুরি বুড়িমা, যিনি শহরেই ঘোরাফেরা করেন, তাঁর কাঁধে একটি পুঁটলি থাকতো এবং পায়ে এক জোড়া খড়ম থাকতো। সেই বুড়িমা হঠাৎ করে সেই হরিভাণ্ডারে ঢুকলো। ঢুকেই আমাকে ধরলো।

এই আমারে পইসা দে?

আমিও কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেলাম। আমার পাঞ্জাবির পকেটে তখন নানা রকমের ভাংতি মুদ্রা ছিল। টাকা থেকে আরম্ভ করে পাঁচ পয়সা পর্যন্ত নানা পরিমাণের মুদ্রা। আমি তখন আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো মুদ্রা ঐ বুড়ি মার সামনে ধরলাম। বুড়িমা আমার মুখের দিকে ঘাড় কাত করে একটু তাকালো এবং একটু মুচকি হাসল। হেসেই আমার হাতের মুদ্রাগুলি থেকে মাত্র একটি পঁচিশ পয়সার মুদ্রাই নিল। মুদ্রাটি নিতে নিতে আবার আমার দিকে তাকালো এবং বলল, তর ভালা অইব। আর বলা নেই, কওয়া নেই চট্‌পট্ চলে গেল। আমি তাঁর চলার পথে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েই রইলাম। আর ভাবলাম, আমার আবার কী-ই বা ভাল হবে বুঝি না, জানিওনা।

যাক্ আমি আগরতলা থেকে সাব্রুম আমার কর্মস্থলে চলে এসেছি। রোজকার মত স্কুলেও গেছি, ক্লাশও করছি। আমার অফ্ পিরিয়ডে স্টাফরুমে বসে খবরের কাগজটা দেখছি। হঠাৎ "দিনটি কেমন যাবে" কলামটি চোখে পড়লো। ঐ কলামে চোখ বোলাতে গিয়েই দেখি আমার রাশিফলে লেখা আছে, "সত্বর কর্মস্থল পরিবর্তন"। তখনও আমি বুঝতে পারিনি, আমার কী ভাল হবে। আমি বরং ঠাট্টা করে আমার সহকর্মীদের একটু সরবেই বলতে লাগলাম, এই দেখুন পত্রিকায় লেখা আছে অতি সত্বর আমার কর্মস্থল পরিবর্তন! আমার কথা শুনে কেউ বলেছিলেন, আরে রাখেন, আপনার কর্মস্থল পরিবর্তন, এমন অনেক কথা-ই পত্রিকায় লেখা থাকে। এই বন জঙ্গলে যারা একবার আসে, তারা পনের ষোল বছরেও শহরে কি শহরের আশেপাশেও যেতে পারে না! এখানেই অনেকের কর্ম সমাপ্তি ঘটে যায়! ওনার স্কুলে আসতে না আসতেই "কর্মস্থল পরিবর্তন"। আবার কেউ বলেন, আরে মশাই, মাত্র ত নতুন এসে জয়েন করেছেন, এখানকার মাটির গন্ধও ত এখনও নাকে নিতে পারেন নি, মাস দেড়েক মাত্র হয়েছে এখনই কর্মস্থল পরিবর্তন? দশ পনের বছর এই পরিবেশের উপযুক্ত হউন, তারপর কর্মস্থলের পরিবর্তন চিন্তা করবেন। আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই ভেবে যে আমার জীবনের অর্ধেক ত তাহলে এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দু'চার দিন পরই সাব্রুম প্রপার থেকে এই স্কুলে চাকুরি করতে আসেন আমার এক সহকর্মী। তিনি স্টাফরুমে এসে আমাকে বলতে লাগলেন, ও মশাই, সাব্রুম ইনস্পেক্টরেটে আপনার ট্রেন্সফারের অর্ডার দেখে এলাম। তাতে দেখলাম, আপনি ব্রজেন্দ্রনগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল থেকে তেলিয়ামুড়া কড়ইলং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ট্রেন্সফার হয়েছেন।

আমি ওনার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলাম। ঐ সহকর্মীর কথা শুনে অনেকেই আমাকে বলেছিলেন, কি মশাই, আগরতলা যে গেছেন তখন বুঝি অফিসে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে এসেছেন?

—আমি অফিসের ধারেকাছেও যাইনি। চাবি ঘোরাব তো দূরের কথা।

—তাহলে এ ব্যাপারটা—মানে আসতে না আসতেই কী করে ট্রান্স্ফার হলেন?

— সেটা আমিও জানি না।

—আর ন্যাকা সাজবেন না, আমরা সবই বুঝি।

আবার কেউ বলেন, অফিসে নিশ্চয়ই ওনার আত্মীয়-পরিজন কেউ না কেউ আছেনই, নতুবা এমন হওয়া সম্ভব নয়।

আমি তখন সকলের খোঁচা দেয়া কথাগুলি সহ্য করেছিলাম এবং আমার সহকর্মীর কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ইনস্পেক্টরটে গেলাম।ইন্স্পেক্টরেটে গিয়ে এস্ট্যাবলিশমেন্ট সেকসানের বড়বাবু হরেকৃষ্ণ পাল মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, হরেকৃষ্ণবাবু, আমার নাকি ট্রেন্স্ফার অর্ডার এসেছে?"

—আপনার নাম?

—আমার নাম পরাশর দত্ত।

—এসেছে, তাতে কী হয়েছে? ট্রেনস্ফার অর্ডার আসলেই আপনাকে রিলিজ করতে হবে? দু'দিন হয় নি আপনি চাকুরিতে জয়েন করেছেন, আর এরই মধ্যে ট্রেনস্ফার? আরে মশাই, এমনও টিচার আছেন, যারা ট্রেন্স্ফার হতে পারেনি বলে এখানেই বাড়িঘরও তৈরি করে ফেলেছেন। আর আপনি আসতে না আসতেই ট্রেন্ফ্ফার! মন্ত্রী-টন্ত্রীর সাথে জানাশোনা আছে বুঝি? শিক্ষামন্ত্রী আপনার কী হয়?

আমি তখন একটু ভনিতা করেই বলে বসলাম, আমার বোনজামাই।

—এজন্যই আসতে না আসতেই ট্রেন্স্ফার।

তখনকার সময় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মাননীয় প্রফুল্ল কুমার দাস। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিভা দাস। আর বিভা দাস ছিলেন আমার ক্লাশমেট। এই সুবাদেই মন্ত্রী আমার বোন জামাই। আমি বললাম, পুজোর ছুটির আগেই আমি রিলিজ হতে চাই।

— সে দেখা যাবে।

— দেখা যাবে নয়। নতুবা আবার আগরতলা আমাকে যেতে হবে। বোনজামাই এর কাছে। যদিও আমার টেনস্ফারের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বা বিভা দাস কেউই কিছুই জানেন না।

যাই হোক, ট্রেনস্ফারের অর্ডারটা দেখেই আমার বিশ্বাস হলো, আমি ট্রেনস্ফার হয়েছি, ব্রজেন্দ্রনগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল থেকে সেই সুদূর তেলিয়ামুড়া করইলং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সাব্রুম থেকে দূর হলেও আগরতলা থেকে কাছেই এবং সাবডিভিশানাল শহর।

সাথে সাথেই আগরতলার মণিপুরি বুড়িমার কথা মনে পড়ে গেল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। কারণ, এই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কবে কোথায় বদলি হতাম, আমি নিজেও জানি না। বুড়িমার কথাটা আস্তে আস্তে বিশ্বাস হতে লাগলো।

আমি পুজোর ছুটির আগেরদিন রিলিজ হলাম। ছুটিটা আগরতলা বাসায় কাটিয়ে খোলার

দিন তেলিয়ামুড়া করইলং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করলাম। ১৯৬৯ ইং সনের নভেম্বর মাসে। করইলং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ছিলাম মাত্র চার পাঁচ বছর।

এখান থেকেও "তরভালা-ই অইব" এর মতই ঘটনা দিয়েই জিরানীয়া বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বদলি হয়েছিলাম।

—তাই নাকি! (মৃগাঙ্ক ঘটনা শুনে উত্তর করলে)

—হ্যাঁ। ঘটনাটা খুলেই বলি। শোন। ধৈর্য হারাস্ নি তো?

—আরে না না, আমার তো শুনে আশ্চর্যই লাগছে। তুই বলে যা।

তেলিয়ামুড়া শহরে শিক্ষকদের একটি মেসবাড়ি ছিল। করইলং-এর শিক্ষক মশাইরা থাকতেন। আমি সেই মেসবাড়িতেই অন্যদের সাথে থাকতাম। এবং সকলের সাথেই স্কুলে আসা-যাওয়া করতাম।

একদিন স্টাফ্রুমে বসেই কী একটা লেখালেখির কাজ করছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন মহিলা স্টাফ্রুমে এসে ঢুকলো এবং তার অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য চাইল। সকলেই তার সাথে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ব্যবহার করলো। আমার কাছেও এলো। আমিও একই ব্যবহার করলাম। ওর কাকুতি মিনতির মূল্য দিলাম না। কিন্তু ওর চোখে আমার চোখ পড়তেই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। মহিলা যখন সকলের দূরছাড় খেয়ে স্টাফ্রুম থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিল, তখন আমি আর ঠিক থাকতে পারি নি! আমার মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছিল! আমি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে আস্তে আস্তে বল্লাম, স্টাফরুমে কেউ না থাকলে তুমি আবার আমার কাছে এসো। আমি স্টাফরুমেই থাকবো। স্টাফরুমের সকলেই যখন টিফিন পিরিয়ডে চা-পান ও টিফিন করার জন্য স্কুলের পাশেই একটি দোকানে চলে গেলেন, সেই সময় মহিলা আবার আমার কাছে এলো। আমি আমার সাধ্যমত মহিলাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করলাম। মহিলা সাহায্য পেয়ে হাতজোড় করে বলল, "বাবু আপনার ভালা হইবে।" আমার ভাল হবে কথাটা এই মহিলার মুখে শুনেই আমার মনটা কেমন যেন এক অনাকাঙ্ক্ষিত আশার আশায় চিন্তায় ফেলে দিল। কেমন করে যে ভাল হবে তাও আমার জানা নেই। তবে কিছুদিনের মধ্যে নানা কাজকর্মের ভিড়ে সেই "আমার ভাল হবার" কথাটা ভুলে গেলাম।

সেই মেসবাড়িতে আমরা তিন সহকর্মী বিকেলবেলা গল্পগুজব করছিলাম। এমন সময় স্থানীয় এক ডাকপিয়ন এসে তার কাজের সুবিধার্থে কয়েকটি লেফাফা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "স্যার, দয়া করে স্কুলের চিঠিগুলি যদি স্কুলে নিয়ে যান তবে আমাকে আর স্কুলে যেতে হয় না। চিঠিগুলি আজকের বিকেলের ডাকে এসেছে। তাই আপনাদের কাছেই নিয়ে এসেছি। কিছু মনে করলেন না তো, স্যার?"

—এতে মনে করার কী আছে। ঠিক আছে দিয়ে যান। পরদিন অফিসের বড়বাবুর কাছে লেফাফাগুলি দিলাম। বড়বাবু লেফাফাগুলি দেখেই একটি লেফাফা হাতে নিয়ে তার গায়ে এডুকেশন ডাইরেক্টরেটের সিলমোহর ও অফিসের রেকর্ড করা নম্বর দেখে বললেন, এই লেফাফাটায় তো ট্রেনস্ফার অর্ডার এসেছে? বলেই এক ঝটকায় লেফাফার মুখ খুলে অর্ডারটা বের করে চিৎকার

করে বললেন, ও মশাই, আপনার ট্রেনস্‌ফার অর্ডার আপনি নিজেই বহন করে নিয়ে এলেন? আমার তখন স্বামীর চিকিৎসার জন্য যে মহিলাটি আমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আমাকে বলেছিল, "বাবু আপনার ভালা হইব" তার কথাটা মনে পড়ে গেল। অর্ডারটার মধ্যে দেখলাম, আমি তেলিয়ামুড়া করইলং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে জিরানীয়া বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে বদলি হয়েছি। আস্তে আস্তে শহরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। দেখে মনটা ভালই লাগলো। ১৯৭৪ ইং নভেম্বর মাসে বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জয়েন করেছিলাম।

বীরেন্দ্রনগর স্কুলে ছিলাম একুশ বছর। এই বীরেন্দ্রনগর স্কুলে এসেই তো তোর সাথে পরিচয়। তাই নারে মৃগাঙ্ক?

—হ্যাঁ তাই। কিন্তু এই বীরেন্দ্রনগরে তো তোর অনেক বছরই কেটে গেল। এর মধ্যে "তোর ভালই হবে" এমন আর কোন ঘটনা শুনিনি।

— ঠিকই বলেছিস্। তবে কি এখানেই আমার চাকুরি জীবনের ভালই হবার শেষ অধ্যায়?

— কে জানে? এখনও তো এখান থেকে আর কোথাও যাস্ নি। আরও তো চাকুরির কয়েক বছর আছে।

যাক্ অনেকদিন একই স্কুলে দুই বন্ধু কাটালাম। আমি থাকতাম জিরানীয়া সরকারি আবাসনে। দশ বছর থাকার পর ১৯৮০ ইংরেজির দাঙ্গার পর আগরতলায় ভাড়াটে থাকলাম, বাকি দশ বছর। তারপরই কলেজটিলা নিজে বাড়ি করি। আর বন্ধু থাকে ধলেশ্বর নিজ বাড়িতে। দুই বন্ধু পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে প্রায়ই আসা যাওয়া করতাম।

বীরেন্দ্রনগর থাকাকালীন অনেকেই সময় সাহায্যের ঝুলি নিয়ে এসেছিল। কখন কাকে কীভাবে সাহায্য করেছি আমার তা মনে নেই। তুই তো জানিস্, আমার জিরানীয়া একুশ বছর কাটানোর পর একটা বদলির জোয়ার এসেছিল?

—হ্যাঁ। আমিও সেই জোয়ারেই ভাসমান একজন পথিক।

—তবে তুই কিন্তু বেশি দূরে যাস্ নি। আগরতলার অভিমুখেই রানিরগাঁও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বদলি হয়েছিলি।

—ঠিক তাই, একেবারে রাস্তার কাছেই। বাস থেকে নেমেই আমার স্কুল।

—দেখ, সেই "তর বালাই অইব" এর রেশ কিনা। নতুবা একেবারে রাস্তার পাশেই স্কুল, তারপর আবার আগরতলারই অভিমুখে! বাকি নয়জনের তো এমন হয়নি?

—হবে হয়তো। এখন আর দৈবী প্রভাব অবিশ্বাস করতে পারছিনা রে।

যাক্, দুই বন্ধুর কর্মস্থল ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কিন্তু আগরতলায় দুজনের বাড়িতেই দুজনের যাতায়াত, দেখা সাক্ষাত আছে। পরস্পরের ভাব বিনিময় তো আছেই।

একদিন ছুটির দিনে মৃগাঙ্কের বাড়ি গেলাম। অনেক প্রসঙ্গেই কথাবার্তা ভাব বিনিময় হয়েছিল। তার পর আমাকে বলল, তুই রানিরগাঁও স্কুলে কেমন আছিস্?

— ভালই তো, তবে পরিশ্রম বেড়েছে। শিক্ষকতাও করছি আবার সকাল বিকাল পুরো দুই স্কুলেরই এস্টাব্লিশমেন্ট সেকশান-এর সমস্ত কাজও করছি।

— কেন? অফিসের কেরাণিবাবুরা কোথায়?

— আরে, এল ডি সি, ইউ ডি সি কেউ নেই, একমাত্র ক্যাশিয়ারবাবু আর আমিই অফিস সামলাচ্ছি।

প্রধানশিক্ষকও নেই। আছেন অন্য স্কুলের একজন প্রধানশিক্ষক এই স্কুলের ডিডিও।

—এখানে কি "তর বালা-ই অইব" এমন কোন দৈবী প্রভাব ঘটে নি? ঘটলে তো আগরতলায় যেতে পারতিস্।

—কি জানি ভাই, কপালে কি আছে? শুনেছি আমাদের নাকি ডি পি সি হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রমোশন দিয়ে পোস্টিং-এরই বাকি।

—ঠিকই বলেছিস্। আমিও তো চিন্তা করছি। শেষ বয়সে কোন জায়গায় না কোন জায়গায় পেস্টিং দেয়। ত্রিপুরার অনেক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলই ত প্রধানশিক্ষকও সহ-প্রধানশিক্ষক শূন্য।

— মৃগাঙ্ক দেখ, এই শেষ বয়সে ধারেকাছে হলে একটু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতাম।

—আরে তোর কাছেধারেই হবে। তোর ওপর তো আবার দৈবী প্রভাব আছে।

— কি জানি, ত্রিপুরার কোন্ প্রত্যন্ত অঞ্চলে জানি প্রমোশন দিয়ে পাঠায়! এই সময় সেই মণিপুরি বুড়িমার মুখটি চোখে ভাসছে। তাকে আগরতলায় আর দেখা যায় না কোথাও! এই শেষ বয়সে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হতে লাগলো। তাঁর "তর বালাই অইব" কথাটা ভুলি নি। কে জানে অন্য কোনরূপ নিয়ে দেখা দেবে কিনা। তাই বুড়িমাকে মনে মনে প্রণাম জানালাম। এই কারণে যে, আমার চাকুরি জীবনটা তো ভালই কাটালাম; চারপাঁচ বছর আর চাকুরি আছে। এই শেষ সময়টা ভাল যাবে কিনা সে চিন্তায়ই আমি শুধু করছি।

—হারে পরাশর, তোর রানিরগাঁও স্কুলেরও নাকি কি একটা কাহিনি বলবি বলেছিলি?

—ও হ্যাঁ, দেখ, নিজের কথা ভাবতে ভাবতে ঐ কাহিনিটির কথাই ভুলে গেছি। বলছি শোনঃ

অফিসিয়াল করেসপনডেন্স (যোগাযোগ) আমাকে করতে হয় বলে আমাদের স্কুলেরই একজন চতুর্থ শ্রেণির মহিলা কর্মচারী, নাম আরতি সেন, আমাকে বলল, স্যার, আজ সাত বছর চলছে আমার সার্ভিসবুকটা ডাইরেক্টরেট থেইক্যা কোনখানে চইল্লা গেছে বইল্লা আমায় গ্রেডেশনও হয় না, আর আমি প্রতিবছর বেতনের ইনক্রিমেন্টও পাইনা!

—তুমি স্যারের (প্রধানশিক্ষকের) কাছে লিখিতভাবে জানাওনি?

—লিখিতভাবেই জানাইছি, স্যার। কিন্তু আজ সাত বছর চলছে কোন কাজ হয় নাই।

—ঠিক আছে, তুমি আর একটা দরখাস্ত লিখে স্যারকে (প্রধানশিক্ষককে) দিয়ে ফরওয়ার্ড করে আমার কাজে দাও। দেখি আমি কি করতে পারি।

মহিলাটি কাঁদো কাঁদো সুরে আমাকে বলল, স্যার, যেভাবেই হোক আমার সার্ভিস বুকটা আনাইয়া দেন, আর আমার গ্রেডেশান পাওয়ার ব্যবস্থা করাইয়া দেন, যাতে প্রত্যেক বছর আমি ইনক্রিমেন্ট পাই। ঠাকুর আপনার মঙ্গল করবো।

—আরে কাঁদছো কেন? এটা তো স্কুল অফিসেরই কর্তব্য। আমি যখন আছি যেভাবেই হোক লেখালেখি করবো, তাতে তোমার সার্ভিসবুকও আসবে, আর তোমার গ্রেডেশনও হবে এবং তুমি ইনক্রিমেন্টও পাবে।

—স্যার, এইভাবে আমারে কেউ কয় নাই, এই ভাবে সাহসও দেয় নাই। স্যার, এই স্কুল থেইক্যা আমরা পাঁচজনে একই সমানে গ্রেডেশনের লাইগ্যা সার্ভিসবুক সহ দরখাস্ত করছিলাম, বাকি চারজনই সব কিছু পাইছে। আমি এখনও কিছুই পাই নাই!

—সব কিছুই হবে। একটু ধৈর্য ধর।

মৃগাঙ্ক পরাশরকে বলল, ঐ মহিলার সার্ভিসবুকটা কি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল?

—নিশ্চয়ই, তবে অনেক লেখালেখি করতে হয়েছে ডাইরেক্টরেটে। কোত্থেকে সার্ভিসবুকটা আসলো জানিস্? সেই কমলপুর মাদ্রাসা হাইস্কুল থেকে এসেছে। সার্ভিসবুকটা আসার পর ডাইরেক্টরেটে আবার করেসপন্ডেন্স করে আরতি সেনের গ্রেডেশান সহ ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

—সত্যিই তুই পারিস্ বটে।

— দেখ্ মৃগাঙ্ক, স্টাফকে ভালবাসলে সবকিছুই পারতে হয়।

—ঠিক আছে। শুনেছিস্ পরাশর প্রমোশনের লিষ্ট নাকি বেরিয়ে গেছে? গতকাল পর্যন্ত দেখলাম, আমাদের বীরেন্দ্রনগর স্কুলে প্রমোশনের কোন কাগজ আসেনি।

—আমাদের রানিরগাঁও স্কুলেও না। আগামীকাল তো সোমবার হয়তো আসতে পারে। গল্প করতে করতে রাত্র হয়েছে বলে মৃগাঙ্ককে গুড্নাইট জানিযে নিজবাড়ি কলেজটিলা চলে এলাম।

পরদিন সোমবার স্কুলে গিয়ে দেখলাম, এডুকেশান অফিস থেকে অনেক চিঠিত্র এসেছে। একটি লেফাফা খুলেই দেখলাম, আমাদের প্রমোশনের লিস্ট। এই লিস্টে মৃগাঙ্কও আছে। ওর পোস্টিং রানিরবাজার দুর্গাচৌমুনী পাড়া হাইস্কুলে। আর আমার পোস্টিং প্রতাপগড় ঋষি কলোনীতে। প্রতাপগড় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

চাকুরি জীবনের শেষ পোস্টিংটা ভালই হলো। আমার বাড়ি থেকে — হাঁটাপথে ১৫/২০ মিনিট; আর বাইকে ৬/৭, মিনিট।

নৃপেন রায়

পরিহাস

তারিখটা ছিল বেশ কয়েক বছর আগের পয়লা জুলাই, আমাদের জুন মাসের বেতন পাবার দিন। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও আমি আমার বাসস্থান থেকে বাইসাইকেল চেপে, নয় কিলোমিটার দূরে আমার কর্মস্থল, শহরের এক সরকারি অফিসে কাজ করতে আসি। সেদিন অফিস ছুটির কিছুক্ষণ আগে, প্রায় সাড়ে চারটে থেকে চারপাশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। বাইরে তাকিয়ে দেখি, পুরো আকাশ কাল মেঘে ঢেকে গেছে, প্রকৃতিতে জোরালো ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করে, আমার শহরবাসী সহকর্মীরা বেতন নিয়ে অফিস ছুটির সাথে সাথে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু বাড়ি দূরে বলে, আমার পক্ষে তা আর সম্ভব হয়নি। আমি মাইনের টাকাটা পকেটে পুরে, প্রাকৃতিক পরিস্থিতি কিরূপ-দাঁড়ায় দেখতে অফিসেই বসে থাকি। আমার সাথে আমাদের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নরেশও বসে থাকে। অফিসের নাইটগার্ড এলে, নরেশের বাড়ি ফেরার কথা। অফিস ছুটির মিনিট দশেকের মধ্যেই বজ্র-বিদ্যুৎ সহ জোর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায় এবং তা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। প্রবল বর্ষণের পর,প্রায় সাতটা নাগাদ বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমে।

আমাদের অফিস দালানের দোতলায়। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দাঁড়িয়ে, আমি জানালা দিয়ে বাইরে বৃষ্টি পড়ার পরিমান দেখতে থাকি। এক সময় নিচে সিঁড়িকোঠায় অফিসের নাইটগার্ড, হারাধনের পরিচিত কণ্ঠে জোরে জোরে কথা বলতে শোনা গেল। ওপরে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট শুনতে পাই, হারাধন কোন একজনকে বলছে, তুমি কে? তোমার বাড়ি কোথায়? দুর্যোগপূর্ণ সন্ধ্যায় শহরে লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। আর এ অবস্থায় তুমি কিনা ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছ। অবস্থা বিচার করে তোমাকে তো সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না! কোন বদ্ মতলব নিয়ে কি আজ বেতনের দিনে ঘর থেকে বেরিয়েছ?

হারাধন অতসব বলার পর অনুচ্চ মেয়েলি কণ্ঠে কিছু বলতে শোনা গেল, যা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই ব্যাপারটা কি জানতে আমি নরেশকে ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে সিঁড়িকোঠায় নেমে আসি। দেখলাম, প্রায় বছর বিশেকের সুন্দরী একটি মেয়ে জড়সড় হয়ে হারাধনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার চাহনিতে সংকোচ, শংকা ও বিষণ্ণতার ছাপ। কাঁধে ঝোলানো জিনিসপত্র রাখা একটি কাপড়ের ব্যাগ।

আমিও মেয়েটির কাছে তার সম্পর্কে জানতে চাই। যে কম্পিত কণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে আমাকে বলে, আমার নাম জয়শ্রী বিশ্বাস। এখান থেকে বহু দূরে, উনকোটি পাহাড়ের পাদদেশে গঙ্গাছড়া গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ি। আ—মি....

এ পর্যন্তই, এর বেশি আর কোন কিছু মেয়েটি বলতে পারল না। আমাদের চোখের সামনে সে অস্বাভাবিকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকে। আমরা লক্ষ্য করি, তার ঠোঁট ও পা কাঁপতে আরম্ভ করে, চোখ দু'টিও ক্রমশ বুজে আসতে থাকে।

এ অবস্থায় হারাধনকে এগিয়ে গিয়ে ধরতে বলি। কিন্তু আমার বলার পরমুহূর্তেই, আমাদের

কোন কিছু করার বিন্দুমাত্রও সময় না দিয়ে সে হঠাৎ করে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। ঘটনার এরূপ আকস্মিককতায় আমরা বিচলিত ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাকে মেঝে থেকে উঠিয়ে সিঁড়ির পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসাতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারলাম না। কারণ মেয়েটি পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। চোট লেগে তার কপাল থেকে রক্তও ঝরতে থাকে। তার এরূপ অবস্থায় আমরা তাকে আবার মেঝেতেই শুইয়ে রাখি। দৌড়ে গিয়ে অফিস থেকে একটা ফাইলকভার ও জল এনে আমরা তার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেই, তাকে বাতাস করতে থাকি। কিন্তু এসব করে আমরা মেয়েটির জ্ঞান ফিরাতে পারলাম না। তখন বাধ্য হয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব বলে স্থির করি। ইতিমধ্যে বৃষ্টিও থেমে যায়, অনায়াসে ট্যাক্সিও একটা পেয়ে যাই। নরেশকে অফিসে রেখে হারাধন আর আমি মেয়েটিকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছি। তাকে ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে শুইয়ে রেখে কর্তব্যরত ডাক্তারবাবুকে রোগিনী সম্পর্কে সামান্য যতটুকু জানি, বললাম। ডাক্তার বাবু রোগিনীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে, প্রেসক্রিপশন লিখে এবং আমাদের দু'জনের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। একজন ওয়ার্ডবয় মেয়েটিকে স্ট্রেচারে শুইয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট করা ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। সাথে সাথে আমরাও যাই। ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু এবং সিস্টারদের, ওঁরা মেয়েটিকে সিটে শোয়ানোর পরক্ষণেই তার চিকিৎসা আরম্ভ করে দেন। উদ্বিগ্ন হয়ে একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর আমরা দেখতে পেলাম, চিকিৎসায় ভাল সাড়া দিয়েছে, রোগিনী চোখ মেলে তাকিয়েছে। তাতে খুশি হয়ে তার সাথে কথা বলতে এগিয়ে যাই। কিন্তু সিস্টাররা তখনই আমাদের কথা বলতে দিলেন না। এক সময় মেয়েটিকে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে দেখে আমরা হাসপাতাল ত্যাগ করি।

হাসপাতাল থেকে দ্রুত অফিসে ফেরার পথে, অপ্রত্যাশিত এই ঘটনাটি নিয়ে আমরা নিজেদেব মধ্যে কথা বলি। মেয়েটি সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পারলাম না বলে, আমাদের উভয়েব মনেই নানা রকম প্রশ্ন দেখা দেয়। কথা বলে আমরা স্থির করি, পরদিন রোগীর সাথে দেখা করার নির্দিষ্ট সময়ে আমরা উভয়ে হাসপাতালে গিয়ে, মেয়েটির সাথে কথা বলে, তার সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

কথা অনুযায়ী আমরা পরদিন বিকেল চারটে নাগাদ হাসপাতালে মেয়েটি, অর্থাৎ জয়শ্রীর কাছে যাই। আমাদের দেখে সে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসে, হাতজোড় করে নমস্কারও করে। তাতে বুঝতে পারি, সামান্য সময়ের জন্য দেখলেও সে আমাদের চিনতে পেরেছে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আজ কেমন আছ?

ভাল আছি, বলে সে উত্তর দেয়। মাথাটা কিছু নুইয়ে সে লাজুকের মত আবার বলে, গতকাল আপনাদের উটকো এক ঝামেলায় ফেলে আমি খুবই লজ্জিত ও দুঃখিত। সকাল বেলা শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, এই আমি, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে অভ্যস্ত একজন রোগী যদি দুর্যোগের মধ্যে আপনাদের সংস্পর্শে না যেতাম, তবে আমার ভাগ্যে খারাপ কতকিছুই না ঘটে যেতে পারত! গতকাল আপনারা আমাকে রক্ষা করেছেন বলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

এবার তাকে আমি বলি, তোমার সম্পর্কে গতকাল তো তেমন কিছুই বলতে পারলে না। এখন যদি বল, তবে এ ব্যাপারে আমাদের মনে যে ঔৎসুক্য আছে, তা দূর হতে পারে।

আমাদের কথা শুনে জয়শ্রী গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপব নিচের দিকে

তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে, আমি চূড়ান্ত ভাগ্যহীনা এক সদ্যবিধবা।

আমি শিশুকালে মাকে হারিয়েছি। মার মৃত্যুর পর বাবার বিশেষ যত্ন ও স্নেহ ভালবাসায় বড় হতে হতে, আমি গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিকও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম বিভাগে পাশ করি। আমার পরীক্ষার ফলে ভীষণ খুশি হয়ে বাবা আমাকে তাঁর প্রিয় বিষয় রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স সহ বি.এসসি. পড়তে আমাদের গ্রামের কাছাকাছি মহকুমা শহরের কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন।

এতটুকু বলে জয়শ্রী ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। কেঁদে ফেলার কারণ আমাদের জানা না থাকা সত্ত্বেও, সান্ত্বনা দেবার মত কিছু কথা বলে আমরা তাকে তার বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে সবকিছু বলতে অনুরোধ করি।

আমাদের কাছ থেকে তাগিদ পেয়ে সে আস্তে আস্তে আবার বলতে শুরু করে, আমার মত অনার্স নিয়ে প্রণব চক্রবর্তী নামে শহরের একটি ছেলেও আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়। সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যথাসময়ে আমাদের ক্লাস চলতে আরম্ভ করে, সময় মত কলেজে আমাদের মাসিক পরীক্ষাও নেওয়া হতে থাকে। পরীক্ষায় প্রণব ও আমি পরস্পরের কাছাকাছি বেশ ভাল নম্বর পেতে থাকি। এক পরীক্ষায় প্রণব একটু বেশি নম্বর পেলে, অন্য পরীক্ষায় আমি বেশি নম্বর পেয়ে যেতাম। এক কথায়, আমাদের পড়াশোনা অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। তবে প্রতিযোগিতাটা আমাদের দূরে ঠেলে দেয় নি, মানসিকভাবে ক্রমশ আমাদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে থাকে। আমরা একে অপরের মেধাও অন্যান্য গুণাবলীকে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করি।

প্রণব চক্রবর্তী সম্পর্কেবলতে গিয়ে জয়শ্রী লক্ষণীয়ভাবে আবেগপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং অনর্গল বলতে থাকে, প্রণব মাঝে মাঝে ছুটির দিনে রসায়নের বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে বাবা ও আমার সাথে আলোচনা করতে আমাদের গ্রামের বাড়িতে আসত। আমরা আলোচনাক্রমে জটিল পাঠ্য বিষয়গুলোকে সহজ করে তুলে বেশ ভালভাবে আয়ত্ব করে নিতাম। তা দেখে আমার শিক্ষক পিতা বলতেন, আলোচনামূলক পড়াশোনা শিক্ষালাভের বিশেষ এক ফলপ্রসূ উপায়। একনিষ্ঠ হয়ে পড়াশোনা করার ফলে আমাদের উভয়ের পড়ার অগ্রগতি বেশ ভালই হতে থাকে। যথাসময়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে আমরা দু'জনেই প্রথম শ্রেণির অনার্স পেয়ে বি.এসসি. পার্ট ওয়ান ও টু পাশ করি।

কলেজে এক সাথে পড়াশোনা করার পাট শেষ হয়ে গেলেও, প্রণব এবং আমার মধ্যে সৃষ্ট মানসিক ঘনিষ্ঠতায় কোন রকম ভাঁটা পড়ে নি, পক্ষান্তরে, আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা দিনে দিনে বাড়তেই থাকে এবং ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে তা এক সময় গভীরতম হয়ে ওঠে। এরকম একটা সময়ে প্রণব একদিন আকস্মিকভাবে আমার কাছে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে বসে। প্রণবের আচমকা প্রস্তাবে প্রথম দিকে আমি চমকে উঠি। তবে একথাও সত্য যে, প্রণবের প্রতি একান্ত অনুরক্ত বলে তার প্রস্তাবে আমি ভীষণ পুলকিতও হই। ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আমরা দু'জন গভীর ভাবে আলোচনা করি। আলোচনাক্রমে স্থির হয়, প্রণব প্রস্তাবটি উত্থাপন করে প্রথমে আমার বাবা এবং পরে ওর মা-বাবার সাথে কথা বলবে।

প্রণবের কাছ থেকে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব শুনে বাবা গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকেন। এক সময় আমাকে তাঁর কাছে ডাকেন, বিয়ের প্রস্তাবে সর্বাগ্রে আমার মতামত

জানতে চান। আমি প্রথমে মৌন থেকে, পরে মাথা নেড়ে প্রস্তাবের পক্ষে আমার সম্মতি জানাই।

আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বাবা প্রণবকে বলেন, তোমরা এখন বয়ঃপ্রাপ্ত। গত তিন বছরের অধিক সময় ধরে তোমরা উভয়ে উভয়কে জেনে আসছ। তোমাদের পছন্দ এবং চাহিদা অনুযায়ী বিয়েতে আমার আপত্তি করা তো সঙ্গত নয়। তাছাড়া, আমার বিচার অনুযায়ী তোমাকে আমার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র বলেই আমি মনে করি। কিন্তু বাবা, তোমরা দু'জনের মধ্যে বিয়ে হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা করার মত একটি প্রশ্নে জড়িয়ে আছে ।

এক সময়ের ক্ষমতাবান সমাজপরিচালকদের খেয়াল-খুশিতে গড়া শ্রেণিবিভাজনের বিধানে তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার জয়শ্রীমা শূদ্রকন্যা। তোমার মা বাবা কি তোমাদের অসবর্ণ বিয়ে মেনে নেবেন?

বাবার প্রশ্ন শুনে প্রণব খুব আত্মবিশ্বাসীর মত বলে, আমি মা-বাবার একমাত্র একান্ত আদরের সন্তান। তাঁদের কাছে কোন কিছু চেয়ে আমি কখনো বিফল হইনি। আমার বিশ্বাস, জয়শ্রীকে বিয়ে করতে চেয়েও আমি বিফল হবনা।

আমাদের বিয়ের ব্যাপারে বাবার সম্মতি লাভ করে প্রণব খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে। এরপর অতি আশাবাদী হয়ে এ সম্পর্কে সে তার মা-বাবার সাথে কথা বলে, তাঁদের সম্মতি আদায় করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল হল তার আশার সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতপাতের প্রশ্নে ওর মা-বাবা কোন অবস্থাতেই আমাদের বিয়ের অনুকূলে মত দিতে পারলেন না। মা-বাবাকে বিয়ের ব্যাপারে রাজি করাতে প্রণব চূড়ান্তভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তাতে প্রণব খুব ভেঙ্গে পড়ে। এ অবস্থায় একদিন সে এক উদ্‌ভ্রান্তের মত আমার কাছে ছুটে আসে। নিভৃতে ডেকে নিয়ে আমাদের বিয়েতে মা-বাবার সম্মতি আদায়ের ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার সব কথা আমাকে খুলে বলে। তাতে আমিও ভীষণভাবে আশাহত ও বিমর্ষ হই। বহুদিন ধরে মনের মধ্যে গড়ে তোলা আমার সুখ-শান্তি, হাসি-আনন্দের সাম্রাজ্যটা যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে! কিছুক্ষণের জন্য আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। শেষপর্যন্ত, আমাদের উভয় পরিবারকে অশান্তির জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখতে, নানা কথা বলে প্রণবকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, শান্ত থাকতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। কিন্তু আমার কোন কথা তাকে শান্ত করতে পারল বলে মনে হল না। সে আমার কথা শুধু শুনল, বলল না কিছুই। আমার দিকে একটু সময় অপলক তাকিয়ে থেকে সে সেদিনের মত নিঃশব্দে চলে গেল।

বিয়ের ব্যাপারে প্রণবের মা-বাবার অমতের কথা আমি বাবাকে জানালাম। শুনে বাবাও ব্যথিত হন, আর আমাকে প্রবোধ দিয়ে স্মিতমুখে বলেন, দুর্ভাগ্য এই দেশের। মানবসভ্যতার এত অগ্রগতির দিনেও , আমাদের সমাজের অনেকেই বর্ণবৈষম্যের অভিশাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে পারছেন না। আজকের দিনেও জাতপাতের নামে সমাজে অমানবিক কত কিছুই না ঘটছে! এসব দেখে শুনেও আমাদের মধ্যে সঠিক চেতনা সৃষ্টি হচ্ছেনা, আমরা সদসৎ বিচার করে এগিয়ে যেতে পারছি না। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থেকে সমাজের বুকে শুধু অমঙ্গলকেই ডেকে আনছি।

কয়েকদিন পর প্রণব আবার এসে, আমাকে তার সাথে আমাদের বাড়ির কাছে, দেশের বিখ্যাত দেবস্থান, উনকোটি পাহাড়ে বেড়াতে যেতে বলে। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের খাতিরে আমি তার প্রস্তাবটি উপেক্ষা করতে পারলাম না। আমরা দেবস্থানটিতে যাই, সেখানকার শিব-পার্বতীকে প্রণাম করি।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়নোর সাথে সাথে প্রণব চূড়ান্ত বেপরোয়া এক কান্ড করে বসে, শিব-পার্বতীর সামনে হঠাৎ করে সে আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। ওর আকস্মিক আচরণে আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। তার এরকম দুঃসাহসিক কাজের ফলে, মা-বাবার সাথে সংঘাত অনিবার্য মনে করে, অনেকটা বিচলিত হয়ে পড়ি, ঘাবড়ে যাই। তবে বিহ্বলতার মধ্যেও দীর্ঘদিন ধরে লালিত আমার আকাঙ্খা প্রণব পূর্ণ করল বলে, আমি খুব আনন্দিত হই। সাথে সাথে প্রণবকে পরম বিশ্বস্ত সুহৃদ ও জীবনসাথী বলে ভাবতে থাকি।

আমার বিহ্বলতা লক্ষ্য করে প্রণব বলে, আমরা বিয়ে করে কোন রকম অন্যায় করিনি। তাই আমাদের ভয় পাবার বা ঘাবড়ে যাবার মত কোন কারণ থাকতে পারে না। থাকা এবং খাওয়া পরার ব্যাপারেও আমাদের চিন্তা-ভাবনা করার কিছু দেখিনা। তুমি তো জানই যে, ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে আমি মাসে বেশ ভালই রোজগার করি। এ রোজগারেই আমরা অনায়াসে জীবন যাপন করতে পারব। প্রয়োজন মত খরচ করে ইতিমধ্যে আমি কিছু সঞ্চয়ও করে রেখেছি। তাছাড়া তোমার একথাও জানা যে, সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, আমাদের মত চাকরি প্রার্থীদের দাখিল করা জব-ফরম -এর ভিত্তিতে, কয়েক মাসের মধ্যেই বহু সংখ্যক বিজ্ঞান শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে। সরকার প্রয়োজন ও মেধাভিত্তিক সেরকম নিয়োগনীতি নির্ধারণ করেছেন বলে শুনতে পাই। তাতে আমরা চাকরিও পেয়ে যাব। ফলে জীবন যাপনের ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করার কিছু নেই।

প্রণবের কথা শুনে আমি আমাদের বসবাস করার স্থান এবং আমাদের বিয়ের ব্যাপার গোপন করে দীর্ঘসময়ের জন্য নিজ নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলে, আমার বাবা এবং শ্বশুর-শাশুড়ির মনে যদি সন্দেহের সৃষ্টি হয়? তা হলে? এ সম্পর্কে প্রণবের কাছে জানতেও চাইলাম। এবং এই বিরক্তিকর ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে আপাতত আমরা শহরে থাকবনা, বললাম।

প্রণব বলল, তোমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম , হরিপুরের বাসিন্দা, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণের মাধ্যমে তার বাড়ির কাছে আমাদের ভালভাবে থাকার মত ঘরভাড়া করেছি। সংসার করতে প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্রও সেখানে কিনে রেখেছি। এখান থেকে ফিরে আমরা ভাড়া করা বাড়িটিতে সাময়িকভাবে বসবাস করতে থাকব। হরিপুরে পৌছেই আমাদের ঠিকানা ও বিয়ে করে ফেলার খবরটা অরুণের মারফত মা-বাবা এবং শ্বশুর মশায়কে জানাব।

সাইকেল চেপে হরিপুর থেকে সামান্য দূরে শহরে গিয়ে পড়াতে ও অন্যান্য কাজকর্ম করতে আমার মোটেই অসুবিধে হবে না। আমার অনুমান, হরিপুরে আমাদের বেশি দিন থাকতে হবে না। তাঁদের স্নেহার্দ্রতার গুণে ,মা-বাবা কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের জন্য কাতর হয়ে পড়বেন। তখন আমাদের প্রতি তাঁদের অসন্তোষ ও বিরক্তি দূর হয়ে যাবে এবং মন থেকে অসার- সামাজিক কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাঁরা আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাবেন। তোমার স্বভাবসিদ্ধ মানবিক গুণসমৃদ্ধ আচরণে মুগ্ধ হয়ে, মা-বাবা আমাদের নিয়ে সুখ-শান্তিতে দিন কাটাতেও থাকবেন। কাজেই মা-বাবাকে নিয়েও তুমি বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না।

প্রণবের পরিকল্পনা মত হরিপুরে গিয়ে আমরা, স্বামী-স্ত্রী সংসার জীবন আরম্ভ করি। প্রবল এক মানসিক চাপ থাকলেও আমরা দুজনের দিন মোটামুটি ভালই চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বিয়ের মাস দুয়েক পরেই একদিন আমাদের জীবনে চরম সর্বনাশ

ঘটে যায়। দিনটি ছিল রবিবার । প্রণব সেদিন আমার পৈতৃক গ্রাম ও হরিপুর সহ আশপাশের অন্যান্য গ্রামের প্রধান বাজার, শ্যামগঞ্জে বাজার করতে যায়। ওদিকে আমার বাবাও বাজার করার উদ্দেশ্যে শ্যামগঞ্জে যান। বাজার যখন জোর জমে উঠে, খুব বেচা-কেনা আরম্ভ হয়,' তখন হঠাৎ করে আমাদের রাজ্যের বর্তমান অভিশাপ, জাতিদাঙ্গায় অভ্যস্ত এক উগ্র পন্থী দল, সকলকে হতবুদ্ধি করে আমাদের শহরও নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পের নিকটবর্তী শ্যামগঞ্জ বাজারে হানা দেয়। এরা যথেচ্ছভাবে গুলি করে বেচা-কেনা করতে ব্যস্ত নিরপরাধ বহু লোককে খুন -জখম করে। এরপর লুটপাট করে খুব ক্ষিপ্রতায় নিরাপদে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। এ মর্মান্তিক ঘটনাটিকে তো দেশের সব প্রচার মাধ্যমই ভালভাবে প্রচার করেছে। ঘটনাটি জেনে নিরাপদ অবস্থানে বেশ স্বচ্ছন্দে থেকে, দেশের বহুল পরিচিত 'জনসেবক'- রাও নিষ্ফল বিলাপ-প্রলাপ ও আস্ফালন করেছেন। আপনারাও নিশ্চয়ই এসব জানেন।

সর্বনাশা নরপিশাচের দল অন্যান্যদের সাথে বাজার করতে ব্যস্ত আমার স্বামী এবং বাবাকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। নরখাদকরা এভাবে আমার সিঁথির সিঁদুর ও হাতের শাঁখার বিলুপ্তি ঘটায় এবং আমাকে সর্বস্বান্ত করে। স্বামী এবং বাবাকে হারিয়ে আমি এক অদ্ভুত রোগেও আক্রান্ত হয়ে পড়ি। এখন একটু উদ্বেগপূর্ণ কোন কিছুর সম্মুখীন হলেই আমার বুক কাঁপতে থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হতে আরম্ভ করে এবং শেষপর্যন্ত আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

স্বামী ও পিতৃহারা হয়ে গঙ্গাছড়া বা হরিপুরে বসবাস করা আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। আপনাদের শহরের কাছে, গকুলনগরে আমার এক মাসির বাড়ি। মাসি-মেসো আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন, আমার বর্তমান অসহায় অবস্থায় ওঁদের বাড়ি চলে যেতে, ওখানে থেকে করণীয় কাজকর্ম করতে। আমিও নিরাপদ থাকতে মাসির বাড়িতেই চলে যাব বলে ভাবছি। গঙ্গাছড়ার পৈতৃক বাড়ি-ঘর ও অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে মাসি মেসোর সাথে কথা বলে, আমার গকুলনগরে চলে যাবার প্রস্তুতি নিতে, গতকাল হরিপুর থেকে বাসে চেপে প্রায় দশ ঘন্টায় এখানকার মোটরস্ট্যান্ড-এ এসে নামি। মাসির বাড়ি যেতে আবার বাস ধরতে শহরে হেঁটে চলার পথে আমি প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে যাই। এ অবস্থায় এদিক-ওদিকে তাকিয়ে আপনাদের অফিসের সিঁড়ি ঘরটিকে খোলা অবস্থায় কাছাকাছি দেখতে পাই এবং নিজেকে ঝড়-বৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা করতে আমি সিঁড়ি ঘরটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। দাদারা বিশ্বাস করুন, কোন বদ্ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনাদের অফিসে প্রবেশ করি নি।

জয়শ্রীয় সব কথা শুনে, হারাধন নির্বাক অবস্থায়, মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। সমবেদনায় আমার মনটাও ভাবাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে রোগীর সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট দু'ঘন্টা সময় শেষ হয়ে যায়। ফলে, কথা শোনা বা বলাও শেষ করে, ধীরে ধীরে, ভাবাবিষ্টের মত আমাদের হাসপাতাল ত্যাগ করে চলে আসতে হয়।

চন্দ্র-সূর্যের কথা

চন্দ্র দাস প্রত্যন্ত গকুলনগর গ্রামের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বাসিন্দা। স্ত্রী, কন্যা মঙ্গলা এবং বয়সে অনেক ছোট ভাই সূর্যকে নিয়ে তাঁর ছোটখাটো সংসার। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি চাষ করেও করিয়ে ওঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন। সূর্য পাশের গ্রামের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। গকুলনগরে প্রাইমারি স্কুলের বেশি নেই বলে, মঙ্গলা আর পড়তে পারে নি।

চন্দ্র দাস কিছু লেখাপড়া জানেন। তিনি বলিষ্ঠ, তেজস্বী ন্যায়পরায়ণ এবং জনদরদী। গ্রামে অন্যায়-অবিচারের কোন ঘটনা ঘটলে এবং তার প্রতিকারে সাহায্য করতে ডাক পেলে, চন্দ্র সর্বাগ্রে এগিয়ে যান। তাঁর ন্যায়-নীতি বোধ ও জনসমর্থনের জোরে তিনি পক্ষপাতশূন্য হয়ে ঘটনাটির সুবিচার করে ফিরে আসেন। গ্রাসবাসীরা তাঁদের অন্যান্য প্রয়োজনেও তাঁর কাছে সাহায্য দাবী করেন। চন্দ্রও সেসব দাবী পূরণে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। তাঁর এসব গুণাবলীর জন্য গ্রামের মানুষ চন্দ্রকে অন্তর থেকে ভালবাসেন, যথেষ্ট সমীহও করেন।

যথাসময়ে সূর্যও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে। সঠিক সময়ে চন্দ্র সূর্যকে নিয়ে তাদের রাজ্যের রাজধানী শহরে যান। ভাইকে সেখানকার এক কলেজে ভর্তি করিয়ে, হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এক সুপাত্রের সাথে মঙ্গলার বিয়ে হয়ে যায়। পাত্র বাবার খেত-খামারের কাজ দেখাশোনা করে।

স্বভাবচরিত্রে সূর্য অনেকটা দাদা চন্দ্র দাসের মতই। পড়াশোনা, খেলাধূলা এবং অন্যান্য করণীয় কাজকর্মেও সে খুব আন্তরিক। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে -অল্প দিনের মধ্যেই সূর্য কলেজে বেশ পরিচিতও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সূর্যের কলেজের ছাত্রসংসদ-এক রাজনৈতিক দলের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ছাত্র সংগঠনের দখলে। ছাত্রসংসদের নেতৃস্থানীয়রা সূর্যের আচার-আচরণও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়, তাকে তাদের সংগঠনের স্বার্থে, নিজেদের মধ্যে পেতে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে ওরা সূর্যের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে তৎপর হয়।

একদিন কলেজে ক্লাস নেই, এমন এক পিরিয়ডে, ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি অন্য কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সহ সূর্যের কাছে যায়, তাকে বলে, গত কিছুদিন ধরে তোমার রুচিসম্মত চলাফেরা লক্ষ্য করে তোমাকে বুদ্ধিমানও সচেতন বলে আমাদের মনে হয়। তাতে আমাদের বিশ্বাস, তুমি দেশের চলমান দুরবস্থা সম্পর্কেওয়াকিবহাল। তবুও বলি, দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত এত বছর পরেও সাধারণ মানুষের অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মত মৌলিক চাহিদা পূরণে শাসকগোষ্ঠীর কোন আগ্রহ নেই। শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা যে যেভাবে পারেন, নিজেদের শ্রীবৃদ্ধিতেই ব্যস্ত। দেশের কোটি কোটি মানুষ আজো অনাহার-অর্ধাহার এবং ভগ্নস্বাস্থ্যে দিন কাটাচ্ছেন, শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে আছেন। জনকল্যাণকর সব কাজে শাসকদলকে বাধ্য করতে আমরা আন্দোলন করে আসছি। আমরা আশাবাদী যে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনেই ব্যভিচারী শাসক দলটিকে ক্ষমতাচ্যুত করে আমরা সুষ্ঠুভাবে আমাদের রাজ্য পরিচালনা

করতে আরম্ভ করব। আমরা অনুরোধ করি, তুমিও আমাদের সংগঠনে যোগ দিয়ে দেশের, দশের কল্যাণে সাহায্য কর। দাদার মতামতের কথা ভেবে এবং নিজেও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সূর্য তৎক্ষনাৎ জেনারেল সেক্রেটারির প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নিতে পারেনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে বসে থাকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তার কাছে আগত সবার পীড়াপীড়িতে সূর্য ছাত্রসংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে।

কিছুদিন পর থেকেই সূর্যকে তাদের সংগঠনের কাজকর্মের দায়দায়িত্ব দেওয়া হতে থাকে। সূর্যও যথাযথভাবে তা পালন করে পারদর্শী হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। একই সাথে সময়মত পরীক্ষা দিয়ে সে একদিন ভালভাবে বি.এ. পাসও করে ফেলে। সূর্যের কাছ থেকে এ সুখবরটি জেনে দাদা-বৌদি, গ্রামবাসীরা এবং সব আত্মীয়-বন্ধু ভীষণ খুশি হয়। বিশেষ করে দাদা-বৌদি, আনন্দে অভিভূত হয়ে নানা রকম সুখের স্বপ্ন দেখতে শুরু কবে দেন।

বি.এ. পাস করে সূর্য বাড়ি যায়। দাদা-বৌদি, আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীর সাথে কিছুদিন মনের আনন্দে কাটিয়ে সূর্য আবার রাজধানী শহরে ফিরে আসে। বয়স্ক হয়ে পড়া দাদাকে চাষবাসের কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে এবার সে একটি চাকরি যোগাড় করতে তৎপর হয়। ছাত্র সংগঠন এবং তার পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দলের পরিচিত নেতারা সূর্যর কাছ থেকে তার এসব চিন্তা-ভাবনার কথা জানতে পারেন। এসব নেতারা সূর্যের কলেজ জীবনের অতীত সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা করে ভাবতে থাকেন, সূর্যকে একটা চাকরি ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে যদি আমরা আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত করে নেই, তবে সে একদিন দলেব পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। এরকম ভাবনার ফলশ্রুতিতে নেতারা একদিন সূর্যকে তাঁদের দলীয় পত্রিকা অফিসে একটি চাকরি দেবার প্রস্তাব করেন।

সূর্য খুশিমনে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নেয়। পরদিন থেকেই সে মনেপ্রাণে কাজ করতেও আরম্ভ করে দেয়।

পত্রিকা অফিসে কাজ করতে থাকার সাথে সাথে সূর্যকে রাজনৈতিক তালিমও দেওয়া হতে থাকে। তার বিশেষ বুদ্ধিমত্তা, আচার-আচরণ , কর্মকুশলতাও বাচনভঙ্গির গুণে দিনে দিনে দলীয়ভাবে সূর্যর ক্রমোন্নতি হতে আরম্ভ করে। একান্তভাবে নির্ধারিত কাজ করে যাওয়ার ফলে অল্প কয়েকটি বছরেই নেতাদের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, সে সত্যি সত্যিই এক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য যুবনেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসভার মঞ্চে সাবলীলভাবে, শ্রুতিমধুর ও উদ্দীপ্তকারী ভাষায় জন-স্বার্থযুক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করে এবং শাসককুলের জনবিরোধী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে ইতিমধ্যে দলের পক্ষে সে এক দক্ষ কারিগর রূপে খ্যাতি লাভ করে। সূর্য এখন আর পত্রিকা অফিসের কর্মচারী নয়, সর্বক্ষণের অতি ব্যস্ত এক পেশাদার রাজনীতিবিদ, রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

সূর্যের রাজনৈতিক উত্থানের সময়টাতে দেশের সার্বিক পবিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। দেশটা গনতান্ত্রিক হলেও বহু বছর ধরে কেন্দ্র এবং প্রায় সব কয়টি রাজ্য তখন একই দলের শাসনাধীন থাকার অবস্থাটাকে বিশেষ এক সুযোগ বলে গণ্য করার ফলে একটা সময় থেকে শাসকদল দেশে ও দেশবাসীর সেবা করা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে ক্রমশ স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে শুরু করেন। স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাবানরা দেশের আইন-কানুনকে জলাঞ্জলি দিয়ে নানারকম আর্থিক

কেলেঙ্কারি, স্বজনপোষণ ,সাধারণ মানুষকে উপেক্ষা, ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা, দমন-পীড়ন ইত্যাদিকে অবলম্বন করে দেশ পরিচালনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসনে তাঁদের অনীহা বা ঔদাসীন্য এবং খামখেয়ালীপনা, দেশে বিরাজমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, সাধারণ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস বেড়েই যেতে আরম্ভ করে। ফলস্বরূপ দেশের সাধারণ মানুষের ক্ষোভও ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠতে থাকে। এসবের মধ্যে বিরাট বিস্ফোরণের মত এক ঘটনা ঘটে, শাসক দলের প্র ধানের নির্বাচিত হওয়া এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাকে আদালত অগণতান্ত্রিক ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাটি দেশবাসীর ক্ষোভ রূপ আগুনে ঘৃতাহুতির মত ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে দিকে দিকে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এক সময় দেশের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল এক সুরে একতাবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। কালক্রমে সারা দেশে উত্তাল গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। সকল দেশবাসীর কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য নারায়নজীর নেতৃত্বে এ আন্দোলন দিনে দিনে তীব্র থেকে তীব্রতর এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তীব্রতম রূপ ধারণ করে। আন্দোলনের জঙ্গীরূপ শাসককুলের হৃৎকম্প সৃষ্টি করে, এমন কি অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করে তোলে।

অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার মত অবস্থায়, শাসকদলের প্রধান, তাঁর স্বীকৃত ক্ষমতাবলে দেশ শাসনের সংশ্লিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে, দেশে এক কড়া আইন জারি করান। এই আইনে দেশে সরকারবিরোধী সব রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। আইনটিকে মারণাস্ত্র রূপে ব্যবহার করে, সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বা কাল্পনিক সব অভিযোগ এনে, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করিয়ে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। তার দলের প্রথম সারিব নেতাগণ সহ সূর্যকেও ভুয়া অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে রক্ষীবাহিনী অতিমাত্রায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে। রক্ষীরা যাঁদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন, তাঁদের বিনা বিচারে নিপীড়ন মূলক বিশেষ এক পরিস্থিতিতে জেলে বন্দি কবে রাখতে থাকেন। তাতে গ্রেপ্তারকৃত অনেকে নানারকম অসুখে-ভুগতে আরম্ভ করেন, এমন কি কেহ কেহ মৃত্যু মুখেও পতিত হন। আরো মারাত্মক ব্যাপার, রক্ষীদের উপর হামলার অজুহাতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ধৃত কোন কোন নেতা-কর্মীকে গুম কর ফেলার কথাও প্রায়ই শোনা যেতে থাকে। রক্ষীবাহিনীর চরম সন্ত্রাসমূলক,কর্মতৎপরতায় সৃষ্ট নিদারুণ সংকটজনক অবস্থার মধ্যেও, সূর্য এবং তার দলের রাজ্যস্তরের শীর্ষনেতা, দীপ্তিবাবু সহ বিরুদ্ধবাদীদের কেহ কেহ সুকৌশলে গ্রেপ্তারি এড়াতে সক্ষম হন এবং বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে আত্মগোপন করে থাকতে আরম্ভ করেন।

বিপজ্জনক আপৎকালীন অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে, আত্মগোপন করে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম সূর্যের দলীয় নেতা-কর্মীরা, তাঁদের বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থায় জড় হয়ে এক জরুরি সভায় বসেন। রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার ফলপ্রসূ উপায় উদ্ভাবনে সহযোগিতা করতে, সভায় প্রত্যেকে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। দীর্ঘ আলোচনাক্রমে স্থিব হয়, আত্মগোপনকারীরা শহরাঞ্চল ত্যাগ করে প্রত্যন্ত গ্রাম ও পাহাড় অঞ্চলে, যেখানে সাধারণত রক্ষীদের আনাগোনা থাকেনা, সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকবেন। কে কোথায় আত্মগোপন করবেন, তাও সভায় নির্ধারণ করা হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলীয় সম্পাদক সূর্যকে বলেন, তুমি এখনই তোমার দাদাকে এই বলে

একটি চিঠি লিখে দাও যে, বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজনে দীপ্তিদা বর্তমান সংকটজনক সময়টা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে তোমদের বাড়িতে কাটাবেন। তোমার দাদা যেন অনুগ্রহ করে, খুব সতর্কতার সাথে দীপ্তিদাকে তোমাদের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করেন।

সূর্য লিখে, দাদা, বৌদি সহ আমার প্রণাম নিবেন। দেশে গণতন্ত্র বিনাশকারী আইন বলবৎ হওয়ার ফলে আমরা, সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা, বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। রক্ষীবাহিনী তাদের আয়ত্তের মধ্যে পেলেই , আমাদের দেশদ্রোহী রূপে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরছে। আমরা কিছুসংখ্যক বিরোধীরা এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার এড়িয়ে রাজধানী শহরেই আত্মগোপন করে আছি। তবে শহরে থাকা আমাদের পক্ষে আর নিরাপদ নয়। আজ আপনাকে লেখা আমার চিঠিখানি নিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতা তথা দেশের সকল বঞ্চিত, উপেক্ষিত, নিপীড়িত জনগণের অবিসংবাদিত প্রতিনিধি,আমাদের প্রধান নেতা দীপ্তিদা , সম্পর্কে আমাদের দূর সম্পর্কের এক সাধু মামাত দাদা সেজে আপনার কাছে যাচ্ছেন। মিথ্যা বা সম্প্রতি চালু করা ভয়ংকর আইনটির পরিপন্থী হলেও, দেশ এবং দেশের স্বার্থে আমাদের অতি প্রিয়, হিতকারী নেতাকে আপৎকালীন সময়টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত , দয়া করে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে আমাদের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করবেন। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে সব সময়ই বিশেষভাবে সজাগ থাকবেন। আত্মগোপন করে নিরাপদে থাকতে আমিও আজই পাহাড় অঞ্চলে এক জায়গায় চলে যাবে। সুযোগ পেলে লোক মারফত আপনাকে আমার খবরাখবর জানাব। আপনাদের সার্বিক কল্যাণ এবং বৌদিও আপনার আশীর্বাদ কামনা করি। ইতি, প্রনত, সূর্য।

দলীয় সিদ্ধান্ত ও চন্দ্র দাসের বদান্যতায় দীপ্তিবাবু গকুলনগর গ্রামে জীবন যাপন করতে থাকেন। সূর্যও দূরে পাহাড় অঞ্চলে তাদের এক সাথীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

দেশ শাসকদের জারি করা কড়া আইনটি প্রথম দিকে শাসকদলের পক্ষে খুব কার্যকরী হয়। সারা দেশে তখন অস্বাভাবিক এক নীরবতা বিরাজ করতে থাকে, তুলনা করলে মনে হয়, এ যেন শ্মশানের নীরবতা। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই শাসককুল ও রক্ষীবাহিনী আইনটিকে তাঁদের খেয়াল চরিতার্থ করার বিশেষ এক সুযোগ বলে ধরে নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের ওপরও বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেন। তাতে জনসাধারণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হতে থাকে। এদিকে-ওদিকে তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।

তার সাথে যুক্ত হয়, মানবাধিকার ধ্বংসকারী মারাত্মক আইনটির প্রত্যাহার করা নিয়ে, অচিরে এদেশে গণতন্ত্র পুনঃস্থাপন করার জন্য শাসকশ্রেণির উপর আন্তর্জাতিক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক শিবিরের বিশেষ চাপ। এসবের ফলে দেশ-শাসকদের মনে কিছুটা শুভবুদ্ধির উদয় হয়। ওঁরা ভাবতে থাকেন, তাঁদের আরোপিত আইনটি যতই ভীতিজনক হউকনা কেন, ক্ষোভের চরম পর্যায়ে মানুষ তা ভঙ্গ করে দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারেন। তখন আইনটি দিয়ে তাঁদের পক্ষে তা সামাল দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করাও দুষ্কর হয়ে উঠবে।

ঘনঘন সভায় বসে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর শাসকরা সাধারণ মানুষের পক্ষে পীড়াদায়ক কঠোর আইনটি বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলীয় প্রধান, নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আইনটি প্রত্যাহার করিয়ে নেন। তাতে জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জেলবন্দি এবং আত্মগোপন করে থাকা বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা, কেহ কেহ সুস্থ,

আবার কেহ কেহ অসুস্থ দেহ-মনে মুক্ত হয়ে বাড়ি-ঘরে ফিরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সূর্য আর বাড়ি ফিরে আসছেনা। তাতে সূর্যের সব আপনজনেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ওঁরা সূর্যের রাজনৈতিক সহযোগীদের সহায়তা দাবি করে, কামনা করে সূর্যকে খুঁজে পেতে মনেপ্রাণে চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সব ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে বিফল থেকে যায়, সূর্যের সন্ধান আর মিলে না।

সূর্যের সন্ধান পেতে চন্দ্র দাসরা যখন গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত, তখন দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সাধারণ নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণা করা হয়। তাতে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা নির্বাচন নিয়ে মেতে উঠেন। সূর্যর ঘরে না ফেরার এবং তাকে খুঁজে বের করে দেবার কথা কার্যকরীভাবে শোনানোর মত সূর্যর দলের কোন নেতা-কর্মীকেই চন্দ্রদাস পান না। চন্দ্রদাস যাঁদের কাছেই যান, তাঁর কথা শোনার পর, তাঁদের সবাই একটু সময় নীরব থেকে তাঁকে কিছু আশ্বাস ও সহানুভূতির বাক্য শুনিয়ে বিদায় করে দেন, কাজের কাজ কিছুই করেন না। অতি যত্নে গড়ে তোলা একান্ত-আদরের ছোট ভাইয়ের খোঁজ-খবর না পেয়ে চন্দ্রদাসের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা দিনে দিনে কাহিল হয়ে পড়তে থাকে। একদিন তিনি যখন জমিতে চাষের কাজে ব্যস্ত, তখন আকস্মিকভাবে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাটিতে পড়ে যান, মূর্ছিতও হয়ে পড়েন। তখন মাঠে উপস্থিত তাঁর অন্যান্য চাষীবন্ধুরা ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে এনে শুশ্রূষা করে। গ্রাম্য পরিবেশে লভ্য সাধারণ কিছু চিকিৎসা করিয়ে মোটামুটি সুস্থ করে তুলেন। তবে এরকম আকস্মিক অসুস্থতার পর থেকে তিনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন। আগের মত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে আর চলাফেরাও কাজকর্ম করতে পারেননা। ফলে সংসারে অনটনও দেখা দিতে থাকে।

প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উত্তেজনার মধ্যে যথাসময়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দমনমূলক কঠোর আইন আরোপকারী দলটি দেশের প্রায় সব কয়টি রাজ্যেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে দেশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের বিজয়ী সদস্যরা সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে দীপ্তিবাবুর নেতৃত্বে সূর্যদের দলও তাদের রাজ্য শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তাতে চন্দ্রদাস ভীষণ উৎফুল্ল হন। ভাইকে খুঁজে পাবার ব্যাপারে খুব আশাবাদী হয়ে উঠেন। মোটেই সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ভাইয়ের ব্যাপারে অতিপরিচিত দীপ্তিবাবুকে তিনি চিঠি লিখেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও তাঁর চিঠির কোন জবাব পেলেন না। পরবর্তী সময়ে আরো দু'টি চিঠি লিখেন। কিন্তু ফল সেই একই, উত্তর আর আসেনা। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে দুর্বল দেহ-মনেই মেয়ের জামাইকে সঙ্গী করে দীপ্তিবাবুর সাথে দেখা করতে ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে, চন্দ্র দাস তাঁর গ্রাম থেকে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অসুস্থতার কারণে, রওয়ানা হওয়ার দিনে পথে যাত্রাবিরতি করেন, পরদিন সকাল নয়টা নাগাদ দীপ্তিবাবুর বিশাল সরকারি বাসভবনের গেট-এ পৌঁছেও যান।

তাঁর লক্ষ্য অনুযায়ী চন্দ্রদাস জামাইকে নিয়ে দীপ্তিবাবুর সাথে দেখা করতে প্রধান ফটক দিয়ে তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করতে উদ্যত হন। কিন্তু পা বাড়াতেই বাধা পান। ফটকে নিয়োজিত রক্ষী ছুটে এসে তাঁদের পথ আগলে বলেন, আপনারা কে? রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তার বাড়িতে ঢোকার নিয়ম-কানুনের কিছুই কি আপনারা জানেন না ? এসব নিয়ম বলবৎ রাখতে নিয়োজিত আমাকে কিছুই না বলে, বেপরোয়া হয়ে বাড়িটিতে ঢুকে পড়তে চাইছেন? সত্যি করে বলুনতো, কী উদ্দেশ্যে বাড়িটিতে, যেতে আপনারা এত আগ্রহী?

চন্দ্রদাস নিজের এবং জামাইর পূর্ণ পরিচয় দিয়ে এবং দীপ্তিবাবুর বাড়িতে যাবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে রক্ষীকে বলেন, আপনার কথা সত্যিই যে, রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তা, জনগণের সবচেয়ে বড় নেতার বাড়িতে প্রবেশ করার এবং তাঁর সাথে কথা বলার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ কোন নিয়ম থাকতে পারে বলে আমরা, গ্রামের মানুষ আগে ভাবতে পারি নি। আমরা মনে করতাম, দীপ্তিবাবু যেহেতু আমাদের অতি পরিচিত প্রিয় নেতা, সেহেতু আমরা প্রয়োজনে তাঁর কাছে গিয়ে অনায়াসেই কথা বলতে পারি। এখন দেখছি, এরকম মনে করাটা একটা ত্রুটি। অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। এবার অনুগ্রহ করে দীপ্তিবাবুর সাথে দেখা করতে যেতে দিন। চন্দ্রদাসের কথা শুনে রক্ষীটি বলেন, প্রধান কর্মকর্তা তাঁর কনভয় নিয়ে বের হবেন। কাজেই গেট-এর সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না, চলে যান। পরে অনুমতি পত্র নিয়ে এসে দেখা-সাক্ষাতের কাজটা সেরে যাবেন। কিন্তু চন্দ্রদাসরা নাছোড়বান্দা, ওঁরা দীপ্তিবাবুর সাথে কথা বলেই যাবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে দীপ্তিবাবুর কনভয়-এর সাইরেন বেজে ওঠে। তা শোনার সাথে সাথে, রক্ষী অতি ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রদাসদের আবার গেট ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কিন্তু চন্দ্রদাসরা চলে যেতে নারাজ। তাতে রক্ষী বিরক্ত হন এবং কিছুটা জোরাজুরি করে তাঁদের সরিয়ে দিতে তৎপর হন, একই সাথে বলতেও থাকেন, এ মুহূর্তে চলে না গেলে, আপনাদের আটক করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে আমি বাধ্য হব।

রক্ষীর এ রকম আচরণ ও কথায় চন্দ্রদাস ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং তার সাথে তীব্র বচসায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু অধিক মাত্রায় উত্তেজনার চাপ তাঁর দুর্বল শরীর সহ্য করতে পারে নি। বাগবিতন্ডা চলতে থাকা অবস্থায় তাঁর পা দু'টি টলতে থাকে, তিনি ঘামতে শুরু করেন এবং কথা বলার ক্ষেত্রেও জড়তা দেখা দেয়। অবস্থাটা লক্ষ্য করে জামাই ছুটে গিয়ে শ্বশুরের দুই ডানায় ধরে কোন রকমে গেট-এর একপাশে, রাস্তার ওপর বসান। বসানোর পর, চন্দ্রদাস আরো বেশি পরিমাণে ঘামতে থাকেন, তার কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়, চোখ দু'টিও ক্রমশ বুজে আসতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় বারের মত পুরোপুরি অচেতন হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে রাস্তার ওপরেই শুইয়ে রাখতে হয়।

চন্দ্রদসের জীবনে এরকম এক ঘটনা ঘটে যাবার পর, পুরো পারিপার্শ্বিক পরিবেশটাকে কাঁপিয়ে আবার সাইরেন বেজে ওঠে। পরক্ষণে দীপ্তিবাবুকে নিয়ে তাঁর দুধসাদা গাড়িটিকে কনভয়সহ দ্রুত বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। গাড়িতে বসে দীপ্তিবাবু গেট-এর সামনে রাস্তার ওপর শায়িত একটি লোকের পাশে আরেকটি লোককে বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পান। দেখতে পাওয়ার পর মুহূর্তেই তাঁর গাড়ি বেশ কিছুটা এগিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলেন। গাড়ি থামলে, তিনি তাঁর পারসনেল সেক্রেটারিকে বলেন, দৌড়ে গিয়ে গেট—এর সামনে শায়িতও বসে থাকা লোক দু'টি সম্পর্কে জেনে এসতো?

পারসনেল সেক্রেটারি রক্ষীর কাছ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে এ সম্পর্কে কিছু জেনে এসে দীপ্তিবাবুকে জানান।

ব্যাপারটা জেনে দীপ্তিবাবু ভ্রূকুঁচকে স্বগতোক্তি করেন, রক্ষীগুলো কোন কাজের নয়। গেট-এর সামনে নাটকের মঞ্চ না বানিয়ে অসুস্থ লোকটাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেই পারত। পরক্ষণে তিনি ড্রাইভারকে আদেশ করেন, তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাও, আমার শহিদ স্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

জীবন সংগ্রাম

বহু বছর আগে, সেই কৈশোরের গোড়ায় আমাকে আমার জন্মস্থান, কৃষ্ণপুর গ্রামটিকে ছেড়ে, ভারতে চলে আসতে হয়। কিন্তু গ্রামটিকে ভুলতে পারি না কিছুতেই। মাঝে মাঝেই জন্মভূমিকে দেখতে যাবার এক তীব্র ইচ্ছে আমাকে তাগিদ দিতে থাকে। এ যেন প্রবাসী স্নেহকাতর সন্তানের দীর্ঘদিন পর মাতৃদর্শনে যাবার তাগিদের মত।

একথা অকপটে স্বীকার্য যে, কাউকে আকৃষ্ট করার মত চাকচিক্যপূর্ণ কোন কিছুই কৃষ্ণপুরে নেই, সেখানে যাতায়াত বা চলাফেরা করাও তেমন সুগম নয়। তবে গ্রামটির নানারকম মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং গ্রামবাসীর সহজ সরল খোলামেলা আচার-আচবণ নিঃসন্দেহে একজনকে আকৃষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। আমার জন্মস্থান সম্পর্কে ধৈর্যশীল পাঠকের মনে মোটামুটি ধারণা সৃষ্টি করতে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

কৃষ্ণপুর গ্রামের চারদিকই পুরোপুরি উন্মুক্ত। গ্রামটির পার্শ্ববর্তী স্থান সমুহের মধ্যে পুব দিকে প্রায় দু'কিলোমিটার খোলা জমি অতিক্রম কবার পর থেকে, পব পর মোড়াকরি, ফান্দাউক, আতোকুড়া, শিমুলগড়, রামহর, সাকুচাইল এবং ছাতিয়াইন ইত্যাদি গ্রাম পার হয়ে বার- তের কিলোমিটার দূরে ছাতিয়াইন রেলস্টেশন। পশ্চিম দিকে প্রায় চার কিলোমিটার ব্যাপী পূর্ণ বর্ষায বিশাল বিশাল ঢেউ-এ ভয়ংকর হয়ে উঠতে অভ্যস্ত মেদিরহাওড়। এরপর থেকে রামপুর, নোযাগাঁও অতিক্রম করে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে গোয়ালনগর লঞ্চ ঘাট। কৃষ্ণপুরের উত্তর দিকে দুই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দূরে সারিবদ্ধ ভাবে সন্তোষপুর, বাধানগর, বামৈ গ্রাম। বামৈ গ্রামটি এক সময়ের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং পরবর্তী সময়ে স্বনামধন্য বৈষ্ণব সাধক, সন্তদাসজীর জন্মস্থান বলে ভারত উপমহাদেশে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জন্মস্থানটির দক্ষিণেও দুই থেকে চার কিলোমিটার দূরে দূরে বুড়িশ্বর, নাছিরনগর, নাছিরপুর গ্রাম।

বর্ষার শেষে আমাদের গ্রাম এবং চারদিকের গ্রামগুলোর মধ্যবর্তী অধিকাংশ জমিতে চাষবাসের কাজ চলতে থাকে। কিছু পরিমাণ সংরক্ষিত জমিতে গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া চরানো হয়। বিভিন্ন রকম কৃষিজাত পণ্য ফলতে থাকা অবস্থায় এবং গৃহপালিত পশুর চরে বেড়ানোর সময় যেসব দৃশ্যাবলীর সৃষ্টি হয়,তা অতি চমৎকার। সাধারণ ফুল-ফলের গাছ এবং নানা জাতীয় পাখির কলকাকলিতে মুখরিত গ্রামের আভ্যন্তরীণ পরিবেশটিও খুব উপভোগ্য। কৃষ্ণপুরের বর্ষাকালীন দৃশ্যটি বড়ই নয়নাভিরাম। পূর্ণ বর্ষায় আমাদের গ্রাম এবং তার চারদিকের গ্রামগুলোর মধ্যবর্তী সমস্ত ফাঁকা জমি গভীর জলে পরিপূর্ণ থাকে। ফলে এ সময়টায় বিচ্ছিন্ন পাড়াগুলো সহ পুরো গ্রামটিকে সম্পূর্ণভাবে জল পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখা যায়। এ কারণে তখন ডিঙ্গি বা কোষা নৌকোয় চেপে গ্রামের এপাড়া থেকে ওপাড়া যাতায়াত করতে হয়। নৌকোর অভাবে, সাঁতারে পটু গ্রামবাসীরা গামছা বা কোন একটা কাপড় পরে, বাঁ হাতে পরনের কাপড়চোপড় নিয়ে তা মাথার ওপর তুলে ধরে, ডান হাতে সাঁতার কেটে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাওয়া-আসা করে থাকেন। বর্ষায় গ্রামের চারপাশের জলে অজস্র ফুটন্ত সাপলা, জলপদ্ম, সিঙ্গারা, কচুরিপানা ইত্যাদি ফুল দেখা যায়। এরকম অবস্থায় গ্রামটিকে দূর থেকে একটি অতি সুন্দর দ্বীপের মত দেখায়। আমার কৈশোরের প্রথম দিক পর্যন্ত গ্রামের বন্ধুদের সাথে ডিঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, জলজাত ফুল, ফল সংগ্রহ

করতে। তাতে এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতাম। এসব কথা আজো মনে পড়ে। আনন্দ পূর্ণ পূর্বস্মৃতি সময় সময় মনটাকে শৈশব আর কৈশোরের সেই আনন্দলোকে নিয়ে যায়, সেখানে আজকের দিনের আবিলতার লেশমাত্রও লক্ষ্য করিনি। তখন মনটা কেমন যেন আবেশযুক্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজগতটাকে ও যেন হারিয়ে ফেলি।

কৃষ্ণপুরের অনেক কিছুই মনকে বিমোহিত করে তোলার মত। তবে দূরে কোথাও যাতায়াতের ব্যাপারে কোন কোন সময় মন কিছুটা দমে যায়। কৃষ্ণপুর থেকে বর্ষায় নৌকা চড়ে এবং অন্য সব ঋতুতে ধান, পাট, ডালখেত আর গোচারণ ভূমির পাশ দিয়ে মেটো পথ ধরে হেঁটে রেলস্টেশন বা লঞ্চ ঘাটে যাতায়াত করতে হয়। হেঁটে চলার সময় আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোকজনকে রাস্তার দূরত্ব,কাঁচা রাস্তায় ধুলো-বালিও জল-কাদার অস্তিত্বের কারণে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে হাঁটতে হয়। যতদিন দেশে ছিলাম, ততদিন দূরে কোথাও যাওয়া আসা করতে অন্যদের মত আমিও জুতো হাতে নিয়ে হাঁটতেই অভ্যস্ত ছিলাম। এখন শহর জীবনে ধাতস্থ হয়ে জুতো হতে নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে চলার অতীতের ব্যাপারটা যখন মনে পড়ে , তখন মনে মনে বেশ একটা মজা উপভোগ করে থাকি।

কৃষ্ণপুর থেকে যাতাযাতে বিশেষ অসুবিধে সৃষ্টি হয় প্রথমত বর্ষারম্ভে যখন পথের অপেক্ষাকৃত নিচু জমি এবং ছোট ছোট খালগুলোকে আস্তে আস্তে অল্প করে আসতে থাকা জল ডুবিয়ে ফেলে। ডুবে যাওয়া এস্থানগলো জলকাদা ভেঙ্গে, কাপড়চোপড় ভিজিয়ে, এমন কি কোন কোন স্থান সাঁতার কেটে পর্যন্ত পার হতে হয়। চলাফেরার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার একই অবস্থার সৃষ্টি হয় কার্তিক মাসে, যখন বর্ষার জলে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ করে। তখন অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাগুলোতে জল থাকে না, থাকে কাদা, আর খাল-বিল সহ নিচু জমিতে থাকে কমে যাওয়া জল।

আমি তীর্থযাত্রীদের মত পথ চলার সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে তেমন মাথা না ঘামিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, পাকিস্থানে(বর্তমান বাংলাদেশে) জন্মস্থান দেখতে যাব বলে স্থির করি। তাই যাওয়া - আসার বৈধ ব্যবস্থা করে পুজোর প্রাক্কালে, এক বিকেলে কৃষ্ণপুর যাবার উদ্দেশ্যে আগরতলা থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে, পাকিস্থানের আখাউড়া রেল স্টেশনের কাছে এক বন্ধুর বাড়ি পৌছে যাই। সেদিনই শেষ রাত্রে আখাউড়া থেকে ছাতিয়াইন পর্যন্ত টিকিট কেটে মীটার গেজ -এর ট্রেনে চেপে বসি! এখানে ছাতিয়াইন সম্পর্কে বিশেষ এক সংস্কারের কথা প্রকাশ না করে থাকতে পারছি না।

ক্ষুদে রঘুনন্দন পাহাড়ের পশ্চিম দিকের পাদদেশে, লোকালয়ের বাইরে, বেশ এক নির্জন স্থানে অতি সুন্দর বিশাল কৃষ্ণচূড়া ফুল গাছের নিচে ছাতিয়াইন রেলস্টেশন। স্টেশনটি প্ল্যাটফরম বিহীন, ছোট একঘরবিশিষ্ট। এখানে দু'তিন মিনিটের জন্য শুধুমাত্র সাধারণ ট্রেনগুলো থামে। যাত্রীদের তখন নানারকম অসুবিধের সম্মুখীন হয়ে খুব তাড়হুড়ো করে ট্রেন থেকে বেশ কিছুটা নিচে, রেল লাইনের পাশের সমতল জমিতে নামতে হয়। একই রকম দুর্ভোগ সহ্য করে গাড়িতে উঠতেও হয়।

আমাদের অঞ্চলের গ্রামবাসীরা বিশেষভাবে সচেতন থেকে ছাতিয়াইন শব্দটি উচ্চারণ করেন না। এ নামটি যদি কেহ কোনদিন ভুলক্রমেও উচ্চারণ করে ফেলেন, তবে তাঁকে নাকি সারাটা দিন ধরেই নানারকম দুর্ভোগ পোয়াতে হয়। একারণে ছাতিয়াইনকে ওঁরা 'পুবের গাঁও' নামে চিহ্নিত

করে থাকেন।

কম দূরত্বের ছয়টি মাত্র স্টেশন অতিক্রম করে ভোর পাঁচটা নাগাদ আমাদের ট্রেনটি পুরো ফাঁকা ছাতিয়াইন স্টেশনে এসে থামে। আমি আমার স্যুটকেস ও ব্যাগ নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামি। অন্য একটি যাত্রীবোঝাই কামরা থেকে আর এক ভদ্রলোককেও খুব কসরত করে দু'টো বাচ্চা, এক মহিলা এবং বেশ কিছু মালপত্র নিয়ে নামতে দেখলাম। গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রলোক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন। দেখে মনে হল, তিনি তাঁদের এত মালপত্র বহন করে স্টেশন ত্যাগ করতে সমস্যায় পড়ে গেছেন। ব্যাপারটা অনুমান করে আমি তাঁদের দিকে এগিয়ে যাই।

তাঁর কাছে যেতে ভদ্রলোক স্মিতমুখে আমাকে বলেন, আমরা এক ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। এতসব মালপত্র নিয়ে দূরের নৌকো ঘাটে যেতে একজন কুলি না হলে তো আমাদের চলছে না, অথচ আজ স্টেশনে কোন লোকই দেখতে পাচ্ছি না। এখন কী যে করি, বুঝে উঠতে পারছি না।

আমার স্যুটকেস ও ব্যাগ ভদ্রলোকের জিম্মায় রেখে, আমি ওদের জন্য মুটে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে স্টেশন চত্বরের এদিক-ওদিকে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি। কিন্তু মুটে খুঁজে পেলাম না কিছুতেই। আমি ফিরে আসি এবং ভদ্রলোককে বলি, চলুন, নিজেরাই কোনরকমে মালপত্র বহন করে এগুতে থাকি। আমার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আপনাদের দু'টো স্যুটকেসের একটি আমি বহন করতে পারব। পথে পাওয়া গেলে মুটে নিয়ে নেব। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না!

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয়ে আমার কথা মেনে নেন। আমরা মোটামুটি কসরত করে চলতে আরম্ভ করি। চলার পথে স্বাভাবিক আলাপচারিতায় আমরা উভয়ে উভয়ের নামধাম, গন্তব্যস্থল ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নেই। ভদ্রলোকের নাম প্রণব সরকাব, বাড়ি মোড়াকরি। তিনি ঢাকাশহরে চাকরি করেন। পুজো উপলক্ষে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন।

প্রণববাবু একসময় আমাকে বলেন, আপনাকে তো একই রাস্তা ধরে আমাদের গ্রাম পার হয়ে, কৃষ্ণপুর যেতে হবে। এ অবস্থায় আমরা যদি একটু বড়সড় একটি নৌকো ভাড়া করি , তবে তো একই নৌকোয় তিন-সাড়ে তিন ঘন্টা সময় গল্পগুজব করে কাটিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে যেতে পারি। মাঝি আমাকে বাড়ির ঘাটে নামিয়ে দিয়ে, আপনাকে কৃষ্ণপুর পৌছে দিবে। তাঁর কথাগুলো আমার পক্ষেও সুবিধেজনক বলে মনে হল, তাই প্রণববাবুর প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে যাই।

লটবহর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নৌকো ঘাটের দিকে কিছুটা এগিয়ে যাবার পব, আমরা এক চা-মিষ্টির দোকান দেখতে পাই। দোকানটিতে সাতসকালেই লোকজনেব বেশ ভিড় লক্ষ্য করি। এসব লোকের কাছ থেকে আমাদের চাহিদামত মুটের হদিস পেয়ে যেতে পারি আশা করে আমি দোকানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, আর একটু বেলা বাড়লে মালবহনকারী পেয়ে যাব। সহযাত্রীর মালপত্র বহন করে আরো বেশ দূরে নৌকা ঘাটে যাওয়া আমাদের পক্ষে দুস্কর বলে, আমরা বড় একটা আমগাছের নিচে বসে মুটে পাবার আশায় সময় কাটাতে থাকি।

কিছুক্ষণ পর প্রণববাবু ও আমি চা খেতে দোকানটিতে ঢুকি। কিন্তু চা পেলাম না, কারণ হিসেবে জানলাম, গতরাতে দোকানটি থেকে টাকা চুরি হয়েছে। এজন্যে তখনকার মত চা বিক্রি

করা বন্ধ হয়ে আছে। আমরা লক্ষ্য করি, অনেকের মধ্যে বেঁটে মত একটি লোক দোকানের গদির ওপর বিষণ্ন চেহারায় বসে আছে, আর মাঝে মাঝে কাঁধের গামছা দিয়ে তার নাক, চোখ মুছছে। এমন সময় সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক, দু'জন সঙ্গীসহ দোকানটিতে এসে ঢুকেন। তাঁকে দেখামাত্র ঘরের সবাই একটু সরে দাঁড়ান, বেঁটে লোকটিও গদি থেকে নেমে এসে একটি চেয়ার মুছে নিয়ে ভদ্রলোককে বসতে দেয়। পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ভদ্রলোকের নাম সেলিম চৌধুরি। তিনি এলাকায় সবচেয়ে বড় ধনীও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী, লোকজন নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রোজই এদিকে আসেন। আরো জানলাম, বেঁটে লোকটি দোকানটির কর্মচারী। তার নাম, গোপাল দেব।

চেয়ারে বসে চৌধুরী সাহেব কর্মচাবীটিকে কাছে ডেকে বলেন, শুনলাম গতরাতে তোমাদের দোকানে টাকা চুরি হয়েছে? এ ঘটনাটা তুমি তোমার মালিক এবং আমাদের পুলিশ ফাঁড়িকে জানিয়েছ তো? তুমি তো নাকি প্রায় সবসময় দোকানেই থাক, বাড়ি দূরে বলে এখানেই রান্না করে খাওয়া -দাওয়া কর। এ অবস্থায় কীভাবে, কত টাকা চুরি হল?

চৌধুরি সাহেবের এসব প্রশ্ন শুনে গোপাল এক বিপর্যস্তেব মত কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা নুইয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর দিতে সাহেবের কাছ থেকে তাগিদ পেয়ে অবশ্য অচিরেই সে মাথা কিছুটা তুলে মুখ খোলে। মাটির দিকে তাকিয়ে থেকেই সে কাঁদো কাঁদো স্বরে, থেমে থেমে বলতে আরম্ভ করে, এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে দোকানের মালিক আজ ভোরে দূরের গ্রাম সুজাতপুর গেছেন। তিনি বলে গেছেন। দু'দিন পব বাড়ি ফিরবেন। তাই মালিককে এখনই চুরির সব কথা জানাতে পাবছি না। তবে পুলিশ ফাঁড়িকে এঘটনাটা আজই গিয়ে জানিয়ে আসব। দোকানে ফেরার পথে মালিকেব বাড়িতেও খবরটা দিয়ে আসব।

সাব, চুরিটা হয়েছে আসলে আমার বোকামিতেই, দয়া দেখাতে গিয়ে। গতকাল সন্ধ্যার ট্রেন আমাদের স্টেশন ছেড়ে যাবার পর, দোকান মালিক অন্যান্য দিনের মত বাড়ি চলে যান। যাবার আগে, তিনি আজ এখানে থাকবেন না বলে, আজকের সকাল বেলার দোকনদারির পর, দোকানের অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনে আনার জন্য আমাকে এক হাজার টাকা দিয়ে যান। টাকাটা আমি গদির হাত বাক্সে রেখে দেই। রাত নয়টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেবে প্রতিদিনের মত হাত বাক্সটা গদি থেকে তুলে নিয়ে, গদির চৌকির সাথে যুক্ত উঁচু আলমারিটার উপর বসিয়ে রাখি। এরপর আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ব বলে ভাবছি, তখন পাশের মুদির দোকানের বিমলদা ওদের বাড়ি ফেরার পথে আমাদের দোকানে ঢোকে। আমিও তখন দরজাটা ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করে ওদের সাথে কিছুক্ষণ খোশগল্প করতে বসে পড়ি। একটু সময় পরেই ঘরের বার থেকে দোকানের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ এবং এক বালকের কণ্ঠে ডাকাডাকি করা শুনতে পাই। এসব শুনে আমি দোকানের ভেতর থেকেই জিজ্ঞেস করি, কে, কেন ডাকছো?

উত্তরে অনেকটা কান্নার সুরে শুনতে পাই, দাদা, আমি এক স্কুল ছাত্র, বাধ্য হয়ে অসময়ে গাড়ি থেকে নেমে বিপদে পড়ে গেছি। আপনি যদি দয়া করে আমাকে বাকি রাতটুকু আপনাদের ঘরে কাটানোর সুযোগ দেন, তবে আমি বিপন্মুক্ত হয়ে থাকতে পারি। কাল ভোরেই আমি ফান্দাউব চলে যাব। কাতর কণ্ঠে এসব কথা শুনে আমি দরজা খুলি এবং দেখতে পাই, অল্পবয়স্ক একটি ছেলে ছোট এক টিনের বাক্স হাতে করে দরজার সামান দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছেলেটির

নাম আকাশ রায়, সে সমসেরনগর থেকে এসেছে। আমি তাকে আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তার অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে ছেলেটিকে আমি আমাদের ঘরে রাতের মত থাকতে দেই। এসবের কিছুক্ষণ পর বিমলদা ও দেবু বাড়ি চলে যায়। ছেলেটিকে দোকানের লম্বা বেঞ্চিটাতে ঘুমিয়ে পড়তে বলে, আমিও গদির চৌকির ওপর বিছানা পেতে সারাদিনের খাটা-খাটনির পর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ আমার ঘুম ভাঙ্গাঁর পর, দোকানঘরের দরজা খোলা অবস্থায় দেখতে পাই। ঘরের এদিক-ওদিকে তাকিয়ে আমি ছেলেটিকে আর দেখতে পাইনি। তার টিনের বাক্সটিতে নজরে পড়ে নি। তাতে সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি হাত বাক্সটি খুলি এবং দেখতে পাই, আমার পক্ষে বড় এক অপবাদজনক ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, দোকানের মালপত্র কিনে আনার জন্যে রাখা টাকাটা নেই। তখন মনে হয়, আমার ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলেটা চৌকির উপর উঠে উঁচুতে আলমারির উপর রাখা হাতবাক্স থেকে টাকাটা নিয়ে পালিয়েছে। এ রকম মনে হওয়ার কারণ স্বরূপ আমি আমার বিছানার বাইরে খালি চৌকিতে দোকানঘরের বেলেমাটির মেঝের উপর দিয়ে হাঁটা পায়ের কয়েকটি ছাপ দেখতে পাই। আমার বিশ্বাস পায়ের ছাপগুলো ছেলেটির পায়েরই। টাকা চুরি হয়ে গেছে বোঝার সাথে সাথে দোকান ঘর তালাবদ্ধ করে আমি ছেলেটিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করি। কিন্তু তাকে আর কোথাও খুঁজে পাই নি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে বসে সেলিম চৌধুরি গোপালের কথা শুনেন। এক সময় তিনি চৌকিতে দৃশ্যমান পায়ের ছাপগুলো দেখতে যান। ছাপ দেখে তিনি গোপালকে বলেন, তোমার কথা অনুযায়ী তেমন কোন পায়ের ছাপ তো দেখতে পাচ্ছি না। দু'তিনটে ছাপ অবশ্য দেখা যাচ্ছে, তাও আবার পুরো নয়, পায়ের সামনের দিকের আংশিক ছাপ।

একথার জবাবে গোপাল বলে, সাব, চৌকির উপর আরো কয়েকটি পুরো ছাপই ছিল। ছেলেটাকে খুঁজে বিফল হয়ে ফিরে এসে, চৌকির ওপর গদি পেতে হাত বাক্স বসিয়ে ধূপ-ধুনো দেবার প্রয়োজনে, গদি ও ঠাকুর দেবতার পক্ষে অশ্রদ্ধা ও অবমাননাকর পায়ের ধুলোর ছাপগুলোর প্রায় সব কয়টিই আমি জল ছিটিয়ে মুছে ফেলেছি। মূল গদি থেকে কিছুটা দূরে, চৌকি এবং আলমারির সংযোগস্থলের ছাপগুলোর কিছু অংশই শুধু মালিক এবং অন্যান্যদের দেখাতে রাখতে পেরেছি।

সেলিম সাহেব চুরির ব্যাপারটি নিয়ে গোপালের সাথে আর কোন কথা বললেন না। গম্ভীর মুখে তিনি অন্য অনেকের মত দাঁড়িয়ে থেকে চুরিব বৃত্তান্ত শুনতে থাকা চার যুবককে তাঁর কাছে ডাকেন। যুবকরা আসলে, তিনি বলেন, তোরা তাড়াতাড়ি গোপালের কথা অনুযায়ী টাকা চুরি করে পালিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে সাইকেল নিয়ে চারদিকে, বিশেষ করে নৌকোঘাটের দিকে বেরিয়ে পড়। ছেলেটিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে মনে রাখবি, সে অল্প বয়সের এবং তার সাথে ছোট একটি টিনের বাক্স আছে। ওকে খুঁজে পেলে এখনই তাকে মারধর করবি না, অন্য কাউকেও তা করতে দিবিনা। ছেলেটিকে ধরতে পারলে, সাথে সাথে আমাকে খবর দিবি। ব্যাপারটা আমি নিজে দেখব।

চৌধুরি সাহেবের নির্দেশ মত কাজ করতে যুবকরা বেরিয়ে পড়ে। আমরাও মুটে পাবার আশায় অপেক্ষা করতে আবার গাছতলায় গিয়ে বসি।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে চার যুবকের একজন, ছোট এক টিনের বাক্স সমেত এক কিশোরকে ধরে চা-মিষ্টির দোকানটিতে নিয়ে আসে। কিশোরটিকে দেখা মাত্রই গোপাল অতি মাত্রায় আনন্দোচ্ছ্বাস

প্রকাশ করে বলে, বাঃ, আমার কি সৌভাগ্য, টাকা চোর আকাশ ধরা পড়ে গেছে! পরক্ষণেই সে ক্রোধান্ধের চেহারা ধরে আকাশকে মারধর করতে তেড়ে যায়। কিন্তু যে যুবক আকাশকে ধরে এনেছে, সে বাধা দিয়ে গোপালকে নিরস্ত করে।

যুবক তাড়াতাড়ি সেলিম সাহেবের কাছে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে আসার এ খবর পাওয়া মাত্র সেলিম সাহেবও দোকানটিতে চলে আসেন। সেলিম চৌধুরি একটু সময় নিবিষ্টমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে , তাকে ধরে আনতে সফল যুবকটিকে বলেন, গোপাল অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করে যাকে ধরতে পারল না, তাকে তুই এত তাড়াতাড়ি কোথায়, কীভাবে পেয়ে গেলি? উত্তরে যুবক বলে, ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে আমি দ্রুত সাইকেল চালিয়ে নৌকো ঘাটে যাই। ঘাটে যাত্রীর আশায় অপেক্ষা করতে থাকা নৌকোর মাঝিদের জিজ্ঞেস করে জানতে পাই, তখনো পর্যন্ত কোন নৌকো ঘাট ছেড়ে কোনও গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যায় নি। তাতে আমি আশান্বিত হই। আমি সিদ্ধান্ত নেই, সব কয়টি নৌকো ঘাট ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত, ছেলেটিকে ধরার চেষ্টায় ঘাটেই অপেক্ষা করতে থাকব। তাই, সাইকেলটিকে ষ্ট্যান্ড-এ দাঁড় করিয়ে, সেটিকে তালাবন্ধ করে রেখে ঘাটের কাছাকাছি এদিক-ওদিকে আমি পায়চারি করতে থাকি। এ অবস্থায়, এক সময় ঘাটের কাছের বড় পুকুরটার উঁচু পাড়ের দিকে আমার নজর পড়ে। দেখতে পাই, পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটি ছেলে তার দুই হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আাছে। তার পাশে ছোট একটা স্যুটকেসও। এতে আমি আমার কার্য সিদ্ধির ব্যাপারে অধিকতর আশান্বিত হয়ে উঠি। আমি প্রায় দৌড়ে ছেলেটির কাছে যাই। গোপাল 'টাকা চোর' সম্পর্কে যে রকম বর্ণনা দিয়েছে, সে বর্ণনার সাথে ছেলেটির মিল দেখতে পাই। ফলে আমি খুবই উৎসাহিত হয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করি, এই ছেলে, এখানে একা একা বসে আছ কেন? তোমার নাম কি? এত সকালে কোথা থেকে এখানে এলে, যাবে কোথায়?

আমার প্রশ্ন শুনে ছেলেটি আস্তে আস্তে হাঁটু থেকে মাথা তুলে আমার দিকে তাকায়। দেখলাম, তার চাহনি এবং মুখমন্ডল বিষাদক্লিষ্ট। সে যেন ব্যথা-বেদনার এক মূর্ত প্রতীক, বিপর্যস্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে সেখানে বসে আছে। তাকে এরকম শোচনীয় চেহারায় দেখে আমি ভাবলাম, চুরি করে ধরা পড়ে গিয়ে সে কিছুই জানে না, বুঝেনা-এরকম এক নির্জীবের ভান করে আমাকে ফাঁকি দিতে চাইছে। তাই আমি ছেলেটির ব্যাপারে আমার সতর্কতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেই। ছেলেটি অবশ্য আমার কোন প্রশ্নকেই উপেক্ষা করে মুখ বুজে বসে থাকে নি। সে অতি ক্লান্ত একজনের মত, ধীরে ধীরে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলে, আমি ফান্দাউক যাবার উদ্দেশে এখানে বসে আছি। ফান্দাউকের কোন গয়না (নির্দিষ্ট ভাড়ায় যাত্রীবাহী নৌকো) এখনো এখানে আসেনি। তাই আমি গয়না আসার অপেক্ষায় এবং ভীষণ পেটব্যথা নিয়ে এখানে ঠান্ডা হাওযায় কিছুটা আরামে সময় কাটাচ্ছি।

ছেলেটি তার নাম এবং সে কোথা থেকে এসেছে বলে যা বলল, তার সব কিছুই গোপালের বলা কথার সাথে হুবহু মিলে যায়। তাতে আমি নিশ্চিত হই, এই সেই ছেলে, যাকে গোপাল চুরির দায়ে অভিযুক্ত করেছে। আমার কথার জবাব দিয়ে ছেলেটি তার পাশে রাখা টিনের স্যুটকেসটি হাতে করে উঠতে চায়। কিন্তু আমি তাকে আমার নাগালের বাইরে যেতে দেইনি। ধমক দিয়ে তার চলার চেষ্টা বন্ধ করে দিয়ে বলি, এই, পালানোর চেষ্টা একদম করবে না। চুরি করে কিন্তু ধরা পড়ে গেছ। আমার সাথে তোমাকে এক্ষণি আবার সেই চা-মিষ্টির দোকানে যেতে হবে, যেখান থেকে টাকা চুরি করেছ।

আমার মুখে টাকা চুরি করার কথা শুনে ছেলেটি স্তম্ভিত হয়ে যাবার মত ভাব ধরে । সে এক বিস্ময়াবিষ্টের মত আমাকে বলে, আমাকে চুরি -চামারির এসব কী কথা শুনাচ্ছেন? আমি পালিয়ে বেড়াতেই বা যাব কেন? জল খেলে আমার পেট ব্যথা কিছুটা কমে। তাই পুকুর থেকে জল খেতে আমি ঘাটে যেতে চাইছি। এর আগেও পুকুর থেকে জল খেয়ে আমি পেট ব্যথা কিছু কমিয়েছি। আমি ছেলেটির কোন কথাকেই আমল না দিয়ে, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি।

যুবকের কাছ থেকে আকাশকে ধরে আনার বিস্তৃত বিবরণ শুনে সেলিম সাহেব আকাশকে বলেন, তোমার বিরুদ্ধে দোকান কর্মচারী গোপালের অভিযোগ, তুমি গত রাতে বিপদগ্রস্ত হয়ে তার কাছে রাত কাটানোর আশ্রয় পেয়েছিলে। সেই আশ্রয় পাওয়াটাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে তুমি এক আস্ত ঘৃণ্য অকৃতজ্ঞের মত, গোপালের ঘুমন্ত অবস্থায় দোকানের হাজার টাকা চুরি করে পালিয়েছিলে। তুমি ছেলে মানুষ, চুরির দায়ে তোমাকে পুলিশের হাতে বা কঠোর কোন শাস্তি আমরা দিতে চাই না। চুরি করে নেওয়া টাকাটা তুমি তাড়াতাড়ি বার করে দিয়ে মুক্ত হয়ে বাড়ি চলে যাও। তা না করলে কিন্তু তোমকে ভয়ংকর শাস্তি পেতে হবে।

সেলিম সাহেবের কাছ থেকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনে দৃশ্যত রোগা, তেজোদ্দীপ্তহীন হয়েও আকাশ বুক ফুলিয়ে বেশ জোরে বললে, না, আমি চোর নই, টাকা চুরি করিনি। জীবনে আমি কোন দিন কোন কিছুই চুরি করিনি। আমাকে জড়িয়ে যা হচ্ছে, তা পুরোপুরি মিথ্যা, বানানো এবং আমার কাছে অভাবনীয়। একথা আমি শতবার স্বীকার করব যে, দোকানের লোকটি গতরাতে আমাকে আশ্রয় দিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আজ খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গেঁ। দোকান কর্মচারীকে তখন অন্ধকার ঘরে লন্ঠন জ্বালিয়ে ঘরের বেড়ার মধ্যে কি জানি একটা কাজ করতে দেখতে পাই। তাঁকে আমি বাড়ি যাবার উদ্দেশ্যে দোকান থেকে চলে যাব বলায়, তিনি আমাকে ঘরের দরজা খুলে দেন, আমি নৌকো ঘাটে চলে যাই। কই, তখন তো তিনি টাকা চুরির ব্যাপারে কিছুই বলেন নি?

আকাশ এতটুকু বলার সাথে সাথে গোপাল আবার অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। সে আকাশকে বলে, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, কী বললে, তোমাকে আমি দরজা খুলে দিয়েছি? তুমি নিজেই তো দরজা খুলে, আমাকে ঘুমে রেখে টাকা চুরি করে চলে গেলে? আর দোকান ঘরের বেড়ারও তো কিছুই হয়নি যে, জরুরি ভিত্তিতে আমি লন্ঠন জ্বালিয়ে তাতে কাজ করব? তোমার বানানো এসব মিথ্যে কথা কেউই বিশ্বাস করবে না।

দরজা খোলা ও বেড়ার মধ্যে কী একটা কাজ করার কথা নিয়ে গোপাল এবং আকাশের মধ্যে বেশ জোরালো বিতর্ক বেঁধে যায় এবং তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে। এক সময় বাগ্‌বিতন্ডায় বিরক্ত প্রকাশ করে আকাশ সেলিম সাহেবকে বলে, আমার কোন কথাই তো আপনারা বিশ্বাস করছেন না, এমনকি দোকান কর্মচারী আমাকে দরজা খুলে দেবার এবং বেড়ায় কাজ করার কথা পর্যন্ত অস্বীকার করছেন! এঅবস্থায় আমিতো আর জোর করে আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস করাতে পারি না! আমার পক্ষে সংকটজনক এরকম পরিস্থিতিতে আমি প্রস্তাব করি, আপনারা আমার জামা প্যান্ট এর পকেট পরীক্ষা করে এবং স্যুটকেসটি খুলে খুঁজে দেখুন, তাতে দোকানের চুরি হয়ে যাওয়া টাকা আছে কিনা।

প্রস্তাব গ্রহণ করে সেলিম সাহেব গোপালকেই আকাশের সবকিছু ভালভাবে পরীক্ষা করতে

বলেন। গোপাল পরীক্ষা করে। আকাশের পকেটগুলোতে একটি রুমাল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেলনা। স্যুটকেসে একপ্রস্থ সার্ট-প্যান্ট, একটি গামছা, কয়েকটি বই এবং একটি কলম শুধু পাওয়া গেল। টাকা পয়সার কোন সন্ধান মিলল না।

আকাশের পকেট ও স্যুটকেস থেকে তার হারানো টাকা বার করে দেখাতে না পেরে গোপাল মন্তব্য করে, সেয়ানা ছেলে চুরি করা টাকা কি আর সাথে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে? ও টাকাটা নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে। পুলিশের ডান্ডার বাড়ি খেলেই বাবাগো, মাগো বলে চিৎকার করে টাকা বার করে দিবে ।

গোপালের মন্তব্য শুনে আকাশ বেশ তেজের সাথে বলে, আমি কোন টাকা-পয়সা কোথাও লুকিয়ে রাখি নি। আপনি ভয় দেখাবেন না। পুলিশ কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সব রকমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর, কোন তথ্য প্রমাণ-না পেলে তাকে ধরে নিয়ে আপনাদের মত অযৌক্তিক ভাবে হেনস্তা করবে না, জেলেও পুরে রাখবে না। আমার সবকিছু তল্লাশি করে টাকা -পয়সা বলতে তো কিছুই পেলেন না, এবার আপনারা প্রমাণ করে দেখান যে, আমি টাকা চুরি করেছি।

আকাশের কথা শুনে চৌধুরি সাহেব গোপালকে বলেন, তুমি বললে, ছেলেটি চুরি করে নেওয়া টাকাটা কোথাও লুকিয়ে রেখে এখানে এসেছে। কিন্তু আমি বুঝছি না, সে টাকা লুকাবার সুযোগ পেল কখন?

যে যুবক ছেলেটিকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে, সে তো তাকে ধরার পর এক মুহূর্তের জন্যও তার নজরের বাইরে যেতে দেয়নি। তাছাড়া, টাকা চুরি করে সে কি আর শখ করে ধরা পড়ার জন্য তোমাদের দোকানটির কাছাকাছি , প্রকাশ্যে পুকুর পাড়ে বসে থাকত?

এবার ছেলেটির কথা অনুযায়ী তুমি অন্য কোন উপায়ে চেষ্টা করে দেখ, ছেলেটিকে চোর বলে সাব্যস্ত করতে পার কিনা।

সেলিম চৌধুরির পরামর্শে গোপাল আকাশকে বলে, তুমি যে চোর তাব প্রমাণ চাইছ তো! এস আমার সাথে। তুমি যে দোকান ঘরের চৌকির ওপর উঠে হাত বাক্স থেকে টাকা তুরি করেছ, তার কিছু জাজ্বল্য প্রমাণ , মানে তোমার পায়ের কয়েকটি ছাপ আমি এখনো রেখে দিয়েছি। এই বলে সে দোকান ঘরের খুবই পালিশ করা কালমত কাঠের চৌকিটার ওপর , সাদা বালির ওপর দিয়ে হাঁটা পায়ের সামনের দিকের আংশিক, তবে স্পষ্ট ছাপগুলো আকাশকে দেখায়, যা আগে সে অন্যদেরও দেখিয়েছে।

আকাশ গোপালের কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে বলে, আপনার দেখানো এপায়েব ছাপ- কখনো আমার পায়ের ছাপ হতে পারে না। আপনি কি দেখেছেন যে, আমি পায়ে মেঝের বালি মেখে আপনাদের চৌকির ওপর উঠেছি? নিশ্চয় না। দেখলে তো আমাকে চোর মনে করে না ধরে থাকতে পারতেন না? তাছাড়া , ব্যবহার করার মত আমার পায়ের চপ্পল থাকা সত্বেও , আমি কি আমার পায়ের ছাপের চিহ্নে রেখে যেতে মেঝের ধুলো মাড়িয়ে চুরি করতে চৌকির উপর উঠতাম? কোন চোর কি চুরি করতে গিয়ে পরে ধরা পড়ার উদ্দেশ্যে নিজের সঠিক কোন চিহ্ন রেখে যায়? আরেকটা ব্যাপার , চৌকিতে বিদ্যমান পায়ের ছাপের সামান্য অংশ এবং আমার পায়ের ছাপের অংশ বিশেষ দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, চৌকির ছাপগুলো আমার পায়েরই । চৌকির ছাপগুলো যদি পুরো পায়ের হত, তা হলে এগুলোর সাথে আমার পায়ের পুরো ছাপের দৈর্ঘ-প্রস্থের মাপ

মিলিয়ে দেখা সম্ভব হত।

দুজনের বাগ্‌বিতন্ডা শুনে সেলিম চৌধুরি আকাশকে বলেন, পায়ের ছাপ দেখে গোপালকে তুমি যা বললে, তা বলতেই পার। তা সত্ত্বেও তোমাকে বলি, তুমি খালি পায়ে দোকান ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে, চৌকিতে বিদ্যমান আংশিক ছাপগুলোর পাশে তোমার পায়ের ছাপ রাখ। তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, টাকা চুরি না করলে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।

চৌধুরি সাহেবের কথামত আকাশ অনায়াসেই তার পায়ের ছাপ রাখে। আমরা সবাই একে একে ছাপগুলো দেখি। আপাতদৃষ্টিতে আকাশের পায়ের সামনের অংশের ছাপ এবং গোপালের দেখানো অনেকটা একই রকম বলে মনে হয়। তা অবশ্য ব্যতিক্রমি কিছু নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও কোন কোন সময় এরকম দেখা যায়। এ কারণে একমাত্র গোপাল ছাড়া অন্য কেউই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেন না যে, চৌকিতে দু'বারে রাখা ছাপগুলো একজনের পায়েরই। ফলস্বরূপ আমরা মৌনাবলম্বন করে থাকি। কিন্তু গোপাল এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে বলতে থাকে, দু'বারের পায়ের ছাপ একজনেরই এবং তা নিঃসন্দেহে আকাশের পায়েরই। তাই এক রণজয়ীর মত স্মিত মুখে সে আকাশকে বলে, তোমাকে যে আমি টাকা চোর বলছি, তা প্রমাণ করতে বলেছিলে তো? এখন পায়ের ছাপের মিল দেখিয়ে এত সব লোকের সামনে তুমি নিজেই প্রমাণ করে দিলে যে, চৌকির ওপর উঠে টাকা চুরি করেছ। এবার মানে মানে তাড়াতাড়ি টাকাটা বার করে এনে দিয়ে দাও। তা না করলে তোমাকে অবশ্যই পুলিশের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। তখন টাকা ফেরত দিয়েও রেহাই পাবে না।

গোপালকে অতিমাত্রায় উল্লসিত দেখে চৌধুরি সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, গোপাল বেশি বাড়াবাড়ি করো না। তোমার মত আমরা কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছি না যে, দু'বারে রাখা পায়ের ছাপ একজনেরই এবং তা আকাশেরই। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। এনিয়ে আমাদের আরো ভাবতে হবে।

সেলিম চৌধুরির বক্তব্য শোনার পরও নাছোড়বান্দার মত গোপাল আকাশকে বলে, আমি তো জানি, দোকানের টাকাটা তুমিই নিয়েছ। তাই বিপদমুক্ত হতে আর দেরি না করে টাকাটা বার করে দিয়ে দাও।

গোপালের মুখে বার বার চোরের অপবাদ শুনে আকাশও আবার দৃপ্তকণ্ঠে বলে, আগাগোড়া আপনাদের তো বলেই যাচ্ছি যে, আমি টাকা-পয়সা চুরি করি নি। এ অবস্থায় আমি কী করে আপনাদের টাকা বার করে দেব। আমি তো এব্যাপারে নিশ্চিত যে, আপনার দেখানো ছাপগুলো আমার পায়ের নয়। এখানে আমার পক্ষে ভীতিজনক এক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও আমাকে বলতে হচ্ছে, বিচারের নামে আমার বিরুদ্ধে যা করা হচ্ছে, তা নিঃসহায় এক কিশোরের প্রতি বড় ধরনের এক অবিচার বা নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি জানি, হাত পায়ের ছাপ মিলিয়ে অপরাধী ধরার নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। এখানে আপনি চোখের আন্দাজে আংশিক পায়ের ছাপ নিজের মন-গড়া মত মিলিয়েছেন, তা কোন অবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিযুক্ত হতে পারেনা এবং সে কারণে যথার্থও নয়। গোপালের কথার পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলে, আকাশ দ্বিতীয় বারের মত পায়ের ছাপগুলো খুঁটিয়ে দেখে। পরমুহূর্তে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, আপনাদের মধ্য থেকে কেউ যদি অনুগ্রহ করে একটু সময়ের জন্য আমাকে একটি টর্চ লাইট দিতে পারেন, তবে

আমি টাকা চুরির ব্যাপারটায় সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতে পারি।

অনায়াসে দেবার মত টর্চ লাইট একটি আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগেই ছিল। টর্চটি বার করে আমি আকাশকে দেই। আকাশ তা জ্বালিয়ে চৌকির উপর গোপালের দেখানো ছাপ এবং সেই ছাপের পাশেই বিদ্যমান আমাদের সামনে রাখা তার নিজের পায়ের ছাপ মাথা নুইয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। এ অবস্থায় এক সময় তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা যায়। পরক্ষণেই সে বেশ খুশি মনে সেখান থেকে ফিরে এসে চৌধুরি সাহেবকে বলে, সাহেব, দোকানের লোকটির দেখানো পায়ের ছাপগুলো এখন কেউ নষ্ট করে ফেলতে পারে। যাতে কেউ তা কোন অবস্থাতেই নষ্ট করতে বা মুছে ফেলতে না পারে, তার একটা ব্যবস্থা যদি অনুগ্রহ করে আপনি এই মুহূর্তেই করেন, তবে আসল চোব ধরার সঠিক সূত্রটি বার করতে আমার বোধ হয় আর বেশি সময় লাগবে না।

আকাশের আবেদনে সাড়া দিয়ে চৌধুরি সাহেব তৎক্ষণাৎ পায়ের ছাপগুলোকে অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্বে একজনকে নিযুক্ত করেন।

আকাশ চৌধুরি সাহেবকে আবার বলে, আপনার কাছে আমার আর একটি অনুরোধ, আপনি দোকান কর্মচারীকে আমার মত খালি পায়ে মেঝেতে হেঁটে তার পায়ের ছাপ আগে দেখানো ছাপের পাশে রাখতে বলুন।

আকাশেব কথা শুনামাত্র গোপাল উত্তেজিত হয়ে উঠে, আকাশকে বলে, কী বললে? ভালভাবে চৌকি মুছে তাতে হাত বাক্স বসিয়ে ধূপ-ধুনো দেবাব পব, মা-লক্ষ্মীর পক্ষে অবমাননা ও অমর্যাদাকর আমার পায়েব ধুলোর ছাপ এখন গদির চৌকির ওপর রাখতে যাব কেন রে? আমার কি কান্ডজ্ঞান নেই?

গোপালের কথা শেষ হলে সেলিম সাহেব তাকে বলেন, আকাশের কথা অনুযায়ী তাড়াতাড়ি পায়ের ছাপ রাখ। তোমার দোকানের পবিত্রতার ব্যাপাবটা পরে দেখা যাবে।

সেলিম সাহেব বলা সত্বেও গোপাল পায়ের ছাপ রাখতে ইতস্তত করতে থাকে। তা লক্ষ্য করে সাহেব যুবকদের ডেকে পায়ের ছাপ রাখার ব্যবস্থা করতে বলেন।

যুবকরা নির্দেশটি সঙ্গে সঙ্গেই পালন করে এবং গোপালও পায়ের ছাপ রাখতে বাধ্য হয়। আকাশ এবার আগে দেখানো ছাপ, আর এখন সবার সামনে গোপালের নিজের রাখা ছাপ টর্চ জ্বালিয়ে নিবিষ্ট মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। পরীক্ষার পর তার মুখ পূর্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হাসি মুখে সে সবাইকে শুনিয়ে বলে, প্রথমবার টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে পাই, দোকানের কর্মচারীর দেখানো ছাপের মধ্যে যুক্ত আঙ্গুলের, বিশেষ করে বুড়ো আঙ্গুলের নিচের চামড়ার রেখাগুলোর সুস্পষ্ট ছাপ এবং আমার পায়ের আঙ্গুলের রেখাগুলোর ছাপ এক নয়, ভিন্ন রকমের। দ্বিতীয় বার টর্চের আলোতে দেখতে পাই, সবাইকে দেখানো ছাপের মধ্যে যুক্ত আঙ্গুলের রেখাগুলোর ছাপ, আর দোকানের কর্মচারীর এখন রাখা ছাপের মধ্যে যুক্ত আঙ্গুলের রেখাগুলোর ছাপ এক। এ দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, দোকানের কর্মচারী আমার পায়ের ছাপ বলে যে ছাপগুলো দেখিয়েছেন, তা আমার নয়, দোকান কর্মচারীর নিজেরই।

এরপর সেলিম সাহেবের হাতে টর্চলাইটটি বাড়িয়ে দিয়ে আকাশ বলে, এবার আপনারা আমার কথা যাচাই করে দেখুন।

চৌধুরি সাহেব সহ আমরা সবাই একে একে টর্চ জ্বালিয়ে আকাশের কথা পরখ করে দেখি এবং পুরোপুরি নিশ্চিত হই যে ,আকাশের সব কথাই সত্য, আর টাকা চুরি সম্পর্কে গোপালের সব বক্তব্যই মিথ্যা, চূড়ান্ত শঠতাপূর্ণ।

এসব কিছু ঘটে যাবার পর, ঘটনার স্রষ্টা গোপালের উপর উপস্থিত লোকজন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেন। সেলিম সাহেব উত্তেজিতদের সংযত করে, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বলিষ্ঠ এক যুবককে বলেন, ঘৃণ্য জালিয়াত গোপালকে ধরে গাছের সাথে বেঁধে চাবকাতে আরম্ভ কর। তার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত চাবুক চালাতে থাকবি, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হীন কুমতলবে সরিয়ে নেওয়া দোকানের হাজার টাকা বার করে দেয়।

তিনি দ্বিতীয় আর এক যুবককে বলেন, ফাঁড়িতে গিয়ে আমার নাম করে বলে আয়, পুলিশ যেন তাড়াতাড়ি এসে বেঁধে রাখা শয়তানটাকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথম যুবক সাহেবের শাস্তিদানের হুকুম তামিল করতে শক্ত এক নাইলনের দড়ি নিয়ে আসে। দ্বিতীয় যুবকও কিছুটা দূরে পুলিশ ফাঁড়িতে যাবার জন্য একজনকে তার সাইকেলটা এনে দিতে বলে।

দড়ি হাতে করে প্রথম যুবক যখন অন্য আরো দু'জনকে নিয়ে গোপালকে বাঁধতে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করে, এবং একই সময়ে দ্বিতীয় যুবককেও তার সাইকেল এনে দেওয়া হয়, তখন গোপালকে ভীষণ ঘাবড়ে যেতে দেখা যায়। ভীত -সন্ত্রস্ত হয়ে সে একসময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে হাতজোড় করে সেলিম সাহেবকে বলে, অতি লোভে আমিই দোকানের টাকাটা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সরিয়ে রেখেছি। এজন্য আমি অবশ্যই অপরাধী। সরানো হাজার টাকা আমি এই মুহূর্তেই বার করে দিচ্ছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন, পুলিশের হেপাজতে দিবেন না।

পরক্ষণে সে আকাশের হাত ধরেও ক্ষমা ভিক্ষা চায়। এসবের পর, কারো কিছু বলার অপেক্ষা না করে, গোপাল মাথা হেঁট করে দোকান ঘরের বাঁশের বেড়ার ফাঁকে গুঁজে রাখা টাকাটা বার করে এনে সেলিম সাহেবের কাছে জমা দেয়।

সেলিম সাহেব আকাশকে তাঁর কাছে ডাকেন। এতসব ধকলের শেষে আকাশ এক ভাবগম্ভীর চেহারায় সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেলিম চৌধুরি আরেকটি চেয়ার আনিয়ে, হাতে ধরে আকাশকে তাঁর পাশে বসান, তার পিঠে হাত বোলাতে থাকেন। সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে কিশোর আকাশ তখন বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, তার চোখে জলও দেখা দেয়।

চৌধুরি সাহেব আকাশকে বলেন, কুচক্রী, প্রতারক গোপাল তোমাকে চুরি করার অপবাদ দিয়ে খুবই নাজেহাল ও অপমান করেছে। তার অপবাদ দেবার কথার সত্যতা যাচাই করে দেখতে, তোমাকে নৌকো ঘাট থেকে আনিয়ে হেনস্তা করেছি বলে আমি অনুতপ্ত ও দুঃখিত। তোমার মত অল্প বয়স্ক এক স্কুল ছাত্রকে জড়িয়ে টাকা আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করাটা গোপালের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক বড় অপরাধ। একথা অবশ্য সত্যি যে, গোপাল তার অপরাধ স্বীকার করে দোকানের টাকাটা বার করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও তাব হৃদয়হীন, অমানবিক অপকর্মের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। ঘটনাটির বর্তমান অবস্থায়, সরকারি আইন বা পুলিশের মাধ্যমে তাকে সমাজের অপরাধীদের পক্ষে ভীতিজনক তেমন কোন শাস্তি দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সে হয়ত বিশেষ কোন পন্থা

অবলম্বন করে অপরাধ থেকে বিনা শাস্তিতেই মুক্ত হয়ে যাবে। তাই তাকে শাস্তিটা আমাদের সামাজিক বিচার ধারাতেই দিতে হবে। একটা ঘটনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্য উদ্ঘাটন করার ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা তুমি আমাদের দেখালে, তাতে আমরা মুগ্ধ। তোমার এ ক্ষমতার ওপর আস্থা রেখে বলি, অপরাধী গোপালের বিচারটাও তুমিই কর। প্রাণদন্ড ও কারাদন্ড ছাড়া গোপালকে তুমি অন্য যে দন্ড দিবে, তা অপ্রতিরুদ্ধ হয়ে আমি অবশ্যই কার্যকর করব, এবং তা করা হবে তোমাকে পুরস্কৃত করা হিসেবে বা কিছুটা সান্ত্বনা দিতে।

সব শুনে আকাশ সেলিম সাহেবকে বলে, কর্তব্যকর্মে উৎসাহিত করতে মা আমাদের ভাই-বোনদের বলে রেখেছেন, সত্য, আত্মবিশ্বাস এবং সৎসাহসকে অবলম্বন করে অবিচলভাবে কাজ করে গেলে, সব রকম বাধা বিপত্তি জয় করে মায়ের কথার সারবত্তা আমি আর একবার উপলব্ধি করতে পারলাম। এই উপলব্ধিটাই আজ আমার কাছে বড় এক পুরস্কার, এখান থেকে অন্য আর কোন পুরস্কার পেতে চাই না। আপনার নিরপেক্ষতা ও সহানুভূতি লক্ষ্য করে আমি বিমোহিত। এজন্য আপনাকে আমি সাধুবাদ জানাই। নমস্কার। এই বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে, কিছুটা ন্যুব্জ হয়ে বাঁহাতে পেটটা চেপে ধরে, আকাশ ধীরে ধীরে আবার নৌকো ঘাটের দিকে চলতে থাকে। আমরা এক দৃষ্টিতে তার পথ চলার দিকে তাকিয়ে থাকি।

আকাশ চলে যাবার পর আমরাও আমাদের যাবার পথ সুগম করতে আবার মুটে পাবার ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠি। এবার একটু সময় খোঁজাখুঁজি করেই ভারবাহক একজনকে পেয়ে যাই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সব কিছু নিয়ে স্বচ্ছন্দে নৌকো ঘাটে উপস্থিত হই।

ঘাটে পৌঁছে আমরা আকাশকে আবার বাঁধা এক যাত্রীবাহী নৌকোর গলুই এ চুপচাপ বসে থাকতে দেখতে পাই। টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদে তাকে যথেষ্ট নাজেহাল হতে দেখে, তার প্রতি আমরাও ইতিমধ্যে করুণার্দ্র ও অনুরক্ত হয়ে উঠি। তাই তাকে দেখতে পেয়ে আগ্রহের সাথে তার দিকে এগিয়ে যাই। তাকে জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার আকাশ, বসে আছ যে! বাড়ি যাবার নৌকো পাওনি? আকাশ বলে, না, আমার গন্তব্যস্থল, ফান্দাউকের কোন নৌকো যাত্রী বহন করতে এখনো এখানে পৌঁছেনি।

আকাশের বসে থাকাটা তার কাছে যেমনই হোক, আমাদের কাছে ভালই লাগল। তার সঙ্গ পেতে, তার সাথে কথা বলতে আগ্রহান্বিত হয়ে তাকে আমরা বলি, নৌকো রিজার্ভ করে আমরা তো ফান্দাউক হয়েই মোড়াবারি ও কৃষ্ণপুর যাব। তুমি তো আমাদের সাথেই যেতে পার। তোমাকে ফান্দাউক নামিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে চলে যাব।

আমার কথায় আকাশ রাজি হল না। বলল,আমাকে এমন একটি নৌকোয় যেতে হবে, যে নৌকোর চলতে থাকা শেষ হবে ফান্দাউক পৌঁছেই। কারণ, আমার সাথে এখন টাকা-পয়সা নেই। ফান্দাউক পৌঁছে আমাকে টাকা সংগ্রহ করে নৌকো ভাড়া দিতে হবে। যে নৌকো ফান্দাউক অতিক্রম করে আরো এগিয়ে অন্য কোথাও যাবে, সে নৌকোর মাঝি আমার কাছ থেকে একজনের ভাড়া নিতে ঘাটে যাত্রী সহ নৌকো ভিড়িয়ে রেখে সময় নষ্ট করতে চাইবে না। এ অবস্থায় আপনাদের সাথে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ওদিকে আমাদের বিশেষ ইচ্ছে , আকাশকে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া। তাই এক আপনজনের মত আবদার করে, জোর দিয়ে তাকে বলি, চল তো আমাদের সাথে। তোমাকে আমাদের রিজার্ভ

করা নৌকায় সঙ্গী করে নিয়ে যাব। কাজেই তোমার ভাড়া দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। বলে হাত ধরে আকাশকে আমাদের সঙ্গী করে নৌকো ভাড়া করতে উদ্যোগী হই। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের চাহিদামত একটি নৌকো পঞ্চাশ টা কা ভাড়াতে চুক্তিবদ্ধ করে আকাশ সহ আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করি।

নৌকোয় উঠে প্রণববাবু তাঁর স্ত্রীও পুত্রকন্যাকে নিয়ে ছই এর ভেতর প্রবেশ করেন। মাঝি আমাদের সবার মালপত্র নৌকোর ভেতর সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখে। তখনকার মত আমি বাইরেই থাকি, আকাশও তাই করে। পথের দু'পাশে জলের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা, বাতাসে ঢেউ খেলানো আমন ধান খেত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রচুর জলজাত ফুটন্ত ফুল দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি, অনেকদিন পর মনমাতানো এরকম দৃশ্য দেখে আমি দেশে যাবার সার্থকতা এখান থেকেই উপলব্ধি করতে শুরু করি।

খোলা আকাশের নিচে থেকে অনেকক্ষণ ধরে দেশের বর্ষাকালীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পর, এক সময়ে রোদের তাপ অসহ্য হয়ে উঠে। ফলে আকাশকে নিয়ে ছই এর ভেতর ঢুকে পড়তে বাধ্য হই।

আমাদের ভেতর ঢুকতে দেখে প্রণববাবু তাঁদের একটি ব্যাগ খুলে কিছু পাউরুটি, সেদ্ধ করা ডিম ও খাবার-জল বার করেন। খাবারগুলো তিনি আমদের সবার মধ্যে ভাগ করে দেন। প্রণববাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে এবং আমি খোশ মেজাজে কথা বলতে বলতে খাবারগুলো খেয়ে বেশ একটা পরিতৃপ্তি লাভ করি। কিন্তু আকাশ নির্বাক। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে ডিম-পাউরুটি খেয়ে এক ব্যথাতুর চেহারায় উদাসভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমরা মজাদার কিছু কথা বলে আকাশের নীরবতা ও বিমর্ষতা দূর করে তাকে সবাক করে তুলতে চেষ্টা করি। তাতে কাজ হয়, সে মুখ খোলে। তার সম্পর্কে আরো কিছু জানার উদ্দেশ্যে আমি এক সময় আকাশকে বলি, চা-মিষ্টির দোকানে শুনলাম, তুমি পেট ব্যথায় কাতর। দূরের সমসেরনগর থেকে এসেছ। তোমার পেট ব্যথা কি হঠাৎ করে আরম্ভ হয়েছে, নাকি অনেকদিন ধরেই ভুগছ?

গত প্রায় তিনমাস ধরে আমি দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় পেট ব্যথায় ভুগে আসছি, বলে আকাশ আমার কথার উত্তর দেয়। আমি জিজ্ঞেস করি, চিকিৎসা করাচ্ছ না?

উত্তরে সে বলে, হ্যাঁ, চিকিৎসা মোটামুটি করিয়েছি। ট্যাবলেট খেলে ব্যথাটা সাময়িকভাবে কমে, কিন্তু বড় কাহিল হয়ে পড়ি। এ কারণে ট্যাবলেট আর তেমন খাচ্ছি না। অসহনীয় ব্যথার সময় পেট ভরে জল খেলে ব্যথাটা কিছুক্ষণের জন্য কম থাকে, তাতে দুর্বলতাও তেমন দেখা দেয় না। এবার বাড়ি গিয়ে বুড়িশ্বরের বিখ্যাত কবিরাজ, চৌধুরি মশায়কে দিয়ে ভালভাবে চিকিৎসা করাব।

আমি আকাশকে আবার জিজ্ঞেস করি, এবার কোন্ ক্লাসে পড়ছ?

সে বলে, ক্লাস এইট এর বই কিনে এবছর পড়াশোনা করছি।

তুমি বললে, তোমার সাথে টাকা-পয়সা নেই। পথ খরচ বাবত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ নিয়ে কি তুমি সমসেরনগর থেকে রওয়ানা হও নি? আকাশকে আবার প্রশ্ন করি।

আমার প্রশ্ন শুনে আকাশ কয়েক মুহূর্তের জন্য কী যেন ভেবে নেয় বলে মনে হল। তারপর সে বলে, অযাচিতভাবে আপনাদের স্নেহ ভালবাসা ও সহানুভূতি পেয়ে আমার বিশ্বাস, আপনারা যথার্থই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনাদের দ্বারা আমার কোন রকম ক্ষতি হতে পারে না। তাই, আমার সাথে এখন টাকা-পয়সা না থাকার কারণ সম্পর্কে অকপটে বলছি, আসলে আমি ভারতের কৈলাশহর থেকে দেশের বাড়ি যাচ্ছি, এদেশের সমসেরনগর থেকে নয়। বৈধভাবে ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে যাতায়াত করতে হলে তো পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে তা করতে হয়। কিন্তু নানারকম জটিল নিয়ম কানুনের কারণে এবং টাকা-পয়সা ও সময় ব্যয় করতে হয় বলে সবার পক্ষে প্রয়োজনে পাসপোর্ট ভিসা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে, কোন কোন ক্ষেত্রে অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে বহু সংখ্যক সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরিব অংশের মানুষ এবং ছাত্র ভারত -পাকিস্থানের মধ্যে অবৈধভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পথে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়।

দীর্ঘ দিনের পেট ব্যথার ভাল চিকিৎসা করাতে, অন্য অনেকের মত আমিও বাধ্য হয়ে গতকাল সকালবেলা অবৈধ পথে কৈলাশহর থেকে দেশে, বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করি। আমাকে ভারত-পাকিস্থানের দু'টি চা বাগান ও কিছু বনজঙ্গল যুক্ত টিলাভূমির মধ্য দিয়ে লুকিয়ে প্রায় বার কিলোমিটার হেঁটে পাকিস্থানের সমসেরনগর রেলস্টেশনে পৌঁছতে হবে এবং সেখান থেকে ট্রেন ধরে গন্তব্যস্থলে যেতে হবে। কিন্তু বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করাটা আমার পক্ষে সেদিন মোটেই শুভ হয়নি। ঘটনা পরম্পরায় দেখতে পাচ্ছি, গতকাল, থেকে আমার সময় বেশ খারাপ যাচ্ছে।

গতকাল খুব দ্রুত পা চালিয়ে আমি যখন ভারতের চা বাগান অতিক্রম করে পাকিস্থানের আলিনগর চা বাগানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি টিলার পাদদেশে একটি ছড়া (স্রোতস্বিনী) পার হতে যাব, তখন হঠাৎ করে বহু সংখ্যক উড়ন্ত পাখির কলরব এবং এগাছ থেকে ওগাছ লাফা লাফিতে ব্যস্ত বানরের চেঁচামেচি শুনতে পাই। পরক্ষণেই লেজ খাড়া করে একপাল গরু বাছুর এবং এক রাখাল বালককে ছড়ার ওপারের গোচারণ ভূমি থেকে আমার দিকে প্রাণপণে ছুটে আসতে দেখা যায়। আমি কোন কিছু বুঝতে না পেরে পথের একপাশে-থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রাখাল বালকটি কাছে আসলে তাকে জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার , গরু তাড়াতে তাড়াতে দৌড়াচ্ছ কেন ?

উত্তরে বালকটি বলে, ছড়ার ওপারে গরুর পালে বাঘ পড়েছে! তাড়াতাড়ি পালাও।

রাখালটির কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপতে থাকে। এর মধ্যেই এক নজর ছড়ার ওপারের গোচারণ -ভূমির দিকে তাকাই। দেখতে পাই, ভয়ংকর এক বাঘ একটি বাছুরের ঘাড় কামড়ে ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পাশের বনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে আমিও প্রাণ নিয়ে রাখাল বালকের পেছন পেছন ছুটতে থাকি। কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর, অপেক্ষাকৃত এক পরিষ্কার জায়গায় আমরা থামি, বসে পড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। একটু সময় বিশ্রাম নেবার পর, রাখাল বালকটি আমাকে-সমসেরনগর যাবার অন্য এক ঘুর-পথ ধরিয়ে দেয়। সেই পথ ধরে ঘুরপাক খেতে খেতে , অনেক সময় নিয়ে বেলা প্রায় এগারটায় আমি সমসের- নগর পৌঁছি এবং জানতে পাই, আমার ধরার মত ট্রেনটি সাড়ে দশটায় চলে গেছে। আমাদের ছাতিয়াইন ষ্টেশনে থামে, এরকম পরবর্তী গাড়ি রাত সাড়ে আটটায়। এসব জেনে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

কারণ, সাড়ে আটটার গাড়ি ধরে দশটা নাগাদ ছাতিয়াইন স্টেশনে নেমে, ভাটি অঞ্চলে

জলপথে বেশ দূরে আমার বাড়ি পৌঁছা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে আমার কাছে প্রায় অপরিচিত সমসের-নগরে থাকার মত কোন জায়গাও নেই, সেখানে আমি দিনের বাকি সময় ও রাত্রিটা কাটিয়ে পরদিন সাড়ে দশটার গাড়িতে বাড়ি যেতে পারি। এতসব আকাশপাতাল ভেবে আমি অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। এ অবস্থায় চিন্তান্বিত হয়ে আমি আস্তে আস্তে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করি, দেখতে পাই ওয়েটিং রুমটি বেশ ফাঁকা, তাতে কয়েকটি লম্বা বেঞ্চি পাতা। আমি জানালার পাশের একটি বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম নিতে থাকি। বসে বসে এক সময় মনঃস্থিরও করে ফেলি যে, রাত সাড়ে আটটার গাড়িতে গিয়ে অসুবিধের মধ্যে পড়লেও আমার পরিচিত স্থান, ছাতিয়াইনই আমি চলে যাব, সমসেরনগর থাকব না। কিছু খেয়ে নিয়ে স্টেশনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতে থাকি। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি আবার ওয়েটিং রুমে ফিরে এসে বসি।

ওয়েটিং রুমের জানালা দিয়ে আসতে থাকা ফুরফুরে হাওয়া আমাকে এক সময় নিদ্রাভিভূত করে তোলে, নিদ্রাবেশে অচিরেই আমি আমার বাক্সটির উপর মাথা রেখে বেঞ্চিটিতে শুয়ে পড়ি এবং অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমেও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার ঘুম ভাঙ্গে। ট্রেনের সময় এগিয়ে আসছে বুঝে আমি টিকিট কাটতে কাউন্টারে যাই। কিন্তু টাকা বার করতে জামার ঘড়ি-পকেটে হাত দিয়ে আমি আঁতকে উঠি। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখতে পাই, পকেটে সযত্নে রাখা আমার পথ খরচের টাকাগুলো নেই! তাতে দিশেহারা আমি ক্ষীণ আশা নিয়ে এখনও প্রায় ফাঁকা ওয়েটিং রুমসহ এদিক-ওদিকে ছোটাছুটি করে আমার টাকা খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। কিন্তু খোঁজাই সার হল, টাকা আর পেলাম না! এরকম সঙ্কটজনক অবস্থায়, ভারত থেকে অবৈধভাবে আগত আমি, ভয়, সঙ্কোচ, ইত্যাদি ত্যাগ করে আমার সব কিছু জিম্মা রেখে স্টেশনের কাছাকাছি কয়েকটি দোকান থেকে গাড়ি ভাড়ার জন্য কয়েকটি টাকা ধারে পেতে চাইলাম। কিন্তু কারো কাছ থেকেই তা পেলাম না। পক্ষান্তরে অ্যামাকে কিছু বিরূপ কথা শুনতে হল।

বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে অনেক চিন্তা-ভাবনা করি। উপায়ান্তর না দেখে শেষপর্যন্ত এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই যে, আমি বিনা টিকিটেই ট্রেনে উঠে পড়ব । টিকিট চেকাররা ধরলে, তাঁদের আমি আমার দুর্বিপাকের কথা বলে রেহাই পেতে চেষ্টা করব।

আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাড়ি ধরতে আমি প্ল্যাটফরমে পায়চারি করতে থাকি। যথাসময়ে গাড়ি এসে সমসেরনগর থামে। আমি গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি পরক্ষণেই চলতে আরম্ভ করে। ভানুগাছ স্টেশনে পৌঁছে গাড়ি থামার পর, এক টিকিট চেকার আমাদের কামরায় উঠে আসেন। স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি অন্যদের মত আমার কাছেও টিকিট চাইলেন। আমি তাঁকে আমার বিড়ম্বনার কিছু কথা বলে, তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি আমাকে কোনরূপ অনুকম্পা দেখাতে নারাজ। কড়া এক ধমক দিয়ে তিনি আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন । পুরোপুরি অচেনা ভানুগাছে রাত্রিবেলা এরকম অবস্থায় প্রথমে আমি অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়ি , অবশ্য পরক্ষণেই আবার সক্রিয় হয়ে উঠি। নিজেকে বিপন্মুক্ত রাখার অন্য আর কোন উপায় দেখতে না পেয়ে গাড়ি স্টেশন ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্তে মরিয়া হয়ে আমি অন্য আর এক কামরায় লাফিয়ে উঠে পড়ি। এ কামরাটিতেও তখন অন্য আর এক টিকিট চেকারকে আমি কর্মরত অবস্থায় দেখতে পাই। যথারীতি দ্বিতীয় চেকারও আমার কাছে টিকিট চাইলেন। তাঁর চাহিদামত আমি টিকিট দেখাতে না পারায় তিনিও আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠেন। আমি বিনীতভাবে কিছু বলতে গেলে,

তিনি তা শুনতেই চাইলেন না, জোরাজুরি করে আবার চলতে আরম্ভ করা গাড়ি থেকে আমাকে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে নামিয়ে দেন। আমি তখন নাছোড়বান্দা হয়ে চলন্ত গাড়ির শেষ দিকে গার্ড এর কামরায় এক দুঃসাহসিকের মত লাফিয়ে উঠি। আমাকে এভাবে গাড়িতে উঠতে দেখে গার্ড বিস্মিত ও বিরক্ত হন, তবে সৌভাগ্যবশত অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন নি। তিনি ধৈর্য ধরে আমার কথাশুনে আমাকে বসতেও বলেন। এরপর পড়াশুনা ও খেলাধুলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা ও হয়। রাত দশটা নাগাদ গাড়ি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন নির্জন ছাতিয়াইন স্টেশনে পৌঁছলে, দরদী গার্ড সাহেব খুশি মনে আমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেন। যাত্রী আমি একাই।

গাড়ি থেকে নেমে গাঢ় অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুনতে পাচ্ছিলাম শুধু ঝিঁঝি পোকা আর শেয়ালের ডাক। এরই মধ্যে অদূরে, স্টেশন ঘরের পাশের রেল গেট-এ একজন একটা বড় আকারের জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে করে এসে দাঁড়ান। আলো সহ লোকটিকে দেখে আমি খুশি ও সাহসী হয়ে উঠি তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে যাই। কাছে যেতেই লোকটি আমার কাছে টিকিট চাইলেন। তাঁর চাহিদাও আমার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হল না। ফলে তিনি রেগে যান এবং আমার কাছে সিলেট থেকে ছাতিয়াইন পর্যন্ত দ্বিগুণ ভাড়া দাবি করেন। এক্ষেত্রেও আমি তার কথামত কাজ করতে না পারায়, তিনি অধিকতর রাগান্বিত হয়ে উঠেন এবং আমাকে পাশেই স্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টারে নিয়ে যান। আমার সম্পর্কে লোকটির বক্তব্য শুনে স্টেশন মাষ্টার ও আমাকে যথেষ্ট দোষারোপ করেন। নানা কথায় ভয় দেখিয়ে তিনি আমাকে বলেন, তুমি এখন আমাদের কাছে তোমার নাম-ঠিকানা দিয়ে এই বলে লিখিতভাবে অঙ্গীকার করে যাও যে, এক মাসের মধ্যে এখানে এসে তোমাকে বলা দ্বিগুণ গাড়ি ভাড়ার টাকাটা জমা দিয়ে যাবে।

স্টেশন মাস্টারের কথামত অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমি মুক্তি পাই। এভাবে আমার স্টেশনের ঝামেলা শেষ হলে, আমি চা-মিষ্টির দোকানটিতে গিয়ে আশ্রয় নেই। আমার আশ্রয় নেবার পরিণতির সব কথা তো আপনারা দোকানটি থেকেই জেনে এসেছেন। এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলছি না।

নির্বাক অবস্থা থেকে সবাক হয়ে আকাশ আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে অনেকক্ষণ ধরে কৈলাশহর থেকে ছাতিয়াইন পর্যন্ত তার পথ চলার দীর্ঘ কাহিনি বিবৃত করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক সময় সে প্রণববাবুর কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে যায়, তারপর চুপচাপ বসে থাকে। তখন আমরাও তেমন কোন কথা বলতে পারি নি। কেবল প্রণববাবুর স্ত্রী '' বিপদ একা আসে না'' বলে স্বগতোক্তি করেন।

চলতে চলতে একসময় আমাদের নৌকো ফান্দাউক পৌঁছে যায়। আকাশের কথা অনুযায়ী একটা ঘাটে নৌকো ভিড়ায়। আকাশ আমাদের নমস্কার করে মাঝিকে বলে, কাকু , একটু সময় এখানে অপেক্ষা করুন। আমি এক দৌড়ে আপনার নৌকো ভাড়া এনে দিচ্ছি।

আমরা সবে মিলে অনেক বলে কয়ে নৌকো ভাড়া দেবার ব্যাপারে আকাশকে নিরস্ত করি। আকাশ তখন চলে যেতে উদ্যত হয়, আমরাও হাসিমুখে তাকে বিদায় জানাই। সে আমাদের ছেড়ে চলতে থাকে। আমাদের নৌকোও সামান্য দূরে মোড়াকরির দিকে আবার চলতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা প্রণববাবুদের বাড়ির ঘাটে পৌঁছে যাই। সৌজন্যমূলক কিছু কথা বলে সরকার পরিবার আমার কাছ থেকে বিদায় নেন। এবার আমাকে কৃষ্ণপুর পৌঁছে দিতে মাঝি নৌকো ভাসায় এবং যথাসময়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেয়।

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সমাদর পেয়ে কৃষ্ণপুরে আমার দিন বেশ ভালই কাটতে থাকে।

এক সকালে গ্রামের এদি ক-ওদিকে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর, আমাদের জ্ঞাতি দক্ষিণের কাকার বাড়ি গিয়ে আবার হাজির হই। উদ্দেশ্য খুড়িমার হাতের চা খাওয়া ও গল্প-সল্প করে সময় কাটানো। কাকা ও খুড়িমাকে ডাকতে ডাকতে তাঁদের বার-বাড়ির উঠানে পা দিয়েই আমি অবাক হয়ে আবার দেখতে পাই সেই আকাশকে , যাকে সাথে নিয়ে সেদিন ছাতিয়াইন থেকে ফান্দাউক পর্যন্ত এসেছিলাম। লক্ষ্য করি,আকাশ কাকাদের অতীত ঐতিহ্যবাহী চমৎকার কারুকার্যমন্ডিত দুর্গামন্ডপের সামনে কতকগুলো শুকনো ডালপালা কেটে জ্বালানি তৈরিতে ব্যস্ত। ওদিকে আমাকে দূর থেকে দেখামাত্র আকাশও চমকে ওঠার মত কোন কিছু দেখল বলে মনে হল! আমার চেহারা দেখার সাথে সাথে সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে মন্ডপের পেছন দিকে চলে যায়। ওর কাছে গিয়ে আমাকে কথা বলার কোন সুযোগই দেয়নি।

অপ্রত্যাশিতভাবে আকাশকে আবার দেখতে পাওয়াটা আমাকে বিশেষভাবে বিস্মিত করে তোলে। কারণ, সেদিন ছাতিয়াইন থেকে আমাদের সাথে এসে , আগ থেকে তার বলা কথা অনুযায়ী আকাশ নৌকো থেকে ফান্দাউক নেমে যাওয়ায়, আমাদের ধারণা হয়েছিল আকাশের বাড়ি ফান্দাউক। পরক্ষণে অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু চিন্তা করে দেখলাম, আকাশ সেদিন নিজে একবারও বলে নি যে, তার বাড়ি ফান্দউক।

সে চা- মিষ্টির দোকানকর্মী গোপালকে বলেছিল,'' কাল ভোরেই আমি ফান্দাউক চলে যাব। আর আমাদের বলেছিল, ফান্দাউক পৌঁছে আমাকে টাকা সংগ্রহ করে নৌকো ভাড়া দিতে হবে।

আমার ডাক শুনে খুড়িমা ইতিমধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, আমাকে ঘরে যেতে বলেন। আমি আকাশ সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকি । দেখলাম, কাকা ঘরে নেই। খুড়িমা সকালের রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। একই সাথে উনুন থেকে কিছুটা দূরে, তাঁদের ছোট দুই ছেলে-মেয়েকে বড় বড় পিঁড়ির উপর বসিয়ে তিনি পড়াশোনাও করাচ্ছেন। একটা টুল এনে তিনি আমাকে তাঁদের বড় ও রান্নাঘরের মধ্যকার দরজার পাশে বসতে দিলেন। আমি বসে কথা বলতে আরম্ভ করি। খুঁড়িমা আমার সাথে একাধারে কথা বলা ও-রান্না করা চালিয়ে যেতে থাকেন। এসব করার ফাঁকে তিনি আবার চাও করে ফেলেন।

চা খেতে খেতে আমরা উভয়ে কথা বলে কিছুক্ষণ কাটানোর পর, আমি ঔৎসুক্যপূর্ণ মনে আকাশের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করি। আমি খুড়িমাকে জিজ্ঞেস করি, আপনাদের দুর্গামন্ডপের সামনে একটি ছেলেকে ডালপালা কাটতে দেখে আসলাম। এ ছেলেটি কে?

আমার কথা শুনে খুড়িমা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলেন; আরে, ছেলেটার সাথে এখনো তোমার পরিচয় হয় নি? ও তো তোমার খুড়তুতো ভাই, আমাদের দ্বিতীয় ছেলে আকাশ। তাকে অবশ্য তোমার না চেনারই কথা। তার জন্মের পর তোমরা তো আর বেশিদিন দেশে থাক নি! এ যাত্রায় তুমি যে দিন প্রথম আমাদের বাড়ি এলে, সেদিনই আকাশকে ডেকে এনে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া আমাদের উচিত ছিল। আকাশ ভারতের কৈলাশহরে পড়াশোনা করে। শক্ত অসুখে পড়ে সেদিন সে বাড়ি এসেছে। কবিরাজি চিকিৎসা করাচ্ছি, তার সুফলও কিছুটা দেখতে পাচ্ছি। আজ আরো সকালে আবার ওষুধ আনতে, ডিঙ্গি নিয়ে তার বুড়িশ্বরে কবিরাজ মশায়ের বাড়ি যাবার কথা ছিল। কিন্তু যাচ্ছি যাচ্ছি বলে কড়া রোদের দিনের এত বেলা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে যাচ্ছে না। আমার রান্নার লাকড়ি (জ্বালানি কাঠ) তেমন শুকনো নয় লক্ষ্য করে, আমাকে শুকনো

লাকড়ি যোগাতে সে তৎপর হয়ে উঠেছে। আমি তাকে বারবার ওষুধ আনতে যাবার জন্য তাগিদ দিচ্ছি। কিন্তু নাছোড়বান্দা ছেলে এখনো পর্যন্ত না গিয়ে গাছের মরা শুকনো ডালপালা কেটে এনে আমাকে লাকড়ি যোগিয়েই চলছে।

আমাদের কথার মাঝে খুড়িমার রান্না করা এক সময় শেষ হয়ে যায়। পাঠরত ছেলে-মেয়ে দু'টিকেও তিনি ছুটি দিয়ে দেন, আমাকে বলেন, তুমি একটু সময় বস। আমি আকাশকে ডেকে এনে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। কিছুটা সময় নিয়ে খুড়িমা আকাশ সহ ফিরে এসে আমাকে বলেন, দেখনা বাবা , ছেলেটা লজ্জায় তোমার কাছে আসতে গড়িমসি করতে থাকে। শেষপর্যন্ত আমার বকা খেয়ে আসে।

আকাশের মানসিক আবস্থাটা অনুমান করে আমি পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে তাকে কোন কিছু বলি নি। মার নির্দেশে সে আমাকে প্রণাম করলে আমি তাকে বলি, পরে তোমার সাথে একান্তে বসে মজা করে কথা বলব। আমার কথায় সায় দিয়ে আকাশ চলে যায়।

আমি খুড়িমাকে আবার জিজ্ঞেস করি, আপনারা আকাশকে এত দূর দেশে, কৈলাশহরে পড়াশোনা করতে পাঠালেন কেন? সেখানে রেখে পড়ানোর মত আপনাদের কি বিশেষ কোন সুবিধে আছে?

উত্তরে খুড়িমা বলেন, সে অনেক কথা, বড় দুঃখ ও উদ্বেগজনক কথা। এখন কৈলাশহরে কর্মরত আমার ছোট মামাশ্বশুর , তাঁদের এক দুঃসময়ে আমাদের কাজে খুশি ও সদয় হয়ে বলে রেখেছিলেন যে, তিনি আবার সুদিন ফিরে পেলেই আকাশ ও তার ছোট ভাই চাঁদকে তাঁর সংসারে রেখে পড়াশোনা করাবেন। সুদিনের নাগাল পেয়ে মামাশ্বশুর আন্তরিকভাবে তাঁর কথা রেখেছিলেনও। তাঁর মমত্ববোধ ও উদারতার গুণে মুগ্ধ হয়ে ,আমরাও আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা ভেবে , বছর তিনেক আগে ছেলে দু'টিকে ভারতে পড়াতে মামাশ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দেই। ছেলেরা সেখানে আনন্দের মধ্যে পড়াশোনা করে দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু আনন্দে জীবনযাপন ও পড়াশোনা করা আমাদের ছেলেদের ভাগ্যে বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। মামাশ্বশুরের বাড়িতে বিশেষ এক প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় আকাশ চাঁদকে নিয়ে দু'বছর আগে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। পরে চাঁদকে এদেশের স্কুলেই ভর্তি করিয়ে, সে ভারতেই অন্য বাড়িতে থেকে পড়বে বলে স্থির করে আবার কৈলাশহর ফিরে যায়। বছরে এক দু'বার বাড়ি আসে! যে ব্যক্তি মামাশ্বশুরের বাড়িতে ছেলেদের পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, সে বড় ভয়ংকর। এ কারণে আকাশের কথা ভেবে অনেক সময় বেশ একটা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাই। এতটুকু বলার পর লক্ষণীয় রকম বিমর্ষ চেহারায় খুড়িমা কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে যান। আমিও তাঁর মানসিক অবস্থাটা আঁচ করতে পেরে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে আর কোন কথা বলিনি। অন্য প্রসঙ্গে আর সামান্য সময় কথা বলে আমি আমার আবাসস্থলে ফিরে আসি।

পরদিন বেশ সকালে আমি আবার দক্ষিণের বাড়ি যাই। উঠান থেকে আকাশকে ডাকি। আমার ডাকে কাকার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বেরিয়ে এসে আমাকে ঘরে যেতে বলেন। আমি আকাশকে সঙ্গে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণ করতে যাব বলায়, কাকা আকাশকে ডেকে দেন। আমি আকাশকে নিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করি। সেদিন আমাদের মধ্যে দেশবাড়ির পরিবেশ পরিস্থিতি ও খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কিছু কথা হয়। এভাবে দু'দিন বেড়ানোর পর আমাদের মধ্যে বেশ ভাব জমে ওঠে। তৃতীয়

দিন আমি আকাশকে বলি, তোমাদের বরুণও মেরাগাছের বাগানবাড়ি, সন্ন্যাসীর ভিটাটিকে এখন আমার কাছে ভারী সুন্দর এক দ্বীপ বলে মনে হয়। চলনা, আজ আমরা সেখানে বেড়াতে যাই। আকাশ বেশ খুশি মনে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়। আমরা যথারীতি ডিঙ্গি নিয়ে সন্ন্যাসীর ভিটে যাই।

স্থানটি সত্যিই অতি চমৎকার, তার চারিদিকে ঢেউ খেলায় মত্ত পরিষ্কার জল। জলে মাছ ধরায় ব্যস্ত অনেক ডিঙ্গি ও যাত্রীবাহী নৌকো দেখতে পাই। বর্ষার নয়ননন্দন এরকম দৃশ্য বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর, আমরা বড় এক বরুণ গাছের নিচে বসি। নানা কথায় কিছু সময় কাটিয়ে আমি স্মিত মুখে আকাশকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কৃষ্ণপুরের ছেলে, অথচ ছাতিয়াইন থেকে এসে সেদিন ফান্দাউক নেমে গেলে। বিশেষ কোন কাজ সারতে কি তুমি ফান্দাউক নেমেছিলে?

একটু সময় নিয়ে আকাশ বলে, না, কোন কাজ করতে আমি ফান্দাউকের বাজার ঘাটে নামিনি। আমি নেমেছিলাম অন্য কারণে। তাহল, আপনাদের ও শোনা চা-মিষ্টির দোকানকর্মীর কাছে আমার বলা কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে , ফান্দাউক বাজারে কর্মরত আমার এক পিসতুতো দাদার কাছ থেকে টাকা এনে নৌকো ভাড়া দিতে এবং আপনাকে এড়িয়ে থাকতে। তাছাড়া আজ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন আমাদের বাড়ি তো পুরো ছাতিয়াইন অঞ্চলেও পরিচিত। এবাড়ির ছেলে হয়ে আমি বিনা টিকিটে রেলগাড়ি চড়েছি এবং পরবর্তী সময়ে এক বিশ্রী ব্যাপার, চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছি বলে এ অঞ্চলের মানুষ জানতে পারলে, কারণ ও সত্যাসত্য বিচার না করেই, আপাতদৃষ্টিতে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে ওরা আমাদের বাড়িটার বিরূপ সমালোচনা করা আরম্ভ করে দিত। একারণে অন্য কারো কাছেও আমি কোথাকার, কোন্ বাড়ির, কার ছেলে বলে উল্লেখ করি নি এবং ফান্দাউক বাজারে আপনাদের নৌকো থেকে নেমে পড়ি।

জবাব শুনে আমি আবার স্নেহকোমল কণ্ঠে আকাশকে বলি, খুড়িমার মুখে শুনলাম , তোমরা দু'ভাই তোমাদের এক দাদুকে অবলম্বন করে কৈলাশহরে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলে। কিন্তু বিশেষ এক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তুমি ছোট ভাইকে নিয়ে দাদুর বাড়ি ত্যাগ করে চলে এসেছ এবং ছোটভাইকে এদেশের স্কুলে ভর্তি করিয়ে তুমি অন্যত্র থেকে পড়াশোনা করতে , আবার কৈলাশহরে ফিরে গেছ। দাদুর বাড়িতে তোমাদের থাকার ও পড়ার পরিপন্থী ব্যাপরটা কী রকম দাঁড়িয়েছিল এবং এখনই বা তুমি কোথায় থেকে পড়া চালিয়ে যাচ্ছ, তা কি তুমি আমাকে বলতে পার?

আমার কথা শুনে আকাশ কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকে। তখন তাকে দেখে মনে হয় সে যেন কিছুটা চঞ্চল ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আবার বলতে বলায়, সে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করে, আমরা কৈলাশহর যাবার বছর খানেক পর, আমাদের দুই কাকা, দাদুর দুই বেকার যুবক ছেলে, তাঁদের প্রবাসী জীবনের ছেদ টেনে বাপের সংসারে চলে আসেন! আসার কিছু দিনের মধ্যেই, আমরা লক্ষ্য করি, কাকুদের মধ্যে বড়জন-চাঁদ ও আমার প্রতি আচার -আচরণে বিরূপ ভাব প্রকাশ করতে শুরু করেন। দিনে দিনে তার এরকম আচরণের মাত্রা বাড়তে বাড়তে এক সময় ক্রূরতায় পরিণত হয়। আমাদের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য বিচার না করে, আমরা দুই ভাইকে তিনি দিনের অধিকাংশ সময় নানা কাজে ব্যস্ত রাখতে তৎপর হয়ে উঠেন। পড়াশোনা করার সময়, এমন কি স্কুলে যাবার মুহূর্তেও তিনি মোটেই জরুরি নয় এমন সব কাজ করতে আমাদের বাধ্য করতে আরম্ভ করেন। ফলে মাঝে মাঝেই আমাদের স্কুল কামাই হতে থাকে।

আমরা পড়াশোনায়ও পিছিয়ে পড়তে শুরু করি। তাঁর মর্জি অনুযায়ী ছুটির দিনে এবং কোন কোন দিন আমাদের স্কুল কামাই করিয়ে তিনি তাঁদের বেশ বড় আকারের বাড়ি ঘর পরিষ্কার ও বাড়ির সীমানার বেড়া তৈরি ও মেরামতি করার কাজে আমরা দুই ভাইকে লাগিয়ে দিতেন। তাঁদের বাড়ির ভেতরে অবস্থিত একটি ডোবার জল সেচে মাছ ধরতেও তিনি আমাদের বাধ্য করতেন।

এক সময় বড় কাকার শখ হয়, তিনি তাঁদের বাড়ির ভেতরকার সামনের বেশ ভাল পরিমাণ ফাঁকা জমিতে শাক-সব্জীর বাগান করবেন। তা করাতে তিনি আমাদের হাতে দা, কোদাল, খুন্তি ইত্যাদি তুলে দেন। জমি চাষ, বীজবপন, শাক-সব্জীর পরিচর্যা করা ও জমিতে জল দেওয়া সম্পর্কে নানা রকম নির্দেশ দিয়ে তিনি সব্জী বাগানের পাশে একটি ইজি চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় থেকে, আমাদের কাজ তদারকি করতেন। তার নির্দেশিত কাজে আমাদের কোন ত্রুটি -বিচ্যুতি তিনি কোন অবস্থাতেই সহ্য করতে পারতেন না। দৈহিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে কোন কাজে আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে, তিনি প্রচন্ডভাবে রেগে কান্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে যথেচ্ছভাবে মারধর করতেন। আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর কথামত কাজ করে তাঁকে খুশি রাখতে চেষ্টা করতাম। তা সত্বেও কোন কোন দিন আমাদের কাজে কিছু কিছু ত্রুটি ধরা পড়ত। তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে আমাদের ভাগ্যে শাসনরূপ নিপীড়ন নেমে আসত।

একদিন চাঁদ ও আমাকে সব্জী বাগান সম্পর্কিত কাজে কিছু কড়া নির্দেশ দিয়ে বড়কাকা কৃষ্ণপুরে আমাদের বাড়িতে যান। তাঁর বাবার সংসারে থেকে আমাদের পড়াশোনা করার বিনিময়ে, এমন কোন পূর্বশর্ত না থাকলেও, তিনি আমার মা-বাবার কাছে দশ হাজার টাকা দাবি করেন। আমার মা-বাবার হঠাৎ করে একসাথে এত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই! তাঁরা কিছু ধার দেনা করে কোন রকমে বড় কাকাকে দু'হাজার টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন। খোশমেজাজে টাকাটা নিয়ে বড় কাকাও কৈলাশহর ফিরে আসেন। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে ঢুকেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। তিনি অকথ্য ভাষায় চাঁদ ও আমাকে গালিগালাজ ও ডাকাডাকি করতে থাকেন। একসময় তিনি সিংহবিক্রমে বলেন, ... বাচ্চা দু'টোকে আজ জুতোপেটা করে, লাথি মারতে মারতে বাড়ি থেকে তাড়াব। আমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকা সত্বেও আমার চাহিদা মত না দিয়ে, ওরা ভিখারীকে ভিক্ষা দেবার মত করে মাত্র কয়েকটি টাকা দিয়ে আমাকে বিদায় করে দিল। আড়ালে থেকে বড় কাকার ভয়ংকর রূপ দেখে আমরা ভীষণ ঘাবড়ে যাই। ভয়ে জড়সড় হয়ে আমি চাঁদকে নিয়ে ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেই। পরে, রাত বাড়লে অবশ্য ছোটকাকা আমাদের আশ্বস্ত করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। বড় কাকাও সেদিনের মত আর বাড়াবাড়ি করেন নি।

আমার মা-বাবার কাছে তাঁর চাহিদামত টাকা না পেয়ে বিগড়ে যাবার কিছুদিন পর, বড়কাকা এক সন্ধ্যায় চাঁদও আমাকে বড় বালতিতে করে পুকুর থেকে জল তুলে এনে সব্জী বাগানে দিতে বলেন। আমাদের এরকম নির্দেশ দিয়ে তিনি অভ্যাসমত তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আমাদের জল দেওয়া পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। কয়েক বালতি জল দেওয়ার পর, এক সময় বালতি ভরতি জল নিয়ে চলার পথে, আগাগোড়াই দুর্বল চাঁদ টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায়। তাতে সে বেশ ব্যথাও পায়। বড়কাকা কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে চাঁদেব ওপর খুব চটে যান। চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি চড়া গলায় বলেন, হারামজাদা ভেলকিবাজ, দিনে তিন থালা ভাত উজাড়

করছিস্, আর দু'বালিতি জল দিতে পারছিস্ না! দাঁড়া তোর ভেলকিবাজি ছাড়াচ্ছি! বলেই তিনি চাঁদকে খুব মারধর করেন এবং তাকে বাগানে আরো জল দিতে বাধ্য করেন।

পড়ে গিয়ে মার খেয়ে ও বেশি পরিমাণে জল দিয়ে চাঁদ রাতের দিকে দৈহিক ও মানসিকভাবে বেশ কাহিল হয়ে পড়ে। একই বিছানায় আমার পাশে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে, মা, মা বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তাতে আমার কোন দৈহিক ব্যথা না থাকলেও মনোব্যথায় আমি ও কাতর হয়ে পড়ি! এ অবস্থায় আমি গভীরভাবে ভাবতে থাকি, বড় কাকার অত্যাচারে-উৎপীড়নে আমাদের জীবনে যে কোন দিন বড় যে কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাই এখানে আর নয়, মা-বাবা আমাকে কি বলবেন, না বলবেন চিন্তা না করে আমি এক বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি-। বই কেনার জন্য বাড়ি থেকে দেওয়া যে টাকা-পয়সা আমাদের কাছে আছে তা খরচ করে আগামীকালই খুব ভোরে , অন্ধকার থাকতে আমরা দাদুর সংসার ত্যাগ করে বাড়ি চলে যাব। ফিসফিস করে চাঁদকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলি, বাড়িতে গিয়ে, কোথাও তোর পড়ার একটা ব্যবস্থা করে আমি অন্য কোথাও থেকে ভারতের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পড়াশোনা করতে আবার কৈলাশহর ফিরে আসব। আমার মুখে এসব কথা শুনে চাঁদ খুব চনমনে হয়ে ওঠে। আমি তখন লক্ষ্য করি , কোন এক যাদুমন্ত্র বলে যেন তার সব ব্যথা-বেদনা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যায়। নাইট ল্যাম্প -এর ক্ষীণ আলোতেও তার মুখ বেশ উজ্জ্বল দেখায়।

দাদুর বাড়ির সবাই যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন , তখন বিশেষ সতর্কতায় আমরা দুই ভাই আমাদের কাপড়-চোপড়, বইপত্র ইত্যাদি স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ফেলি এবং যাত্রার জন্য ভোরের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকি। আস্তে আস্তে আমাদের বেরিয়ে পড়ার সময় হয়ে যায়, যথার্থ সময়ে দাদুর বাড়ির সবাইকে ঘুমন্ত রেখে আমরা বাড়ির উদ্দেশে পথ ধরি। পথে ভোরের বিশুদ্ধ হাওয়ায় আমরা মুক্তি স্নান করতে করতে এগিয়ে চলতে থাকি।

নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে , মা-বাবার পরামর্শমত চাঁদের পড়ার ব্যবস্থা করতে আমি আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করি। শেষ পর্যন্ত মহীয়সী সাধিকা, আমাদের ধনপিসিমা চাঁদকে তাঁর স্বল্প আয়ের সংসারে রেখে ছাতিয়াইন হাইস্কুলে পড়াতে রাজি হন।

চাঁদের পড়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর, আমি আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবার কৈলাশহরে ফিরে যাবার দিনক্ষণ স্থির করে ফেলি। মা-বাবাকে আশ্বস্ত করে বলি, আমার জন্য তোমরা মোটেই চিন্তা করো না। কৈলাশহরে আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু আছে। বন্ধুদের মা-বাবাও আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। আমি এসব বন্ধুদের কোন একজনের বাড়িতে ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে ও নিরাপদে থেকে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারব। আমার কথার ওপর আস্থা রেখে , মা-বাবা চেষ্টা চরিত্র করে আমাকে দু'শ টাকা দেন। টাকাটা সম্বল করে আমি কৈলাশহর ফিরে দাদুর বাড়ির পাশেই আমার বিশেষ বন্ধু মানিক ভট্টাচার্যদের বাড়িতে উঠি। মানিকরাও আমাদের মত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেনিভুক্ত। তা সত্ত্বেও আমার অনুরোধে সহানুভূতিশীল মানিকের বাবা তাঁদের জ্বালানি কাঠ রাখার বড় আকারের ঘরটিকে বেড়া দিয়ে ভাগ করে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর মা-বাবার কাছে বলা আমার কথা অনুযায়ী বাচ্চাদের পড়িয়ে আমার পড়ার সংস্থান করে নিতে চেষ্টা করি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা সুবিধেজনক বলে মনে হল না। তখন ভাবতে থাকি, বাড়ি থেকে নিয়ে আসা টাকাগুলো খরচ করে খেতে থাকলে তো বেশিদিন চলতে পারব না। আমাকে

আরো টাকা যোগানো মা- বাবার পক্ষেও দুষ্কর হয়ে উঠবে। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমি কৈলাশহর ও তার আশপাশের বাজারগুলোতে আমার সামান্য পুঁজিতেই পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানদারি আরম্ভ করে দেব। একই সাথে প্রতি বছর আমার নিয়মিত সহপাঠীদের অনুসরণ করে এক এক ক্লাসের বই কিনে, সেই বইগুলো সারা বছর ধরে বাড়িতে পড়তে থাকব। বছর শেষে বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হলে, কোন এক সহপাঠীর কাছ থেকে প্রশ্নপত্রগুলো নিয়ে এসে নিজেই নিজেকে পরীক্ষা করব। এভাবে পড়াশোনা করতে করতে যে বছর আমার নিয়মিত সহপাঠীরা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিবে, সে বছর আমিও প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হিসেবে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে পাস করব।

আমার দোকানদারি করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী , বিভিন্ন বাজারে আমার পক্ষে বহন করে যাতায়াত করা সম্ভব, এরকম ছোট আকারের টুল ও টেবিল যোগাড় করে এবং ব্যবসার সরঞ্জাম কিনে আমি অর্থ রোজগার করতে আরম্ভ করি। একই সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে থাকি। তবে এসব কথার কোন কিছুই মা-বাবাকে বলিনি। দয়া করে আপনিও তার সামান্যতম কিছুও আমার মা-বাবাকে বলবেন না। তাঁরা আমার এসব ক্রিয়াকলাপ-জানতে পারলে খুবই দুঃখ পাবেন, হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন। তাতে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

ব্যবসা করে, ও বাড়িতে পড়াশোনা চালিয়ে আমার দিন বেশ ভালই কাটতে থাকে। তবে বর্তমানে পেট ব্যথায় ভুগে কিছুটা কষ্ট পাচ্ছি। তা অবশ্য কবিরাজ মশায়ের ওষুধ খেয়ে তাড়াতাড়িই দূর হয়ে যাবে। তবে মনের আনন্দে স্বাধীনভাবে আমার চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে তাঁর আসুরিক প্রবৃত্তিতে সেই বড়কাকা এখনো তৎপর। তাও মনে হয় কোন এক দৈবশক্তিতে সামলে চলছি।

একথা শুনে আমি বলি, তুমি তো এখন আর বড়কাকাদের বাড়িতে থাকনা। এরকম অবস্থায় তাঁর পক্ষে তোমার বিরুদ্ধে কোন কিছু করা কি করে সম্ভব? না থাকলেও, মাস চারেক আগে একদিন ছলনা করে তিনি আমার ওপর এক অঘটন ঘটাতে চেষ্টা করেন। বলে আকাশ আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়।

আমি তখন বিশেষভাবে উৎসুক হয়ে ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে চাই। কথা বলে ইতিমধ্যে অধিকতর সহজ হয়ে উঠে আকাশও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলতে থাকে, সেদিন অন্যান্য দিনের ও লোকের মত আমি রাস্তার ওপারে, দাদুর বাড়ির সামনের একটা পুকুর থেকে স্নান করে দ্রুত বাড়ি ফিরছি। তখন কাঁধে এক গামছা ঝুলিয়ে বড় কাকাকে তাঁদের বাড়ির গেট-এ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাই। আমি তাঁর সামনা দিয়ে আসার সময়, দীর্ঘদিন ধরে বড় কাকার সাথে আমার কথা বলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, অস্বাভাবিক স্নেহকোমল কণ্ঠে তিনি আমাকে বলেন, বাবা আকাশ, একটু দাঁড়া। তুই তো আর আমাদের বাড়ি ঢুকিসই না। কেমন আছিস? আজ কী রান্না করেছিস্?

আমার তখন ভীষণ তাড়া। কারণ, আমাকে তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে পাহাড়ি পথ ধরে মফস্বলের এক বাজারে যেতে হবে। পাহাড় অঞ্চলের বাজারের রাস্তা হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও চোর -ডাকাতের আক্রমণে কোন কোন দিন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ কারণে আমরা, দোকানদাররা এখন বাজারের রাস্তায় একত্রে দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াত করে থাকি। তাই দু'চার কথায় বড় কাকার

কথার উত্তর দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে উদ্যত হই। তখন বড়কাকা এগিয়ে এসে আমার পথ আগলে দাঁড়ান, আর অতিমাত্রায় দরদীর মত বলেন, তুই যেভাবে এখন জীবন যাপন করছিস বলে শুনতে পাই, সেভাবে তোর বা আমাদের বংশের কেউ কি তা কোন দিন করেছে? পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ছোটলোকদের বাড়ির ছেলেদের মত চলছিস্। তাতে অন্যদের কাছে আমাদের ভীষণ লজ্জা পেতে হচ্ছে। দিনমজুরের মত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যা খাচ্ছিস্, তাতে আর কতদিন বেঁচে থাকতে পারবি। আমাদের ঘরে আজ মাছ-মাংস রান্না করা হয়েছে। আয়, কিছু তরকারি নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খা।

বড়কাকা হঠাৎ করে রত্নাকর থেকে বাল্মিকীতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় আমি বিস্মিত হই। সাথে সাথে আবার মারীচের সোনার হরিণ এবং রাবণের সাধু সাজার উদ্দেশ্য মনে পড়ায়, তাঁর ওপর সন্দিগ্ধও হয়ে উঠি।

ওদিকে আমি আর সময় নষ্ট করতেও পারছিলাম না। তাই বড়কাকাকে বলি আজ তরকারি নিতে আরো দেরি করলে আমার বাজারের সঙ্গীরা চলে যাবে। তাতে আমি বিপদে পড়ে যেতে পারি। অন্য আর একদিন তা নিয়ে যাব। আমি কথা বলা শেষ করতেই বড় কাকা আমার হাত ধরে ফেলেন , বলেন, আয়, আয় বাবা। কতক্ষণ আর লাগবে। তরকারিটা নিয়ে যা। কথাগুলো বলতে বলতে জোর করে তিনি আমাকে তাঁদের বসবাসের ঘর থেকে আলাদা, কিছুটা দূরে রান্না ঘরে নিয়ে যান। রান্না ঘরে তখন অন্য আর কেউ ছিল না । আমাকে রান্না ঘরে ঢুকিয়েই তিনি অতি ক্ষিপ্রতায় আমার নাগালের বাইরে, ওপর দিকের ছিটকিনি দিয়ে ঘরের একমাত্র দরজাটি বন্ধ করে দেন। পরক্ষণেই আমাকে জাপটে ধরে তাঁর কাঁধের গামছাটি দিয়ে আমার মুখ বেঁধে ফেলেন। পকেট থেকে একটি দড়ি বার করে আমার হাত দু'টো ও বেঁধে নিয়ে আমাকে প্রচন্ড মারধর করতে আরম্ভ করেন। আমি ভোঁ-ভোঁ করে গোঙাতে থাকি। কিছুক্ষণ পর আমাকে ছেড়ে তিনি ঘরের কোণে গিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকেন। একসময় বলে উঠেন , হারামজাদী বটিদাটা কোথায় রাখল? আজ বটি দিয়েই... .... বাচ্চাকে খুন করব।

এসব শুনে আমি হিংস্র বড়কাকার কবল থেকে রক্ষা পেতে মরিয়া হয়ে উঠি। ঘরের এদিক-ওদিকে তাকিয়ে আমার বাঁ দিকের পুরানো বাঁশের বেড়াটাকে জীর্ণ অবস্থায় দেখতে পাই। আর একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করে আমি বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে গিয়ে বেড়াটার উপর লাফিয়ে পড়ি। সৌভাগ্যবশত বেড়াটি ভেঙ্গে যায়, আর আমিও প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচি।

মানিকদের বাড়ির লোকজন সহ প্রতিবেশীরা আমার প্রতি বড় কাকার এরকম নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনাটি জেনে, খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে উকিল এবং পুলিশ অফিসার পদমর্যাদার দু'জনও ছিলেন। তাঁরা বলিষ্ঠ কয়েকজন যুবককে দিয়ে বড়কাকাকে মানিকদের বাড়ি ডেকে পাঠান। সে ডাকে বড়কাকা না এসে থাকতে পারলেন না। তিনি আসলে, সবাই মিলে তাকে খুব করে তিরস্কার করেন। শেষপর্যন্ত তাঁকে এই বলে শাসিয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি যদি ভবিষ্যতে আমার ওপর আর কোনদিন কোনরকম দুর্ব্যবহার করেন, তবে তাকে ভালরকম শাস্তি দিয়ে কৈলাশহর ছাড়া করা হবে। তাতে খুব কাজ হয়। আস্তিকমুনির প্রভাবে বশ-মানা এক বিষধর সাপের মত মাথা নত করে বড় কাকা অঙ্গীকার করেন, তিনি তাঁর জীবনে আর কোন দিন আমার ওপর কোন রকম অন্যায়-অবিচার করবেন না। এখনো পর্যন্ত তিনি তাঁর অঙ্গীকার মেনে চলছেন।

অনেকক্ষণ ধরে আমি এক সম্মোহিতের মত আকাশের জীবন সংগ্রামের কাহিনি শুনলাম। এক সময় প্রায় নিঃশব্দে আকাশকে নিয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসি। এরপর আর দু'দিন মাত্র কৃষ্ণপুরে থেকে আমি আগরতলা ফিরে আসি। ফেরার আগে, কৃষ্ণপুরে থাকাকালীন সময়ে ইচ্ছে অনুযায়ী পড়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া, আমার 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর ' প্রামাণ্য গ্রন্থখানি আকাশকে দিয়ে আসি, আর তাকে বলি, বইখানি মন দিয়ে পড়ো, পড়লে আদর্শ জীবন গড়তে উৎসাহ ও শক্তি পাবে।

আমার কৃষ্ণপুরে যাওয়া এবং আকাশের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে বহুবছর পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে আর একদিনও আকাশের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তা হয় নি। তবে তার স্মৃতিটা এখনো আমার মনে গেঁথে আছে। সেদিন প্রায় আকাশের সমসাময়িক , আর এক জ্ঞাতিভাই, বিনোদ অনেকদিন পর আমাদের বাড়ি আসে। কথা প্রসঙ্গে আমি বিনোদের কাছে আকাশ সর্ম্পকে জানতে চাই।

আমার জ্ঞাতব্য জানাতে বিনোদ উৎসাহিত হয়ে বলে, সেই ছোট বেলা থেকে আকাশ ও আমি ঘনিষ্ঠ দু'জন হিসেবে, আজো একজন আর একজনের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। যতটুকু জানি, আকাশরা বেশ ভাল আছে, অনেকটা নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। সে অল্প বয়স থেকে ব্যবসা, চাকরি ও সংসার করতে করতে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে স্পেশাল অর্নাস পর্যন্ত পাস করেছে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজীর বিষয় শিক্ষক রূপে কাজ করে অবসর গ্রহণ করে। তাদের অবসর জীবনে আকাশ ও তার স্ত্রী এখন কলকাতায় নিজেদের তৈরি বাড়িতে বছরের বেশির ভাগ সময় বসবাস করে। মাঝে মাঝে মর্জিমত এদিক-ওদিক ঘুরেও বেড়ায়। সে নিজেই যে শুধু পড়াশোনা করেছে, তা নয়। তাকে ভিত্তি করে তার স্ত্রী এবং ছোটরাও ভাল লেখাপড়া করে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত। তার ছেলে-মেয়ে দু'টিও ডাক্তার হয়েছে। দু'টি শুভকর্ম, ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেবার কাজও আকাশরা চাকরিতে বহাল থাকা অবস্থাতেই সম্পন্ন করতে পেরেছে।

বিনোদের কাছ থেকে আকাশের ঠিকানা এবং তার উদ্যমশীলতা ও কর্মকুশলতার কিছু কথা জেনে বেশ ভাল লাগল। তাই খুশি মনে, মোটেই দেরি না করে তার সর্ম্পর্কে বিনোদের বলা সব কথা উল্লেখ করে আকাশকে চিঠি লিখি।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আকাশের কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর পেয়ে যাই। সে লিখেছে , শ্রদ্ধেয় দাদা, আমার প্রণাম নিবেন। সেই কত, কত বছর আগে আমার সাথে পরিচিত হওয়া ও কথা বলার পর এখনো যে আমাকে মনে রেখেছেন, তাতে আমি ভীষণ আনন্দিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে প্রথমেই উল্লেখ করি যে আমাকে আপনার দেওয়া মহামূল্যবান গ্রন্থ 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' আমার জীবনে অনেক কল্যাণকর মন্ত্রের মত কাজ করেছে। আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকে আপনাকে এখানে, আমাদের মধ্যে পেতে খুব ইচ্ছে করছে। কয়েকটি দিন একসাথে কাটাতে, আপনি যদি আমাদের কাছে আসেন, তবে ভারী খুশি হব। আমার ধারণা, এখানকার শান্ত পরিবেশে আমাদের নিয়ে থাকতে আপনার কোন রকম অসুবিধে হবে না।

কেমন আছি, জানতে চেয়েছেন। অন্যের ব্যথা-বেদনার কারণ না হয়ে, নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কর্মকরে আনন্দে দিন কাটাতে আমি বরাবর চেষ্টা করে আসছি। এভাবে চলতে গিয়ে অনেক সময় আমি অন্যায়-অবিচার ও বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে কথা না বলে বা প্রতিবাদ না করে

থাকতে পারি না। এ কারণে, আবার কোন কোন সময় অকারণেও কোন কোন লোক, এমন কি কিছু সংখ্যক উপকৃত বিশেষ বিশেষরাও আমার উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। বিরুদ্ধভাবাপন্ন এসব লোক আমার বিরুদ্ধে তাদের কল্পনা প্রসূত অকথ্য ভাষায় , অগোচরে নানা রকম কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। এসব যখন কানে আসে, তখন মানসিক ভাবে বড় আঘাত পাই।

তবে, রামায়ণের মহান চরিত্র, নিরপরাধ ভরত এবং মহামানব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন কথাকে যখন স্মরণ করি, তখন আবার সান্ত্বনা পাই, আশ্বস্ত হয়ে দিন কাটাতেও সক্ষম হই।

জীবনযাপনের অন্তিম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে ,সময় সময় আমার কর্মজীবনের কিছুটা হিসেব-নিকেশ করে থাকি। ফলস্বরূপ যা দেখতে পাই, তাতে কোন রকম অতৃপ্তি বা অসন্তোষ এবং অনুতাপে আমাকে ভুগতে হয়না।

জাগতিক দিক বিচার করে আপনাকে জানাই, আমি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত। ভগবানের আর্শীবাদে জীবনে আনন্দদায়ক যা পেয়েছি, তা আমার যোগ্যতার তুলনায় বেশি পেয়েছি বলেই মনে হয়। ফলে বস্তুগতভাবে এর চেয়ে বেশি কিছু পাওয়ার লোভ আমার নেই।

ইদানীং অকল্পনীয় ও অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু মানসিক যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করে , নিজের ও অপরের পক্ষে আমার স্বভাবসিদ্ধ কর্মতৎপরতাকে , বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে, সীমিত করে ফেলেছি। বর্তমানে কলকাতায় তুলনামূলকভাবে এক শান্ত পরিবেশে, নেহাতই আমার মনঃকল্পিত আর এক কার্মাটার -এ যতটুকু পারি নির্বিকার হয়ে আনন্দে দিন কাটাতে চেষ্টা করছি। আমার বিশ্বাস, কোলাহলমুখর সংসারের জটিলতা ও আবিলতা থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করে, পরপারের ডাক পাওয়া পর্যন্ত শান্ত বা নীরব পরিবেশে জীবন কাটানোর মধ্যেই এখন আমাদের মত লোকের পক্ষে আনন্দ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভগবদ্‌কৃপায় আমার প্রত্যয় অনুযায়ী আনন্দ কিছুটা উপভোগও করে চলছি। আরো আনন্দের সন্ধানে মাঝে মাঝে শান্তিব নীড়, হিমালয় সহ এদিক-ওদিকে বেড়াতেও যাই।

আমি আশাবাদী , আমার প্রতি স্নেহের টানে আপনি আমাদের কাছে আসছেন। কবে আসছেন, জানিয়ে তাড়াতাড়ি আমার চিঠির উত্তর দিবেন। ইতি-

আপনার স্নেহধন্য

আকাশ

গোপাল বিশ্বাস

ভাঙা ঘর

আজ লতিকা সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছে। ছিন্ন কবতে বাধ্য হলো। অনেক চেষ্টা করেছে, ভাঙা মনটাকে জোড়া লাগাতে। পারেনি। স্বামীটা হিংস্রপশু। প্রতিদিন ঝগড়া করতো। মাতাল হয়ে পাশবিক অত্যাচার করতো। এমনকি রাতে বন্ধু-বান্ধবকেও ঘরে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে। লতিকার সামনে ওরা কেউ দাঁড়াতে পারেনি। প্রতিরাতে ঝগড়া ও গালিগালাজ তো ছিলই। অবশ্য বকাবকিতে সংসার ভেঙে যেতো না। শেষ দিকে অনুপ রহস্যময় হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে কী যেন চিন্তা করতো। লতিকাকে হত্যা? নাকি অন্য কিছু? এক একটা রাত যেন বীভৎস রূপে আসত। রাত আর পেরোতেই চাইত না। সকাল হলেই মনে হতো— আরো একটা দিন বেঁচে গেলাম। লতিকার সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন, সিগারেটের ছেঁকা আজও শুকিযে যায়নি। দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। বেতনের সম্পূর্ণ টাকাই অনুপের হাতে তুলে দিতে হতো। লতিকার নিজেরও তো কিছু খরচা আছে? মন চায়, কিছু না কিছু কিনতে। ওটা সে করতে পারেনি। অনুপ কেন স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালাত? তার সঠিক ব্যাখ্যা বোধ হয় সে নিজেও জানে না। নাকি মানসিক বিকৃতি? তবে তার সন্দেহ বাতিক ছিল। গৌরদাসবাবুর সঙ্গে নাকি হাসাহাসিতে গড়িযে পড়তে লতিকাকে দেখেছে। সামান্য কারণেই হাসির ঝরনা। ফোয়ারা ছোটে। লতিকার বিনম্র ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালবাসে।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলতেই হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেই হয়। লতিকা ভাল গান করে। সে বুদ্ধিমতী শিক্ষিকা। ক্লাসে পড়ায় ভাল। ওর গুণপনার কথা অনুপের কানে আসে। অনুপ আরো জ্বলে ওঠে। সন্দেহের মাত্রা বেড়ে যায়। বিকৃতির মাত্রা ক্রমশ সমগ্র পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে। অনুপ ব্যবসা করে। ইদানিং ব্যবসা লসে চলছে।

লতিকা ও অনুপের বিয়ে হয়ে ছিল পাঁচ বছর আগে। ২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার! আজও মনে পড়ে। অবশ্য সব মেয়েরাই বিয়ের তারিখ, বাসবঘর মনে রাখবেই । বাঙালি মেয়ে তো? এ-সব স্মৃতি ওরা ভুলতেই পারে না। প্রতিরাতেই নতুন হয়ে ধরা দেয়। মনে হয় এই তো সেদিন! বুড়ি হয়ে গেলেও। লতিকার পায়ের তলার মাটি সরে যায়নি। সে সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। মাসের শেষে বেতন খাড়া। সুতরাং খাওয়া-পড়ার চিন্তা নেই। আজ থেকে স্বামীও নেই। যে অনুপকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। একি সেই অনুপ? অন্ধকার সমুদ্রে তরী হারিয়ে ফেলে! খুঁজে পায় না! এ জীবনে আর খুঁজে পাবে কিনা, তাও জানে না সে।

অনুপ গত রাতে লতিকাকে দু-বার মেরেছে। ধর্ষণও করেছে। লতিকা টুঁ-শব্দটি করতে পারেনি। অনুপ তাকে হুমকি দিয়েছে, যদি কোন শব্দ করিস্, তা হলে তোর রাত পোহাবে না! জ্বলন্ত সিগারেট পিঠে বুকে চেপে ধরেছে। চিৎকার ঘর থেকে বেরোয় না। সারা রাত শুধু কেঁদেছে।

অনুপ লতিকাকে চৌদ্দ-গোষ্ঠী তুলে বকেছে এবং বার বার বলেছে, কাল যেন তোর মুখ না দেখি — পোড়ামুখী, নচ্ছার। সকাল হলেই তুই চলে যাবি। আমি তোর স্বামী না। তুই গৌরদাসের প্রেমিকা । শালার পুত তোরে লয়ে ফস্টিনস্টি করে, তা কি আমি জানি না? সুযোগ পেলে ওর

পেটে পাঁচ ইঞ্চি ঢুকিয়ে দেব। তুই থাকবি আমার ঘরে — আর গতর মজাবি আরেক বেডার লগে। তা তো হবে না? আবার লতিকার গালে থাপ্পড় মেরেছিল। আজ অনুপ একটু বেশি নেশা করেছে। সকাল হলেই হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিদিন আকাশ তো নীল থাকে না? কখনো কখনো মেঘে ঢেকে যায়।

সকালে উঠেই লতিকা আগের রাতের বাসি কাজগুলো করে নেয়। ইদানিং কাজের মেয়েটাও আসছে না। একটা কাজের মেয়ে যদি পাওয়া যেত!

অনুপ ঘুম থেকে উঠেই লতিকাকে সামনে দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে রাগে গড়গড় করে বলে, তুই এখনো আমার বাড়িতে আছিস্? কুত্তি, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্?— তোর মুখ দেখাও পাপ। উঠোনে পড়ে থাকা একটা ডাল তুলে নিয়ে লতিকাকে বাড়ি মারে। লতিকা দু-হাত দিয়ে আটকাতে চেষ্টা করে। ডালের আঘাত ওর দু-হাতে পড়ে। শাঁখা ভেঙে যায়। অনুপ নিজ হাতে সিঁথির সিঁদুর মুছে দেয়। আর বলে, এক্ষুণি তোর বাচ্চাকে নিয়ে চলে যা। ওটা আমার বাচ্চা না! গৌরদাসের ইতর। লতিকার আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না। মনে হলো এখন যদি মাটি দু-ভাগ হতো, সীতার মতো পাতালে চলে যেতে পারতো, তবে যন্ত্রণার নিস্তার হতো! কিন্তু তার বাচ্চার তো কোন দোষ নেই। মেয়েকে লতিকা কোলে নিয়ে বলল, তোমাকে শেষবারের মতো বলছি, আমিও সংসার ভাঙতে চাইনি। অনুপ আরো রেগে গিয়ে বাচ্চাসুদ্ধ লতিকা কে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। একজন শিক্ষিকা এমন বীভৎস অত্যাচার সহ্য করবে কি? সে পুলিশে কোন বিচার প্রার্থী হয়নি। সোজা চলে আসে বাপের বাড়ি। লতিকা ভাবছিল,অনুপ নেশা করেছে— ঘোর কেটে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়নি। আর কোন কালেই ঠিক হবে না। লতিকা বাপের বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে ওঠে। এখন থেকে আলাদা সংসার গড়ে তুলতে চায়। আজ সে ঘর ভেঙে ঘরের বাইরে এল।

বাইরে এসে অতীতের স্মৃতিগুলো ক্রমশ একে একে মনে পড়ছে। অনুপ তখন এম.বি. বি. কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। টল ফিগার । ফর্সা। ভাসা ভাসা চোখ। এক কথায় — হ্যান্ডসাম। বাড়ি তেলিয়ামুড়া। ইস্তিরি ছাড়া শার্টপ্যান্ট পড়ে না। লতিকা প্রথম বর্ষে— বি.এস. সিতে। খোয়াই থেকে এসেছে। ভাড়া থাকে। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে লতিকা ফি কার্ড ও এডমিড কার্ড হারিয়ে ফেলে। অনুপ এগুলো পেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। ঠিকানা খুঁজে বের করে। সেই থেকেই লতিকার সঙ্গে অনুপের প্রথম পরিচয়। তারপর দেখা হলেই হালকা হাসত। আলাপ-আলোচনা হতো। পাঠ্য বিষয় থেকে বিশ্ব-রাজ্য পরিস্থিতি, রাজনীতি কোন কিছুই আলোচনায় বাদ যেতো না। সব বিষয়ই ভাল লাগত। অকারণেই হাসত। নন্দনকাননে বসে ঘন্টারপর ঘন্টা ওরা কাটিয়ে দিত। অনেক সময়ে ক্লাসেও যাওয়া হতো না। পরে বলত, ওমা, ক্লাস কখন চলে গেছে! দু-জনেই হেসে উঠত। আরো কাছাকাছি হতো। বলত, ভালই হয়েছে। সেই আলাপচারিতা থেকে প্রেম হলো। আবার প্রেম যে কখন গভীরতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল— তা ওরা বুঝতেই পারেনি। যখন বুঝতে পারল, তখন আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। তখন ওরা অনেক কিছু করে ফেলেছে। নিতান্তই ভালবাসার অঙ্গ হিসাবে। ওরা এগিয়ে গেছে চাঁদের কাছাকাছি । চাঁদ থেকে যেন গলে গলে জোছনা পড়ছে পৃথিবীর ওপর ।

একদিন অফ্ ক্লাসে নন্দনকাননে গাছের হালকা ছায়ায় বসে ওরা প্রেমালাপ করছে। কোথা দিয়ে যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বুঝতেই পারেনি! এমন সময় লতিকার বান্ধবী তন্বিষা কখন যে

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, জানতেও পারেনি।

তোরা এমন বিশ্রিভাবে কী করছিস্? কেউ দেখে ফেলবে। তন্বিষা মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল। অনুপ ও লতিকা তখন একে অন্যকে চুমু খাচ্ছিল। কেউ যে দেখে ফেলতে পারে সে বোধ ওদের তখন ছিল না। তাড়াতাড়ি ওরা ছাড়িয়ে নেয়।

এই খবরটা কলেজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক সময় লতিকার মা-বাবার কানেও ওঠে। একদিন লতিকা বাড়ি এলে ওকে ডেকে মা কথা বলেন, জানতে চান, কথাটা সত্যি না মিথ্যে। মা, পারমিতা রেগে বলেন, তুই নাকি তেলিয়ামুড়ার একটা ছেলের সাথে প্রেম করছিস? লেখাপড়ায় মন নেই! ক্লাস করিস না ঠিক মতো? তোর ওপর আমাদের অনেক আশা-ভরসা। সেটা কি নষ্ট করে দিবি? তাছাড়া তোর বাবা কার্তিক লাহিড়ীর নাম কে না জানে। এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। ওর হাতে পার্টির বিশেষ ক্ষমতা। তোর বাবার সুনাম কি নষ্ট করে দিবি? তার মেয়ে হয়ে বেজন্মা একটা ছেলের সঙ্গে ...। ও ভগবান! আর ভাবতে পারছি না!

—অ-মা, তুমি বাবাকে বলে দিও, আমি অনুপকেই বিয়ে করব। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। অনুপই আমার সব। কী বলছিস্ এ-সব? আমরা তোর কেউ না? এতদিন পড়াশুনা করিয়ে বড় করলাম, আর এখন বলছিস্ কী? প্রেম-টেম সব বন্ধ কর। ওর কাছে তোকে বিয়ে দেব না। এ-আমার স্পষ্ট কথা। এমন মেয়েকে বস্তায় ভরে গাঙে ভাসিয়ে দেব। নতুবা টুকরো টুকরো করে কেটে শকুনেরে দিয়ে দেব। তবু ..। এমন সময় কার্তিক লাহিড়ী বাজারের থলি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন এবং বলেন, কি কথা হচ্ছিল, মা- মেয়েতে?

— তোমার মেয়ের কথা শুনলে এখনই হার্টঅ্যাটাক করবে!

— তাহলে বলার দরকার নেই। কার্তিকবাবু মুচকি হাসেন।

পারমিতা রাগে উত্তেজিত হয়ে বলেন, দরকার নেই বললেই হলো? ও-পাগলামি করতে করতে আকাশে উঠে গেছে। এখন নামিয়ে আনবে কে?

— কেন, কী হয়েছে? খুলে বল। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, পারমিতা?

— লতিকা পড়াশুনা বাদ দিয়ে প্রেম করছে! অনুপ নামে একটা বান্দর ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। চুটিয়ে প্রেম করছে কলেজ ফাঁকি দিয়ে। এক নিঃশ্বাসে পারমিতা এ-সব বলে দম নেয়। কিছুক্ষণের জন্যে কার্তিকবাবু গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। মেয়ে বড় হয়েছে — সেই খেয়ালই নেই। বুঝতে পারলেন, বিপদ সন্নিকটে। সংকট দ্বারে টোকা মারছে। মুখে হাসলেও মনটা দুঃখে ভরে গেল। কী করে ওকে আটকানো যায়? পারমিতা কাঁদতে লাগলেন। কার্তিকবাবু তাকে বাধা দেননি। কাঁদুক।

আশানুরূপ ফল না হলেও লতিকা বি.এস. সি.(পিওর) পাশ করে বেরিয়ে আসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি স্কুলে একটা চাকুরি পেয়ে যায়। অবশ্যই ওর বাবার সাহায্যে চাকুরিটা তাড়াতাড়ি হয়েছে। পোষ্টিংও পছন্দমতো স্কুলে। এখন ওদের আর কোন অভাব নেই। একদিন পালিয়ে গিয়ে ওরা বিয়ে করে। বছর খানেক হয়ে গেল কার্তিকবাবু ওদের বিয়ে মেনে নিয়েছেন। তিনি উদার স্বাধীনচেতা মানুষ। পারমিতার অমত সত্ত্বেও বিয়ে মেনে নিতে হল। খুব অভিমান করেছিলেন পারমিতা। বলেছিলেন, পালিয়ে বিয়ে... আবার ...।

লতিকার বাবা সামাজিকভাবে একটা অনুষ্ঠানও করেছিলেন। অনুপের বন্ধু-বান্ধবরা মদ খেয়ে খুব আবোল-তাবোল বকে ছিল। নিঃশব্দে সব সহ্য করলেন তিনি।

লতিকা এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে। এখন স্বামীর ঘর করছে। রঙিন স্বপ্নরা চারদিক ভিড় করে জড়ো হয়। স্বপ্নেরা চোখে চোখে কথা বলে যেন। সংসারে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। মনে হয় দিনও রাত ছোট হয়ে গেছে। বিশেষ করে রাত আরো ছোট হয়ে যায়, যখন অনুপ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে। নগ্নশরীরে অনুপ হালকা হাত বোলায়। হাত লজ্জা অঙ্গেও চলে যায়। লতিকার শরীর যখন জেগে উঠে, অনুপ তখন পাগলের মতো শরীরটাকে নিয়ে খেলে। চুমুতে চুমুতে ভরে দেয় সারা অঙ্গ। ভোরের দিকে ওরা নেতিয়ে পড়ে। তৃপ্তিতে ভরে যায় সমগ্র দেহ। যৌনতা আসলে ভালবাসা নয়। ভালবাসার বন্য প্রকাশ মাত্র। ভালবাসা আরো গভীর এবং ব্যাপক ব্যঞ্জনাময়।

এরই ফলশ্রুতিতে তনুশ্রীর জন্ম হয়। তনুশ্রীর জন্মের সাত-আট মাস পর থেকেই অনুপ যেন কেমন হতে থাকে। লতিকার প্রতি একটা নেগেটিভ মনোভাব গড়ে ওঠে। অবচেতন মনে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে। এদিকে ব্যবসা লসে যাচ্ছিল। জমি বিক্রি করে আগের বার ব্যবসা স্ট্যান্ড করিয়েছিল। লতিকাকে বলেছিল, ওর বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা এনে দিতে। ও-রাজি হয় নি। যদিও জানে চাইলেই টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন মুখে বাবার কাছে টাকা চাইবে? লতিকার জি. পি. এফের প্রায় সব টাকাই তুলে এনে অনুপের হাতে দেয়। কী করেছে কে জানে? অনুপ টেনেটুনে বি. এ. পাশ। জব ফর্মও ফিল্‌আপ্‌ করেছে। কাউকে না ধরলে চাকুরি পাওয়ার আশা নেই। স্ত্রীর রোজগারের ওপর কি নির্ভর করতে হবে? অনুপ লতিকাকে বলে তুমি চাকুরি ছেড়ে দাও। পরিবর্তে আমাকে দিতে বল, তোমার বাবা, কী না পারেন? তুমি চাকুরি করলে আমার ভালোলাগে না। বরং আমি চাকুরি করি, তুমি সংসার দেখো।

চাকুরি কি ছেলের হাতের মোয়া ? চাকুরির বাজার বড়ো কঠিন। দিনরাত বেকাররা হন্যে হয়ে ঘুরছে নেতাদের বাড়ি বাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। চাকুরি পাচ্ছেনা। আর তুমি বলছ চাকুরি ছেড়ে দিতে? এমন কাজটা আমি কখনোই করব না।

— কিন্তু তোমার বাবাতো বড় নেতা। ইচ্ছে কবলেই তো আমাকে একটা ভাল চাকুরি দিতে পারেন।

— চাকুরি দিতে পারবেন কিনা জানি না, তবে তুমি বললে হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বাবা খুবই উদার মানুষ।

— কী যে বল, এত বড় নেতার কথায় চাকুরি হবে না? তাহলে পার্টি করে কী লাভ?

সেদিন আর লতিকা কথা বাড়ায়নি। স্কুলে চলে গিয়েছিল। এরপর থেকেই অনুপ প্রায়ই লতিকাকে চাকুরি ছেড়ে দিতে বলত। তার বদলে অনুপকে চাকুরি দিতে, শ্বশুরকে চাপ দিতে বলত।

লাহিড়ীবাবু অবশ্য অনেক চেষ্টা করেছেন। অনুপের চাকুরি হয়নি। বয়স উত্তীর্ণ হয় হয়। এর মধ্যেই লতিকার ওপর অনুপের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল।

লতিকা বাইরে খুব একটা প্রকাশ করতো না। এ ব্যাপারে সে চাপা। অনুপের মা-বাবা অত্যাচারের কাহিনি জানতেন। ছেলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতেন না। ওরাও চাইতেন ছেলের

চাকুরি হোক। বউমা চাকুরি ছেড়ে তাদের সেবা শুশ্রূষা করুক। অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ছেলের হাতেই থাক। যদি ছেলে স্ত্রৈণ হয়ে যায়? অনুপের মা কুমকুম প্রায় সময়ই ছেলেকে বলতেন, তোর শ্বশুরকে চাপ দে চাকুরি দিতে। বিয়েতে তো কিছুই দেয়নি। লতিকা বুঝতে পারে। তার জীবন ভীষণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঝড় বইতে শুরু করছে। তবে তার মনোবল খুব শক্ত। এ-জিনিসটা ওর বাবার কাছ থেকে পাওয়া। কোন বিপদেই ভেঙে পড়ার মেয়ে লতিকা নয়। ওরা শুধু এগিয়ে যেতে জানে।

দু-তিন মাস পর হঠাৎ করে অনুপ ভাল হয়ে যায়। আগের মতো ব্যবহার করে। ভালবাসার কাঙালিনী ধরা দেয়। একদিন অনুপ প্রস্তাব দেয়, চল আমরা কোথাও বেড়াতে যাই, দূরে কোথাও। তুমি আর আমি, আর আমাদের তনুশ্রী। লতিকা খুশি হয়ে প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। ফেটে যাওয়া হৃদয় কি আবার জোড়া লেগে যাবে? আনন্দের ঢেউ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। লতিকা গুন গুন করে রবীন্দ্র সংগীত গায়। স্বপ্নেরা আছড়ে পড়ে জীবন সমুদ্রে, আলো আমার আলো, ওগো, আলো ভুবন ভরা।

আগরতলা থেকে বিমানে কলকাতা। তারপর মাদ্রাজ কন্যাকুমারী এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত স্থান ও মন্দিরগুলো ওরা দর্শন করে। খুব ভাল লাগে। দু-একদিন বিশ্রামের জন্য ওরা একটি হোটেলে ওঠে। কন্যাকুমারী দেখে অভিভূত। এই প্রথম লতিকা সমুদ্র দেখল। সমুদ্রের কী বিশালতা! হোটেল থেকে ওরা ঘুরে বেড়ায়, সকাল-বিকেল। রিটার্ন টিকিট করা আছে। কোন অসুবিধে নেই।

শেষের কয়েকটা দিন অনুপ বেশ খিটখিটে মেজাজে হয়ে গেছে। কথা বললেই রেগে যায়। মাঝে মাঝে কী যেন চিন্তা করে। এরমধ্যে খোঁজ নিয়ে অনুপ জেনে নিয়েছে লতিকার ও তনুশ্রীর এল. আই. সি. -এর কাগজপত্রগুলো কোথায় রাখা আছে। ও-গুলো পেতে কোন অসুবিধাই যে হবে না অনুপ বুঝে নেয়। হঠাৎ হঠাৎ অনুপ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তাকে চেনা যায় না। লতিকাকে দেখলে স্বাভাবিক হতে চায়। পারে না। লতিকার চোখে ধরা পড়ে যায়। কী ধরা পড়ে যায় —?

ঘটনাটা যেদিন ঘটল, সেদিন লতিকারা ফিরে আসছিল ট্রেনে করে। সন্ধ্যাকাল। লতিকা বাথরুমে যাবে। অনুপ দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওই যে পাঁচ নম্বর বাথরুমটা দেখছ, ওটাতে যাও, খুব ভাল। লতিকা ভিড়ের মধ্যে সেদিকে অগ্রসর হয়। গিয়ে দেখলো, সেখানে অন্য কোন মহিলা ঢুকে পড়েছেন। বাথরুমেও কোন আলো নেই! দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই মনে করে, লতিকা লাগোয়া ছয় নম্বর বাথরুমে ঢুকে গেল। লতিকা বাথরুম থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেল, পাঁচ নম্বর বাথরুমেব সেই মহিলার প্রচন্ড আর্ত-চিৎকার। রেল পুলিশ দৌড়ে কাছে গেলেন। কে বা কারা মহিলাকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেছে। পুলিশ ধরতে পারেনি। ইতিমধ্যে মহিলার দেহ নিথর হয়ে আসে। ট্রেনও স্টেশনে প্রবেশ করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন থামবে। পুলিশেরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাথরুমের সামনে যে রক্ত মাখানো ছুরিটা পড়ে ছিল —তা দেখে আঁতকে ওঠে লতিকা! এ-ছুরিটা তো অনুপের হাতে দেখেছে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ব্যাগে পুরেছিল।

লতিকা জিজ্ঞেস করেছিল, ছুরি নিচ্ছ কেন? উত্তরে অনুপ বলেছিল, দূরদূরান্তে বেড়াতে যাব। কোথায় কী কাটাকাটি করতে হয় কে জানে, ছুরিটা সঙ্গে থাকলে অনেক উপকারে লাগবে। লতিকা তখন কিছুই বোঝেনি। সে তাড়াতাড়ি সিটের কাছে চলে আসে। দেখে মেয়েটা চাদর গায়ে দিয়ে কাঁদছে। অনুপ নেই। বাচ্চা মেয়ে পড়েও তো যেতে পারতো! তনুশ্রীকে তাড়াতাড়ি কোলে

তুলে নেয়। কিন্তু অনুপ কোথায়? ব্যাগটাই বা কোথায়? শুধু লতিকার কাপড় চোপড়ের ব্যাগটা একটু দূরে পড়ে আছে। ভাগ্যিস্, রিটার্ন টিকিট সঙ্গেই ছিল। তাছাড়া লতিকার কোমরে আগে থেকেই পাঁচ হাজার টাকা লুকিয়ে রেখেছিল। অনুপ জানে না। ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে বড়ো অসহায় বোধ করল। ট্রেন আবার ছেড়ে দিল। বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। জায়গাটার নাম লতিকা জানেনা। কে যেন বলেছিল— 'মাদুরাই'। এত খেয়াল করেনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও অনুপ এল না। তখন আর বুঝতে অসুবিধা হল না, কেন ওকে পাঁচ নম্বর বাথরুমে যেতে বলেছিল। ছুরি মেরেই পালিয়ে গেছে! মেয়েকে ফেলেই? কী করে পারল? এতটুকু দুধের শিশুকে ...। এ-সব কি পূর্ব পরিকল্পিত? লতিকা যদি পাঁচ নম্বর বাথরুমে ঢুকত? কী যে হয়ে যেতো? ভাবাই যায় না। মেয়েটার এতক্ষণে কী যে অবস্থা হত কে জানে!

সকাল সাতটা। ট্রেন চেন্নাই স্টেশনে ঢুকছে। ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার প্ল্যাটফর্ম। লোক সংখ্যা বেশি হলেও নিয়ম মেনে চলছে। লতিকার ট্রেনের টিকিট চেন্নাই অবধিই। চেন্নাই বিমানবন্দর থেকে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে আগরতলা পর্যন্ত রিটার্ন টিকিট তার সঙ্গেই আছে। সেজন্য অনেকটা নিশ্চিত। তাছাড়া সে হিন্দিও ইংরেজী ভাল বলতে পারে।

এখনই তাকে ট্রেন থেকে নামতে হবে। কাঁধে ব্যাগ, কোলে শিশু। লতিকা নামল। ও দেখল, সামনেই 'পুলিশ হেলপ সেন্টার'। সেখানে গিয়ে প্রথমেই বাড়িতে বাবার কাছে ফোন করল। পারমিতা ঘরে ছিল না। কার্তিকবাবু রিসিভার ধরলেন। হ্যালো, বাবা, আমি লতিকা।

—আরে লতিকা, তুই এখন কোথায় আছিস্? কেমন আছিস্?

— চেন্নাই রেল স্টেশনের কাছে। ভাল না।

কার্তিকবাবু ঘাবড়ে যান! কেন, কী হয়েছে? বল্ মা, তোর গলার স্বর এমন লাগছে কেন?

— তোমাদের জামাই অনুপ হারিয়ে গেছে। গতকাল বিকেল থেকেই ও আর আমার সঙ্গে নেই। কোথায় গেছে জানি না। চেন্নাই বিমান বন্দর থেকে রিটার্ন টিকিট আমার সঙ্গেই আছে। আমাকে কী করে আসতে হবে বলে দাও।

ফোনেই কার্তিকবাবু মেয়েকে সব বুঝিয়ে বলে দিলেন, কোথায় কী করতে হবে। ঘাবড়ে না যাওয়ার জন্য বললেন। চেন্নাইতে কার্তিকবাবুর একজন রাজনৈতিক বন্ধু ছিলেন, একদম চেনাজানা লোক। ওকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, লতিকাকে সাহায্য করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লতিকাকে সাহায্য করতে ছুটে আসেন এবং বিমানবন্দরে সি. অফ্ করেন। তারপর কলকাতা থেকে আগরতলা আসতে কোন অসুবিধাই হয়নি। লতিকা এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেনি।

চারদিন পর অনুপও ফিরে আসে। বাড়িতে এসেই লতিকাকে দেখে চম্‌কে ওঠে! বলে, তুমি বেঁচে আছো?

—কেন আমার কি মরে যাওয়াই উচিত ছিল?

— ভেবেছি, তুমি হারিয়ে...। অনেক খুঁজেছি। পেলাম না।

— পুলিশে নালিশ করোনি কেন?

লতিকা অত্যন্ত দুঃখে বলে। তোমার ব্যাগে যে ছুরিটা ছিল, ওটা কোথায়?

—হারিয়ে গেছে।

—সত্যি করে বলো ছুরিটা দিয়ে কী করেছিলে? একটা দুধের শিশুকেও তুমি ভালবাসনা! এত নিষ্ঠুর! নাকি আমাকে ...। কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন। অনুপ নিরুত্তর। লতিকার কাছে ঘটনাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

অনুপ মাসখানেক চুপচাপ ছিল। কম কথা বলত। সারাদিন টইটই করে ঘুরে বেড়িয়েছে। একদিন ওর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল। বিশ্রীভাবে বকাবকি করছিল। সেদিন থেকে আবার অত্যাচার শুরু করে দেয় অনুপ।

লতিকা আর সহ্য করতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করেছে ও ঘর টিকিয়ে রাখতে। হয়তো কোন রাতে মেরেই ফেলবে।

প্রায় একবছর হয়ে গেল সে অনুপকে ছেড়ে বাপের বাড়িতে এক কাপড়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে চলে এসেছে। দাদু নাতনিকে পেয়ে আনন্দিত। ও মেয়েকে নিয়ে আলাদা সংসার গড়ে তোলে।

কয়েকদিন আগে অনুপের ভগ্নীপতি দেবব্রত এসে লতিকাকে অনুরোধ করেছিল, অনুপের সংসারে আবার ফিরে যেতে। অনুপ তার ভুল বুঝতে পেরেছে। ওদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। দেবব্রত বুদ্ধি করে বলেছিল, অনুপ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি বললেই ও এসে তোমার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে। আব কখনো তোমাকে কষ্ট দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

লতিকা অনেক ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়, কিন্তু যে ঘর আগুনে পুড়ে যায়, তার তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শুধু ছাই আর পোড়া ভিটেমাটি পড়ে থাকে! আমি আব পেছনে সেই ছাই আর পোড়া ভিটেমাটিতে তাকাতে চাই না।

একজন উকিলকে বলে দিয়েছি, ডিভোর্সের সমস্ত কাগজপত্র রেডি করে অনুপের কাছে পাঠাতে। অনুপকে অনুগ্রহ করে বলবেন, সই করে তা পাঠিয়ে দিতে!

একথা বলে লতিকা পাশের ঘরে চলে যায়। কার্তিকবাবু লতিকার এই সিদ্ধান্তে খুশি হয়।

দেবব্রত নিরাশ হয়ে মুখ গোমড়া করে চলে যায়।

পাথর চাপা বুক

মহারাষ্ট্রের ভান্দরা জেলা। অন্ধাল থানার অন্তর্গত খৈরালাঞ্জি গ্রাম। গ্রামের প্রায় সব পরিবারই মাহার সম্প্রদায়ভুক্ত। দক্ষিণ দিকে দু-তিনঘর মুসলমান। দারিদ্র্যের মধ্যেই দিনযাপন করতে হয়। ভাঙা কপাল! পেশায় দিনমজুর। ইট-ভাট্টায় কাজ করে। কেউ কেউ অন্যের বাড়িতে বেগার খাটে। কেউ নিজের জমিতে বছরে সাত-আট মাস কাজ করে। কারো কারো বছরের খোরাকি হয। কারো হয় না। দিন আনে দিন খায। কষ্টেসৃষ্টে কায়ক্লেশে সংসার চলে। কায়িক পরিশ্রম ছাড়া থালায় খাবার পড়ে না। হাওয়ায় থালা উড়োউড়ি করে। ওরা অন্যের ধমক খেতে খেতে, পা টিপতে

টিপতে শ্মশানে যায়। বংশানুক্রমিক পেয়াদা। অথচ সমাজের মাফিয়ারা ভাল খায়, আয়েশ করে। ফুলবাবু সাজে। কেউ আবার মন্ত্রীও হয়। সামান্য ইশারায় সম্পদের পাহাড় জমে ওঠে। ভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টিবিধান।

খৈরালাঞ্জি গ্রাম শস্য-শ্যামলা। উর্বর মৃত্তিকা। ধান, গম ও তুলা ভাল চাষ হয়। সবুজ গমশিষ্ হাতছানি দেয়। বাতাসে দোল খায়, মাঠ জুড়ে। যেন রূপবতী কন্যা সমগ্র সবুজ মাঠে নাইতে নেমেছ। পাশে সোধাই নদী। বর্ষায় কলকল ধ্বনি। গান গেয়ে মাঝি নৌকো বায়। ঘর থেকেই শোনা যায়। সুদিনে বা শীতের মরশুমে ইরিগেশন হয়। পাম্প মেশিনের শব্দে কান ঝালাপালা করে। তবু ভাল লাগে। কারণ সবুজ মাঠ প্রসব করে সোনালি ফ সল।

পার্শ্ববর্তী ফৈরনবি গ্রাম। অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। মিনি শহরও বলা যায়। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল সর্বসুবিধাযুক্ত। এই গ্রামে উচ্চবর্ণ কালার ও পাওয়ার ধনী সম্প্রদায়ের দীর্ঘ বসবাস। সাজানো গোছানো বাড়িঘর। সবই বিল্ডিং। পাকা রাস্তা ঘাটে হাঁটাহাঁটি করতে খুবই ভাল লাগে।

তবে মাহার পরিবারের লোকজন এদিকে আসেনা। তাদের জন্য অলিখিত 'নো এন্ট্রি'। এলে বিপদ হতে পারে। সে আর ঘরে ফিরে নাও যেতে পারে! দু-তিনটে লাশ সামাল দেওয়া পাওয়ারদের পক্ষে কোন ব্যাপারই নয়! ব্যাঙ মারার মতো। মুরগি মারার মতো। সেজন্যে কুঁড়েঘরের মানুষেরা এদিকে খুব একটা আসেনা। এপাড়ায় ওদের দেখা যায় না। অট্টালিকাকে ওরা ভয় পায়। যারা আসে তারা সকলই দিনমজুর। ইমান বিক্রিত। মাথা নিচু করে হাঁটে। ঝি বা চাকরের কাজ করে। ওরা মাথা তুলে আর দাঁড়াতে পারেনা— শেষ যাত্রার চতুর্দোলায় চড়তে হয়। পাশাপাশি দুটো গ্রাম যেন আলো আর অন্ধকার! দিন আর রাত্রি। ফৈরনবি যেন খৈরালাঞ্জিকে সর্বদা ধর্ষণ করে চলেছে।

খৈরালাঞ্জি গ্রামের মাহার পরিবারগুলো কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করছে। কবে থেকে ওদের এ-গ্রামে বসবাসের শুরু, কেউ বলতে পারে না। এ গ্রামেরই একটি মাহার পরিবার, সুরেখা ভোটমাঙ্গে তার সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছে প্রায় উনিশ-কুড়ি বছর ধরে। এর আগে ওরা পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া জেলার একটি ইট-ভাট্টাতে কাজ করতো। সেখানে প্রাক্‌যৌবন থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলো বছর গাধার মতো পরিশ্রম করেছিল। মালিক ঠিকমতো হিসাব করে টাকা পয়সা দেয়নি। প্রাপ্য নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছে। তবু যা পেয়েছে তা দিয়েই দেশ বাড়িতে পাঁচ একর জমি ক্রয় করতে পেরেছে। ইট-ভাট্টার কাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজ আরম্ভ করে। প্রান্তিক চাষি। সুরেখাও তার স্বামী মিলে কঠোর পরিশ্রমে সংসার গড়ে তোলে। ওরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চায়। চোরাবালির উপর কি তা সম্ভব?

কিন্তু স্বামী হঠাৎ করে একদিন চলে যায়। পেট ব্যথা করেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পরও কৃষিজমির ওপর নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার দিকে মন দিল। সুরেখা তৃতীয় শ্রেণি অবধি পড়েছিল।

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো জমিদারি বা জোতদার সামন্তপ্রথা সমাজের ঘাড়ে চেপে বসে রয়েছে! গোবিন্দ পাওয়ার এমনি একজন সামন্ত প্রভু। জমিদারি গায়ের জোরে চালান। তার লাঠিয়াল বাহিনী যে কোন সময়ে হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত। ওরা গণতন্ত্রের আকাশে আরো বেশি খুনি। সাধু সাধু ভাব। লোক সম্মুখে দাতা দয়ালঠাকুর। কিন্তু ওরা আসলে অন্ধকারের জীব।

অন্ধকারে হাঁটতে ওরা ভীষণ ভালবাসে। সন্ত্রাসে মাতাল হয়। ভয়ংকর! বীভৎসরূপ! সমাজে ত্রাসে সৃষ্টিকারী, অসুরবংশ! হত্যা,ধর্ষণ এবং অন্যের সম্পদ কেড়ে নেওয়া ওদের নিত্যদিনের পেশা, বাঁ-হাতের খেল।

একদিন সকালবেলা দুজন শাগরেদ নিয়ে গোবিন্দ পাওয়ার সুরেখার বাড়িতে এল। সুরেখা কাজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। জমিদার গোবিন্দ উঠোনে এসেই ডাক দিল, সুরেখা, বাড়ি আছিস্? আ-রে অ সুরেখা? ডাকে তিক্ততা প্রকাশ পায়। সুরেখা ঘরেই ছিল। চমকে ওঠে কণ্ঠস্বর শুনে।

কারণ এ-গলার স্বর আগেও সুরেখা শুনেছে। যখনই শোনে তখনই সন্ত্রাস নেমে আসে। কিছু না কিছু নিয়ে যায়। ধ্বংস করে। ঝড় ওঠে। ঘরদোর তছনছ করে দেয়। সুরেখা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে, আই-রে গোবিন্দ সাব যে, কী মনে করে, প্রণাম। আমাকে খবর দিলেই তো যেতাম। কষ্ট করে এলেন— বসেন— আমি একটা চেয়ার নিয়ে আসি।

— আরে না, না, চেয়ার আনতে হইব না। মুচকি হাসি! আমি বসুম না। আর তোদের এমন নোংরা জায়গায় বসাও যায় না! যাগ- গে, যে কাজে আইছি, সেটাই বলি, তোর পূর্ব মাঠের যে তিন একর জমি আছে, ওঠা আমাকে দিয়ে দে। কারণ, আমাদের জমিতে যেতে হলে তোর জমির ওপর দিয়ে যেতে হয়। তোরা তো নিচুজাত। জমি দিয়ে কী করবি? মাঠে ট্রাক্টর নিতে অসুবিধা হয়। তোর জমির ওপর দিয়ে আরো চওড়া রাস্তা বানাব। ট্রাক্টর মাঠে নামলে সকলেরই উপকার। নাকি? সুরেখা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। বিশাল ঝড়ো সমুদ্রে ছোট্ট একটা তরী যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

— কী রে সুবেখা? কিছুই তো বল্‌ছিস্ না? মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি চলে? কিছু তো বলতে হবে?

নিচু জাতের এই হল একটা দোষ। ঠিক আছে, রাস্তা আমরা বানিয়ে নেব। তোরা আমার জমিতে কাজ করিস্। সুরেখা আস্তে আস্তে মাথা তুলে বলে, সাব, আগেও তো আমার দুই একর জমি নিয়েছেন। টাকাপয়সা কিছুই দেননি। অন্য দিকে পাল্টা জমি দেবেন বলেছিলেন।

গোবিন্দ রেগে যায়।

—কী বললি? হারামজাদি তোকে টাকা পয়সা দেইনি? অহন আর মনে থাকবে কেন? নগদ কচকইছ্যা-কড়কড়ে টাকা দেইনি? হয়তো সব টাকা খরচ করে ফেলেছিস্! সঙ্গের দুটো কালো মোটা লোকও মালিকের কথায় সায় দিয়ে বলে, আমরাও তো সামনেই ছিলাম। আমাদের সামনেই তো তোকে টাকা দিয়েছে, জমির দাম। অহন বানছুতি বলে কী-রে? মিথ্যাবাদী, ইয়ালনি!

সুরেখা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে, দয়াল ঠাকুরসাব, আমার শেষ তিন একর জমি নেবেন না। অনেক কষ্ট করে জমি ক্রয় করেছি। এ-জমিটুকু নিলে আমার আর কিছুই থাকবে না। ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতেই পাব না। আমাকে দয়া করুন ধর্মাবতার!

সুরেখা গোবিন্দের পায়ের সামনে গড়িয়ে পড়ে। পা ধরে না, কারণ, ও-জানে যে হাত দিয়ে পা স্পর্শ করবে, সে হাত কাটা যাবে। গোবিন্দ একটু সরে যায়। চোখ লাল করে বলে, কীভাবে জমি পাওয়া যাবে, তা আমি জানি! ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি! তবু সুরেখা বলে, দোহাই আপনার, আপনি আমাদের ঈশ্বর। ঈশ্বরের নিকট অনুরোধ, জমি নেবেন না! জমির জন্য লড়ে প্রাণ দেব।

আমাদের মারবেন না।

পশুরা কি মানুষের অনুরোধ শোনে?

অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে গোবিন্দ বলে, ২৭ শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং বেলা চারটা পর্যন্ত সময় দিয়ে গেলাম। এর মধ্যেই তুই আমার বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসবি যে, রাস্তার জন্যে তোর জমি বিনা শর্তে দিয়েছিস্। নতুবা...। আমার এক কথা, এ গ্রামে তোরা থাকতে হলে জমি দিতেই হবে। নিচু জাতের কোন মানুষ আজ পর্যন্ত কেউ আমার মুখের ওপর কথা বলেনি। আশা করি বুঝতে পারছিস্। দশের রাস্তা বলে কথা। আমার তো একার কথা ভাবলে চলে না। গোবিন্দ সেদিন চলে যায়। ঈশান কোণে ঝড়ের সংকেত ঝিলিক দেয়।

আঠার বছরের প্রিয়াঙ্কা এতক্ষণ ঘরেই ছিল। বের হয়নি। খানিকটা ভয়ও ছিল। কিন্তু বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছিল সবই। গোবিন্দ ও তার লোকজন চলে যাওয়াতে সে ঘর থেকে বের হয়।

মাকে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, মা, অই লোকগুলো তোমাকে এত শাসিয়ে গেল কেন? তুমি তাদেরকে এত অনুরোধ করছিলে কেন? ওরা কি দেবতা, না মানুষ?

— হ্যাঁ মা, ওরা আমাদের দেবতা থেকেও বড়। বড়ো নিষ্ঠুর দেবতা, যে কোন সময়ে ওরা আমাদের মারতে পারেন। কিন্তু বাঁচাতে পারেন না। কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে ধ্বংসে ও আনন্দে ওরা মেতে ওঠে!

—ওদের পায়ের সামনে এত গড়াগড়ি দিয়ে কী অনুরোধ করছিলে? সুরেখা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জমি রক্ষার জন্য নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। হয়তো পারলাম না। চারদিক শুধু অন্ধকার! চোখ কি নষ্ট হয়ে গেল? পরনের কাপড়ের কোণ দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়। সকলেই দাঁড়াতে চায়। দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরতা কন্যার দিকে তাকায়। অদৃশ্য বিপদে বুকটা আঁতকে ওঠে। সুরেখার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। অবশিষ্ট তিন একর জমিও জোর করে দখল করে নেবে! হয়তো সাদা কাগজে সাব রেজিস্ট্রারে কাওলা লিখিয়ে নেবে! জাল সই সত্য বলে প্রমাণ করবে। ওদের একতরফা স্বৈরাচারী শালিসি বিচার। তখন নাকে খত দিয়ে সবার সামনে ক্ষমা চাইতে হবে। হয়তো এ-সবের কিছুরই প্রয়োজন হবে না। এমনিতেই জমি দখল করে রাস্তা বানিয়ে নেবে। মুখে টুঁ-শব্দও করা যাবে না। সুরেখারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদাও পায়না। স্বাধীন ভারতে ওরা পরাধীন। সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো এদের জন্য প্রযোজ্য নয়!

এমন সময় সুধীর ও রোশন দু-ভাই বাড়িতে প্রবেশ করে। ওরা কলেজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে জমি ও চাষ করে। জমিতে এবার গম চাষ করেছে। খুব ভাল ফসল হবে। জল সেচের অসুবিধা সত্ত্বেও লক্ষ্মী এবার মুখ তুলে তাকিয়েছেন। লক্ষ্মী প্যাঁচাটাও মুচকি মুচকি হাসছে। কিন্তু মাকে দেখেই দু-ভাই থমকে দাঁড়ায়। অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা মোচড় মারে। সুধীর বাড়ির বড় ছেলে। ও-ই জিজ্ঞেস করে, মা কী হয়েছে? তোমার চেহারার এমন অবস্থা হলো কেমন করে? সুধীরের কাতর জিজ্ঞাসায় সুরেখার গলা কাঁপতে থাকে। পাশেই প্রিয়াঙ্কাকে দেখে বলে, কী হলো প্রিয়াঙ্কা ? মা-র অবস্থা এমন হলো কেন? কী হয়েছে বোন, বল? প্রিয়াঙ্কার চোখও ঝাপসা। আঙুল তুলে শুধু ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, "অই ফৈরনবি থেকে তিনজন লোক এসেছিল। একজন বাবুসাব, অন্য দু-জনকে চিনি না। মনে হয় ওনার কথাতেই ওরা হাগামুতা করে। মাকে যা-তা বলে গেল।

শাসিয়ে গেল জমি নাকি দিতে হবে। নইলে মেরে ফেলবে। মার অনুরোধ সত্ত্বেও লাথি মেরে চলে গেল। রোশন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ সারা শরীরে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে ওঠে!

— কী বলিস্, মাকে অপমান? মরে যাব তবু মায়ের অপমান সহ্য করব না! মাহারদের এবার জেগে উঠতে হবে। কিন্তু কীভাবে জেগে উঠতে হয়?

যুদ্ধের সময় এসেছে। পেরোতে হবে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর। মা, কে এসেছিল, বল? সুরেখা বুকের পাঁজর ফাটিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, গোবিন্দ সাব এসছিল! রাস্তার জন্যে তিন একর জমি দিতে হবে। ওর অনেক মাফিয়া গুন্ডা বাহিনী আছে। ওরা খুন খারাপিতে ওস্তাদ।

— কেন গত বছরও তো দুই একর জমি দিয়েছি। এবার বাকি জমিনও কি মাগনা নিতে চায়?

— অ -বাবা রোশন, সুধীর! আমাদের তিন একর জমিও জোর করে দখল নিতে চায়। চায় বললে ভুল। নিয়েই নেবে। রোশন আরো উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ভুলে যায়!

এবার দেখি কোন্ শালা আমাদের জমি কেড়ে নেয়! আলা ইয়ালনির পুত। কুত্তার বাচ্চা! লড়তে লড়তে মরে যাব! তবু জমি ছাড়ব না। সুরেখা রোশনের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, না বাবা-না, এমন করে বলিস্ না! ওদের সঙ্গে আমরা পারব না। ওরা যে কত ভয়ংকর তোরা জানিস্ না! সবাইকে মেরে ফেলবে । হয়তো সকলকে ,সব মাহার পরিবারকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবে। ওরা সাংঘাতিক হিংস্র ও নির্মম। রনবীর সেনা থেকেও নিষ্ঠুর।

সুধীর চিৎকার করে বলে ওঠে, তা বলে জোত জমিন ছেড়ে দেবো? মায়ের অপমান সহ্য করব? মাও জমিন দুটোই যদি চলে যায়, তবে আমাদের আর থাকল কী? এ-জীবন বড়ো ঘৃণ্য জীবন। মা, শুনতে পাচ্ছনা, ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর আমাদের ডাকছে। সমস্ত মাহার পরিবার গুলোকে এক হতে হবে। তিনি রাতের আকাশের তারা হয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টি দেন। আর্শীবাদ করেন, আর দেখেন আমরা কী করি। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। রুখে দাঁড়াতেই হবে।

সুরেখার বাড়িতে মাহার পরিবারের অনেকেই এসে হাজির হয়। ডাকতে হয় না । এদের অনেকের জমিনই ইতিপূর্বে কোন না কোন ভাবে হারিয়েছে। ছলে বলে কৌশলে কেড়ে নিয়েছে। অনেকেই আজ ভিক্ষুক। প্রতিবাদের কণ্ঠ হারিয়ে গেছে। উচ্চবর্ণের সন্ত্রাসীরা প্রতিবাদী কণ্ঠ কেটে দেয়। কলি ছিঁড়ে ফেলে। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া ওরা আর কিছুই বোঝে না। আইন-আদালত ওদের কথায় ওঠে বসে। সুরেখার পাশের বাড়িতে থাকে কুহরা মাহার। তার জমিও স্বৈরাচারী দালালেরা কেড়ে নিয়েছে। সে এখন অন্যের বাড়িতে কাজ করে। প্রায়ই জুতো পেটা খায়। সে বলল, প্রতিবাদ করতেই হবে। আর জমি দেব না। মরে যাব। তবু লড়ব।

সেদিন সেখানে ছোটখাটো একটা মিটিং হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত হলো, —সবাই এক সঙ্গে লড়বে। কিন্তু কীভাবে লড়বে, বুঝতে পারে না।

খৈরলাঞ্জি মাহারগ্রামের মাটি জেগে উঠছে। এবার মাটি অন্য কথা বলবে। মাথা তুলে দাঁড়ানোর কথা বলবে হয়তো। মাহারদের মধ্যে রোশন বি.এ. ফাইন্যাল দেবে। সুধীর কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। অত্যাচারের মাত্রা ওরা বুঝতে শিখেছে। সুধীর প্রতিবাদের মূল পথ খুঁজতে থাকে। ভাবে কীভাবে জমিনটুকু রক্ষা করবে। শুধুমাত্র তো তাদের জমিই নয়। সব মাহারের একই করুণ অবস্থা।

আগেও উচ্চবর্ণরা অন্যের জমিও সম্পদ লুঠে নিয়েছে। ভবিষ্যতেও নেবে। কীভাবে অত্যাচার বন্ধ করা যায়? রাতের আকাশে তারাদের মাঝে উত্তর খোঁজে। রাত্রির দৈর্ঘ্য আরো বেড়ে যায়। বাতাসে বিপ্লবের গন্ধ পায়। কে যেন কানে ফিসফিস্ করে বলে, — এগিয়ে যাও। জয়ী হবে। রক্ত ঝরবে। রক্তের নদী দিয়ে আসবে আলোর বন্যা। সে আলো ঝড়েও নিভবে না। সুরেখা জমি দেবে না। সমস্ত মাহার পরিবারগুলো একত্রে প্রতিবাদ করতে চায়। এই খবরটা গোবিন্দের কানে আগেই পৌঁছে যায়। তবে কীভাবে পৌঁছেছে তা জানা যায়নি। বাতাসেরও কান আছে। সূর্য উঠলে তো সবাই দেখতে পাবেই। সেদিন ছিল ২৯ শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং। সুরেখার বাড়িতে আক্রমণ করা হলো। কারা? দুষ্কৃতকারীরা? সুরেখা ও তার ছেলেমেয়ে সবাই বাড়িত্রেই ছিল।

কিন্তু কেন আক্রমণ করা হলো? অত্যন্ত পাকা লাঠিয়াল। গোবিন্দের সঙ্গে যে দুটো লোক ছিল সেদিন, ওরাও সন্ত্রাস চালায়। গোবিন্দের আদেশেই নিরস্ত্র ও নিঃসহায় দরিদ্র মাহার পরিবারকে আক্রমণ করে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। বীজ অঙ্কুরিত হবার আগেই তপ্ত বাতাস তা নষ্ট করে দেয়।

সুরেখা ও তার মেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। মোহলিশ কালার নামে একটা গুন্ডা ওদের দেখে চিৎকার করে বলে, পালিয়ে যাচ্ছে রে, ধর। মাগী দুটোকে ধরে আন। আজ কাঁচা মাংস খাব ছোটটারে খেতে স্বাদও হবে। ডাগর-ডোগর শরীর দুটো! বুক কেমন উঁচা! কামড়িয়ে বোঁচা করে দেবো। আন্-আন্, আগে কিছু পাম্প দেই। আমার ইয়ে করবার ইচ্ছা হইতাছে। নুংখুড়া লাফাইতেছে। মাগীর ইয়াডা ফ্যাডাইলামুনা?

গোবিন্দ সুরেখাকে বলছে, আজ তোদের কথা বলার দিন শেষ। শেষ কথা আমরাই বলব। এ গ্রামের সব মাহারকে মেরে ফেলব। নতুবা পালিয়ে যাবে। এটা আমাদের পরিকল্পিত আক্রমণ। এভাবে তোদের সব জমি এমনিতেই পেয়ে যাব। আরে, তোরা থাকলে তো দিবি? না থাকলে তো সব আমাদেরই। সুরেখা তবু গোবিন্দকে শেষ অনুরোধ করে, আমাদের ছেড়ে দিন, সব জমিন দিয়ে দেব। প্রাণে মারবেন না!

গোবিন্দের চোখ লাল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। মোহলিশকে ডেকে বলে, শোন্‌রে মোহলিশ, বানছুতি বলে কী? মাগী এখন পথ হারাইয়া পথে আইছে। ভেংচিয়ে বলে, জমি দেব। এখন জমির সঙ্গে তোকে, তোর মেয়ে, সব্বাইকে দিতে হবে। যা-রে মোহলিশ, এই বানুছুতির সঙ্গে তুই কু-কাম কর। আমি ছোটটারে —। সুরেখাকে গোবিন্দ মোহলিশের দিকে ঠেলে দেয়। তাদের চিৎকারে আকাশ ভারী হয়! কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না। মরণ-আর্তনাদ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে!

প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সামনে সুরেখাও তার মেয়েকে ধরে এনেছে। উলঙ্গ করে রাজপথে ঘুরাল। কী মর্মান্তিক জঘন্য ঘৃণ্য কাজ! কী নির্লজ্জ মানব সমাজ! সতী সাবিত্রীকে আমরা পুজো করি। মা-দুর্গাও তো নারী। আমরাও তো নারীর গর্ভজাত সন্তান। মানবতাবাদ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন! গুন্ডাবাহিনী মা-মেয়েকে ট্রাকে তুলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একের পর এক ধর্ষণ করল। গোবিন্দই প্রথম প্রিয়াঙ্কাকে ধর্ষণ করে। নগ্ন সাদা বুকে হাত বোলায়। কুমারীস্তন মুঠো করে ধরে! সমস্ত শরীরটাকে কামড়িয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়! গোবিন্দের মেয়ের বয়সী প্রিয়াঙ্কার সতীত্বের পর্দা

ছিঁড়ে যায়। ধর্ষিত হলো, ঝরে গেল জীবন! ওদের ভগবান গুমরে কাঁদে!

অন্য একটি ট্রাকে তুলে তার মাকেও একই কায়দায় ধর্ষণ করা হয়। অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চিৎকার শোনা গেছে। পুলিশ বা অন্য কেউ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেনি। তারপর সুরেখা ও প্রিয়াঙ্কার যৌনাঙ্গ দিয়ে বাঁশ ঢুকিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেন সভ্যতার নির্মম নিদর্শন। বাঁশ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। সমগ্র পৃথিবী লাল হয়ে যাচ্ছে। কেঁদে উঠছে ধরিত্রী-মা! এদের হাত থেকে কবে নারীরা মুক্তি পাবে? এদের কী বিভৎস রূপ!! গুন্ডাবাহিনী আনন্দে মেতে ওঠে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সভ্যতার ওপর! পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে নারীদের ওপর এমন মর্মান্তিক অত্যাচার, হিংস্র ধর্ষণ হয়েছে কিনা, জানা নেই। আজ বিশ্বের সমগ্র কলঙ্কিত ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেল। ধন্য ভারতবর্ষ। ধন্য মহারাষ্ট্রের খৈরালাঞ্জি গ্রাম! ওখানকার শাসকেরা মাতাল!

এখনো বাতাসে সুরেখা ও তার মেয়ে প্রিয়াঙ্কার আর্ত চিৎকার শোনা যায়। সুরেখা যেন বলছে, আমাদের ছেড়ে দিন, আমার প্রিয়াঙ্কাকে ছেড়ে দিন, মারবেন না। সব জমি দিয়ে দেব। শুধু আমার মেয়েকে ছেলেকে ছেড়ে দিন।

এই আকাশ কাঁপানো চিৎকার -আর্তনাদ আকাশে-বাতাসে মিলিয়ে যায়। স্বজাতিরা পালিয়ে গেছে। সূর্য ডুবে যায় লাল তরলে। কালার ও পাওয়ারেরা মজা লুটছে, হাসছে। হিংস্র শিকারে মেতে উঠেছে!

রোশন ও সুধীরকেও বেঁধে রাখা হয়েছে। মেরে মেরে তক্তা করা হয়েছে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। প্রতিবাদের আগেই প্রতিবাদী কণ্ঠ কেটে দেওয়া হয়েছে। যেন দুটো বাঁদর, মৃত্যুর খেলা দেখতে এসেছে। মানুষের ওপর মানুষের কী নির্মম অত্যাচার! তাদের চোখের সামনে মা ও বোনের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে। সুধীর ও রোশন দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে দেখেছে। কিছুই করতে পারেনি। যতক্ষণ জীবিত ছিল ততক্ষণ অশ্রু ঝরেছে। ছটফট করেছে। পরে তাদেরকেও হত্যা করে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়। প্রতিবাদের স্বর চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে চায়।

অন্ধাল থানার পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। উল্টো গোবিন্দকে মোটা টাকার বিনিময়ে এ-সব কাজে সাহায্য করেছে। হায় রে পুলিশ চরিত্র! হায় রে দেশপ্রেম!

ডাঃ এ. কে. জে. সেন্দ্রে বিকৃত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দিলেন। ডেডবডির আসল ময়না তদন্ত হয়নি। চারজনের মৃত্যুই স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিলেন — 'নর্ম্যাল ডেথ'।

এরা ডাক্তার না পিশাচ? নররূপে অসুর? এদের বিচার কে করবে? সুরেখাও তার ছেলেমেয়ের আত্মারা আজও কাঁদে! বাতাসে ফিস্‌ফিস্ করে জিগিব তোলে। এদের কান্না কবে শেষ হবে?

অন্য লজ্জা

বাইশঘরিয়া গ্রামকে খোয়াই নদী রামধনুর মতো তিনদিকে ঘিরে রেখেছে। যেন মায়ের কোলে শিশু। প্রাকৃতিতে মেখেছে আবির। নদীর পাড়ের মানুষ বুকে লাগায় শীতল বাতাস। বসন্তে কোকিল ডাকে। হৃদয় জানালা খুলে যায়। যুবক যুবতীরা নদীর কাকচরে বসে গল্প করে। প্রেম-টেম করে। তিনযুগের হেলানো বটগাছ অলস স্বপন জাল রচনা করে। দুপুরে বটের শিকড়ে হেলান দিয়ে-পায়ের ওপর পা তুলে অনেকেই কবি হয়ে যায়। লিখতে গেলেই এলোমেলো। বাতাসে সব পংক্তি হারিয়ে যায়। আলো-আঁধারি খেলা। এমনি অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোলে বাইশঘরিয়া গ্রাম। প্রতিদিন গ্রামখানি সূর্যের সাথে, মেঘের সাথে খেলা করে। আর খেলা করে ষোড়শী যুবতী তসলিমা বেগম। গোল্লাছুট খেলতে ভালবাসে। বুক-নাচন-দোলন। হৈ-চৈ চেঁচামেচিতে উস্তাদ। নৈতালিম উচ্চ-বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশুনায় মাঝারি। সর্বশিক্ষার কল্যাণে বই কিনতে হয়নি এতদিন। পুরান নোটবই অন্যের কাছ থেকে চেয়ে আনে, পড়ে। ওর মা যে বাড়িতে কাজ করে, সে বাড়ির মালকিন দুটো অর্থ বই দিয়েছে। পুরানো হলেও নতুনের আদল।

এই জনবসতি পূর্ণ গ্রামকে গ্রাম না বলে শহরতলিও বলা যায়। শহরের বাতাস ঢুকে গেছে অনেক আগেই। শহর থেকে ঘুর পথে প্রায় এক কিমি। সোজাসোজি খোয়াই নদীর সাঁকো পেরিয়ে গেলে মাত্র দুইশত মিটার। কৃষি নির্ভর গ্রাম। চাকুরিজীবীও আছেন। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি। যেন একই বৃন্তে দুটো কুসুম। বিপদে-আপদে এ-ওকে সাহায্য করে। চাঁদা তুলে গরিব মেয়ের বিয়ে দেয়। সেজন্যেই রুজিনা বেগম স্বামীর ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে পারেনি। আঁকড়ে ধরে আছে। আর যাবেই বা কোথায়? স্বামী তো এই কুঁড়ে ঘরটুকু ছাড়া আর কিছুই রেখে যায়নি। গ্রাম ও মানুষকে ভালবেসে ফেলেছে। নাড়ীর টান। সমুদ্র নদীর স্রোতকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তসলিমার বাবা নেশা করতো। স্ফূর্তি! প্রতিরাতেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শরাবের আসর বসাত। রুজিনা বাধা দিয়েও আটকাতে পারেনি। আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, পারেনি। কারণ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। নেশা করতে করতে কখনো সম্রাট কখনো ভিখারী হয়ে যেত। নররূপী অলস পশু। তবে মনটা খুব ভাল ছিল। আবার কখনো ভগবান বা আল্লাহ হয়ে যেত। অবশিষ্ট ধানী জমি বিক্রি করে গরুর ব্যবসা আরম্ভ করে। ফকিরউদ্দীন অনেক রকম ব্যবসা করেছে। কোনটাই টেকেনি। জুত করে উঠতে পারেনি। বাংলাদেশের এক গরু ব্যবসায়ীকে টাকা দিয়েছিল। ব্যক্তিটি টাকাও দেয়নি, গরুও দেয়নি। টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। বিশ্বাসের ঘরে চুরি। টাকার শোকে লোকটা আরো মদ খেত। একদিন মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে ফকিরউদ্দীন মারা গেল। স্ত্রী রুজিনাকে মরুঝড়ে ফেলে গেল। সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে হাওয়ায় মিশে গেল। নাবালক সাত সন্তান। পাঁচ বোন—দুই ভাই। রুজিনা চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলো। গ্রামের মানুষেরা বলেছিল, কাঁদিস্ না, চিন্তা করিস্ না রুজিনা। আমরা আছি না? টুকটাক সাহায্য করুমনে। কাজ করে খা। কাজে লজ্জা নাই। সেদিন থেকে রুজিনা বুকে বল পেল। কাজের লোক বা দিনমজুর হয়ে গেল। গৃহবধূ মরে গেল। বাঁচার জন্যে উঠে দাঁড়াল। গরিবরা এভাবেই উঠে দাঁড়ায়। জীবনকে যুদ্ধের মাঠে নিক্ষেপ করে। অভিজ্ঞতা বেড়ে বৃদ্ধ হতে থাকে। কঠোর পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে থাকে রুজিনা।

সাত ভাইবোনের মধ্যে তসলিমাই প্রথম। অনেক দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। ছোট

ভাইবোনদের সে নিজেই দেখাশুনা করে। মা আর কতক্ষণ বাড়ি থাকে? মা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যায়। সংসারিক কাজে সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠছে। রুজিনা এখন খেতে-খামারে, অন্যের বাড়িতে কাজ করে। ঝি-এর কাজও করে। তবে পরিচারিকার কাজে পোষায় না। আজকাল রুজিনার অন্য একটা চিন্তাও মাথায় ঢুকেছে। ভেবে ভেবে প্রায় সময়ই অস্থির হয়ে ওঠে। কী করে যে মেয়েদের পার কররে? পণ না দিলে— কী ভাবে বিয়ে হবে? অন্নহীন বিধবার মেয়েকে কোন্ ছেলে নিতে রাজি হবে? এ-সব চিন্তাগুলো মাথায় কিলবিল করে। শরীর অবশ—, শীতল হয়ে যায়। রাতে ঘুম হয় না। প্রতিদিন কিছু কিছু পয়সা জমিয়ে রাখে। এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে। অন্য মেয়েদের বিয়েতে খরচের বহর শুনলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়। পণ দিয়ে বিয়ে দিলেও বধূ নির্যাতন তো দিন দিন বেড়েই চলছে। সীমাহীন লোভ কোথায় নিয়ে যাবে সমাজকে? এ-সব কথা যেদিন ভাবে সেদিন রাতে রুজিনা আকাশের তারা গোনে। পাঁচটি মেয়ে ঘরে। নিজেকে পাগলীর মতো লাগে। তখন রুজিনা নিজের সঙ্গেই আবোল-তাবোল বকে। নিজেকে নিজেই চিনতে পারে না। অচেনা-অচেনা লাগে। ভিন্ন গ্রহের জীব মনে হয়। অথবা কী যে মনে হয় সে নিজেই জানে না। তবু ভাবে। ভেবে কূল কিনারা পায় না।

এবছর তসলিমা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। হয়তো পাশও করবে। রুজিনা মেয়েকে পড়াশুনার ব্যাপারে বিশেষ কোন সুবিধা দিতে পারেনি। বাড়িতে কাজ সেরে পরীক্ষায় যেতে হয়েছে। টিউটর রাখতে পারেনি। অন্যের কাছ থেকে নোট, সাজেশান চেয়ে এনে পড়েছে। পরীক্ষা একেবারে মন্দ হয়নি। পাশ করলে— স্কুলে আমার একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে হবে — ভীষণ সমস্যা। খরচ কে চালাবে? তসলিমার লেখাপড়া করতে ভীষণ ইচ্ছে।

তসলিমা এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেব পড়ায়। ওয়ান-টু। ঘরে মাটিতে ধাড়ি বিছিয়ে তসলিমা মাঝখানে বসে। চারদিক কচিকাঁচারা। মাসের শেষে তিন-চারশ'। ভবিষ্যতে ও দিদিমণি হতে চায়। পারবে কি না কে জানে। ছোট ভাই বোনদেরও পড়াতে হয়। সীমিত স্থানে সমস্যায় পড়ে।

এ-পাড়ায় মৌলবি সাহেবের বাড়িতে একটি অচেনা যুবক ভাড়া এসেছে। প্রায় সময়ই বাইক নিয়ে ঘুরে। ঠিকেদারি কাজ না কী করে। টল ফিগার। হ্যান্ডসাম। চোখগুলো বড় বড়। চুল ক্রিকেটাব ধোনির মতো। গায়ের রং ফর্সা। বয়স পঁয়ত্রিশের পাশাপাশি। মাঝে মাঝে ফ্ল্যাক সিগারেট টানে। ধোঁয়া ছাড়ে বুক ফুলিয়ে। বাঁ-হাতে দু-আঙুলের মাঝে জ্বলন্ত সিগারেট। মালটো আছে বোঝা যায়।

সেদিন আমির খান পুকুরে চান করতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক! সে চোখ ফেরাতে পারছে না। একটি মেয়ে পুকুর ঘাট আলো করে, ব্লাউজ-ব্রেসিয়ার খুলে, হালকা কাপড়ে গা ঢেকে চান করছে। মেয়েটি আমিরকে দেখেনি। ওকে দেখার প্রবল লোভ সামলাতে পারেনি আমির। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখা তো অন্যায় নয়। এ যে প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি। নারী এত সুন্দরী হয়! নাকি স্বপ্নের কোন মায়াপরি! ভেজা কাপড় শরীর চেপে লেগে আছে। ফর্সা বুকগুলো আপেলের মতো। নেচে নেচে উঠছে। আমিরের বুকে আগুন লাগে। পাঁচ-সাত মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। ওর সামনে গিয়ে পুকুরে নামতে ভীষণ লজ্জা করছে। আমির ফিরে আসে উঠোনে। তার দেরি দেখে মৌলবি সাহেব বললেন, কি হে আমির, স্নান করতে গেলে না? তোমাকে নিয়ে তো আগরতলা যাবার কথা। দেরি করলে অফিসের বড়বাবুকে পাব না। তাড়াতাড়ি কর! আমির একটু ঘাবড়ে যায়। আমতা আমতা

করে বলে, "পুকুরে একটা পরি স্নান করতেছে। তাই ফিরে এলাম। মৌলবি অবাক হয়! পুকুরঘাটের দিকে উঁকি দিয়ে দেখে বলে,—ধুরো বেডা আমির, ও-তো পরি নয়। আমাদের তসলিমা। খুব ভালমেয়ে। আমার বাড়িতে যে কাজ করে রুজিনা, ওর মেয়ে। আরে, পরশু দিন সে তোমারে ভাত খেতে দিয়েছিল। মেয়ের বাপটা নেশা করতে করতে মরে গেল। জমিজমা ছিল। এখন সংসারের সব ভার রুজিনার ওপর। দিনরাত যে কীভাবে যায় ওর! সে নিজেই জানে না। শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ঘরকন্নার কাজ তসলিমাকেই দেখতে হয়। বাপমরা মেয়ে। আমির স্বাভাবিক হয়ে যায়। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু মনের মধ্যে ঝড় শুরু হয়। ঝড় ছুটে যায় রক্তে, শিরা ধমনীতে। মনের আগুন জ্বলছে সাড়ে পাঁচগুণ। জল দিলে কি নিভবে? নাকি তসলিমা জল? সেইরাতে আমিরের ঘুম হয়নি। ওঠবোস করেছে। জল খেয়েছে। পরিকল্পনার নক্সা করেছে। রাত কাবার। তসলিমার গোসলের পানি যদি তৃষ্ণার্ত আমিরকে গোসল করিয়ে দেয়। ওর শরীর ধোয়া গড়িয়ে পড়া পানি আমির শরীরে মাখতে চায়। অনুভব করে নিবিড় নরম শরীরের স্পর্শ। আমির মনে মনে অনেক দূর এগিয়ে যায়। রূপের পাগল!

আমির সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে সুযোগও এসে গেল। রুজিনা তখন দুপুর রোদে ধান শুকাচ্ছিল। একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে কাঁঠাল গাছটার তলায় বসে। আশেপাশেও লোকজন নেই। এই অবসরে আমির রুজিনার কাছে এসে বসে জিজ্ঞেস করে, আপনার মেয়ে তসলিমাকে বিয়ে-টিয়ে দেবেন না? না আরো পড়াবেন? রুজিনা অবাক হয় না। কারণ, এই ছেলেটি মৌলবী চাচার খুব প্রিয়। ওর গুণপনার কথা আগেই ওনার কাছে শুনেছে। ব্যবহারও নাকি সাংঘাতিক ভাল। রুজিনা একটু দুঃখের সঙ্গেই বলে, অ-বাবা, পড়ামু কেমনে? টাকা পয়সা নাই। আবার বিয়ে যে দেমু তারও উপায় নাই। গরিব বিধবার মাইয়ারে কেডা নিব? নুন আনতে পান্তা ফুবায়। আবার বিয়ের টাকা! এ সব নিয়ে ভেবে কূল পাই না। কী যে হবে! বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুজিনা উঠে দাঁড়ায়। আমির চারদিকে চেয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। আমিরের বুকে সাহস সঞ্চিত হয়। দম নিয়ে আমির ভূমিকা করে বলে, আমার তো তিনকূলে আর কেউ নেই। মা-বাবা গাড়ি এক্সিডেন্টে মারা গেছেন। এর পর থেকেই আমি যত্রতত্র ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন জায়গায় ঠিকেদারি কাজ করি। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারি না। আবার বাড়ি গেলে মা-বাবার কথাই বেশি মনে পড়ে। যন্ত্রণা হয়। তাই যাই না। ডান হাতে চোখের পানি মুছে আরো বলতে থাকে, আমার বাড়ি সোনামুড়া। বাসস্ট্যান্ড থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। মা-বাবাকে হারিয়ে বিয়ে সাদি করার ইচ্ছে থাকলেও করতে পারিনি। যদি কিছু মনে না করেন—আপনার মেয়ে তসলিমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। যদি পাত্র হিসাবে আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, তবে তসলিমাকে বিয়ে করতে চাই। আপনাকে সরাসরি কথাটা বললাম বলে বেয়াদপি মাপ করবেন। আমার তিনকূলে কেউ নেই। আপনিই আমার মা-বাবা। আমির টুপ করে রুজিনাকে একটা কদমবুসি দিল।

—আরে—কী যে বল বাবা! আমার তো কোনো টাকা পয়সাই যোগাড় নেই। কী করে তা সম্ভব?

—না, আম্মাজান, না করবেন না। আমি আপনার ছেলে হব। বিয়ের সমস্ত খরচ আমিই দেব। আপনাদের কোন টাকা পয়সা লাগবে না। তসলিমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসব। ওকে কোন দুঃখই দেব না। আল্লার নামে শপথ করে বলছি। সর্বদা সুখে রাখব। আমি এ গ্রামেই ওকে নিয়ে

আপনাদের নিয়ে থাকব। আমি আমার মা ভাইবোন ফিরে পাব। খোদা মেহেরবান। বাঃ কি আনন্দ! রুজিনা কাজ করতে করতেই বলে, এখনই তো কথা দিতে পারলাম না। মৌলবি চাচার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। দেখি উনি কি বলেন ...।

মৌলবি চাচা কোন আপত্তি করেননি। বরংচ খুশিই হয়েছিলেন। কারণ, আমিরের ব্যবহারে মৌলবি দারুণ উল্লসিত। নিজের সন্তানও মৌলবিকে এতটা খাতির যত্ন এবং শ্রদ্ধা করে না। মৌলবি গলে গেল।

...ওরা সোনামুড়া আমিরের বাড়িঘর দেখতে যায়নি। আর দেখেই বা কী হবে? যার তিনকূলে কেউ নেই। সে তো এখানেই থাকবে। নাকি? বিয়ে হয়ে গেলে সোনামুড়ার জমি, ঘরবাড়ি বিক্রি করে বাইশঘরিয়া এসে ব্যবসা করবে। এমনই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আড়ালে থেকে এ-সব শুনে খুশিতে তসলিমার মন ভরে গেছে। লজ্জায় লাল হয়েছে। দরজার ফাঁক দিয়ে আমিরকে দেখেছে, বার বার। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা হবে। কয়েকজন লোকও রাখতে হবে। অঙ্ক কষে কষে জীবনের সোপান অতিক্রম করবে। প্রাণের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে বাঁক নেওয়া খোয়াইয়ের প্রতিটি ছন্দে। অবশ্য তসলিমা যদি পাশে থাকে। আমিরের বাউন্ডুলে জীবনের অবসান হবে। মৌলবি সাহেব রুজিনাকে ডেকে বলে, এমন সোনার টুকরো ছেলে আর পাবি না। ছেলেটা খুবই ভাল রে। একে খোদাই পাঠিয়েছে! দিলটা বড়ো খোলসা।

—আপনি যদি কন তাহলে ভেবে দেখতে পারি। আপনি আমার মুরব্বি। তাছাড়া আমার তো কোন সম্বল নেই। খরচাপাতি...। রুজিনা চিন্তায় পড়ে যায়।

—খরচাপাতির জন্য ভাবিস্ না। ও সেটা ম্যানেজ করে নেবে। মৌলবি সাহেব কথাগুলো হালকা ভাবে বলে এবং হাসে।

তিনবার কবুল করে—তসলিমা ও আমিরের বিয়ে হয়ে গেল। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ বলেছেন—মুসলমানের বিয়ে আসলে Civil Contract। মহামেডান আইনেও তা বলা আছে। বিয়েতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নিমন্ত্রিত ছিল। আলাদা ডাইনিং হল। সব খরচের ব্যবস্থা আমির করেছিল। গাঁয়ের মানুষ বিয়েতে আন্তরিক খাটাখাটনি ও সহযোগিতা করেছে। ভূরিভোজ হয়। একজনের বিপদে অন্যজন এগিয়ে আসে—যদি সাহায্য হয়। এ-গ্রামে হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে আপন জনের মতো ব্যবহার করে। কাজেই বিয়ের অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমক হয়। নাচানাচি হয়। রুজিনার কিছু জমানো টাকাও উজাড় করে খরচ করে। ভাইবোনেরাও আনন্দে মেতে ওঠে। বিয়ের প্রথম রাতেই ওরা খুব কাছাকাছি আসে। হৃদয়ের পবিত্র পুনর্মিলন। শরীরে শরীরে উষ্ণ স্পর্শে মাতাল হয়ে নাচতে থাকে সারা রাত। রাত বড়ই ছোট হয়ে গেছে আজকাল। কখন যে রাত পোহায়ে পাখি ডাকতে শুরু করেছে, সূর্য অনেক ওপরে উঠে গেছে, ওরা বুঝতেই পারেনি। হেসে উঠছে বার বার। তসলিমাও নেশার মতো প্রতিরাতেই আমিরের শরীরের উষ্ণ স্পর্শ সুখ চায়। কই, বিয়ের আগে তো এমন অদ্ভুত নেশা ছিল না! আমিরও তখন ইচ্ছে মতন পুরুষ হয়ে ওঠে। পুরুষের সমস্ত রকম খেলা দেখায়।

এমনি করেই দিন যায়, রাত্রি আসে। আবার দিন। এভাবেই কখন যে একটি বৎসর চলে গেল, তসলিমা-আমির খেয়াল করেনি। দেড় বছরের মাথায় কোল আলো করে জন্ম নিল মুন্না। তসলিমা এখন মুন্নাকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। ওকে হাগা-মুতি, গোসল এবং খাওয়াতেই সময় চলে যায়।

মুন্নাকে তসলিমা ও আমির দুজনেই প্রাণাধিক ভালবাসে। আদর করে। মুন্নার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দুজনে হেসে কাত। নাতিকে কোলে নিয়ে রুক্সিনাও আমোদে আবোল-তাবোল। মুন্না দু-একটি কথা বলা শিখতে থাকে। শিশুর মাঝে ওরা বিশ্বের আনন্দ খুঁজে পায়। বড়ো সার্থক মনে হয় জীবন। এভাবে আরো দুটো বছর কেটে গেল। মুন্না সারা বাড়িময় দৌড়াদৌড়ি করে। ঘুরে বেড়ায়। অ আ ক খ পড়ে। তসলিমা একটু মোটা হয়ে গেছে। সৌন্দর্য যেন আরো ঢলে পড়েছে তসলিমার গায়। যেন সূর্যের গায়ে আবির রঙ। যে কোন লোকের চোখ ফেরে না। মাতৃত্বের অভিব্যক্তি সারা দেহে ফুটে উঠেছে।

মাঝে মাঝে আমির অদৃশ্য হয়ে যায়। বাড়িঘরে থাকে না। কোথায় যায়? সপ্তাহ, পনের দিন, কখনো বা এক মাস দু-মাস, কখনো তারও বেশি। কিছু জিজ্ঞেস করলে-বলে, কন্‌ট্রাক্টরি কাজে অনেক জায়গায় যেতে হয়। আমির আরো বলে, সোনামুড়া গিয়েছিলাম। বাড়িঘর দেখে এলাম। জমিগুলো বর্গা হিসাবে চাষ করতে দিয়েছি। নিজের জায়গা, সম্পত্তি দেখাশুনা তো করতেই হয়। সময় লাগে। তাছাড়া পুরানো বন্ধু-বান্ধব। কত যে পরিকল্পনা। একটু ভুল হলেই তো সর্বনাশ। এ কারণেই আরো বেশি সময় বাইরে থাকতে হয়। তসলিমার সন্দেহ কেটে যায়। সমগ্র শরীর দিয়ে হাসে। স্বামীকে আর কোন প্রশ্ন করে না। ভাবে ...। বলে, আমাদের তো অনেক জায়গা। অনেক সম্পদ। ওখানে গিয়ে থাকলেই হয়। মুন্নার বয়স এবছর তিনে পড়ল। সাদামাটা করে জন্মদিনও পালন করা হয়। আমির বাড়িতে ছিল না। দু'দিন পরে বাড়ি এল। এখন আর আগের মতো টাকা খরচ করতে পারে না। হয়তো ব্যবসাতে টাকা ইনভেস্ট করেছে। টাকার ভীষণ ঘাটতি আছে। তসলিমা জিজ্ঞেস করে না। শুধু ভাবে। আমিরের চেহারায় মলিনতার ভাব এসেছে। অনেকটা চিন্তিত চিন্তিত ভাব। তসলিমা একদিন স্বপ্নে দেখেছে, আমিরের মুখটা বানরের মুখের আদলে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে! দৈত্যের চেহারায় রাক্ষসের মুখ! ভয় পেয়ে সে-রাতে তসলিমা ঘুমোতে পারেনি। আজব স্বপ্ন!

একদিন তসলিমা স্বামীকে একান্তে পেয়ে প্রস্তাব দেয়। চল, আমরা সোনামুড়ায় আমাদের বাড়িতে চলে যাই। এখানে আর ভাল লাগে না। বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়িতে শোভা পায় না। তাছাড়া আমার বাবাও নেই। মা একা সংসার চালায়। ভাইবোনেরাও কম কষ্ট করে না। যেহেতু তোমার বাড়িঘর, জায়গা-সম্পত্তি সবই আছে, এ অবস্থায় এখানে থাকার কোন মানেই হয় না। এখানে নতুন করে বাড়ি করার দরকার নেই। পিতৃপুরুষের বাড়ি এভাবে ফেলে রাখাও ঠিক নয়।

প্লিজ চল, আমরা সোনামুড়া চলে যাই। পূর্বপুরুষের আশীর্বাদে আমরা ধন্য হব। আমির অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কী যেন হিসাব কষতে থাকে। মুখটা যেন মুখোশে ঢাকা পড়ে। অপরাধী মুখের মতো আমির অচেনা হয়ে যায়। গভীরে ভাবতে থাকে। তসলিমার ডাকে আমির সম্বিত ফিরে পায়।

— কী কোন কথা বলছ না যে? কী এত ভাবছ? কোন বিপদ-টিপদ হলো নাকি? নাকি শরীর খারাপ? তসলিমা আমিরের কপালে হাত রাখে, ছুঁয়ে পরখ করে দেখে। আমির স্বাভাবিক হতে চায়। পারে না। তসলিমার চোখে কি কোন কিছু ধরা পড়ে গেছে? তোমার কথাই ঠিক অনেক ভেবে দেখলাম। চল, আমরা সোনামুড়া নিজের বাড়িতেই চলে যাই। ঘরবাড়ি জমিজমা তো পড়েই

রয়েছে। অন্য লোকে লুটেপুটে খাচ্ছে। অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে। আগামী রবিবারেই রওনা দেব। তুমি গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মুন্নাকেও তো মানুষ করতে হবে। সোনামুড়ার কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেব। তসলিমা আমিরের কথায় খুশি হয়ে বলে, আমার আপত্তি থাকবে কেন? স্বামীর ভিটেমাটিই নারীর আল্লাহ, মক্কা-মদিনা। আজমের মিষ্টি সুর।

কথাটা শুনে খুব কষ্ট হলো রুজিনার। এতদিন মনে হলো, আমিরের বাড়িঘর না দেখে বিয়ে দিয়ে ভুল করেনি তো? বুকে কী যেন একটা ব্যথা ব্যথা লাগছে। মায়ের মন। পাথর চাপা দুঃখ। তবে মৌলবি চাচার কথা শুনে বুকের পাথর হালকা হয়। স্বস্তি ফেলে। অন্যদিকে খুশিও হয়। কারণ, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। না থাকুক শ্বশুর-শাশুড়ি। তবু তো নিজের স্বামীর বাড়ি। গ্রামের মানুষের সাথে বুক ফুলিয়ে গর্ব করে গল্প করবে। কিছুদিন পর পর ঘুরে আসবে তসলিমার বাড়ি। স্বপ্নের ডালপালা! মুন্নাটার জন্য ভীষণ কষ্ট হবে। সব সময় নানি-মা, নানি- মা বলে ডাকত। রাতে কখনো ঘুম ভেঙে হয়তো সে ডাকই শুনবে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওদের যেতেই হবে। বাইশঘরিয়ার জীবন কি শেষ? কে জানে কী আছে কপালে। জন্ম থেকেই এ গ্রামের মানুষের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে তসলিমা একাত্মা হয়ে গেছে। নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই প্রথম তসলিমা ঘরের বাইরে পা দিল। প্রতিবেশীরা বলছে, সময় পেলেই আমাদের দেখে যাস্। খবর দিস্। তসলিমা মনে মনে বলেছে, সময় আর পাব কই? নিজের সংসার বলে কথা। কত কাজ! কীভাবে গোছগাছ করবে— মনে মনে একটা পরিকল্পনা সর্বদাই করছে। যাবার সময় রুজিনা আমিরকে অনুরোধের সুরে বলেছিল, দেখো বাবা, আমার মেয়েটা বড়ো দুঃখী। কষ্ট দিও না। আজ মনটা বড়ো অস্থির। তোমার শ্বশুর বেঁচে থাকলে তোমাকে অনেক খাতির যত্ন করতো।

—না মা, এমন করে বলবেন না। আমি থাকতে তসলিমাব কোন কষ্টই হবে না। কোন দুঃখ ওকে এবং মুন্নাকে স্পর্শ করতেই পারবে না। এ আমার আল্লাহ্র শপথ। মাগরিবের আজানের শপথ। এমন গুনা আমি কোনদিন করব না। আপনি শুধু দোয়া করবেন। রুজিনা আমিরের কথা শুনে অনেকটা হালকা হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বাতাসে কে যেন হেসে ওঠে— তসলিমার বাপ থাকলে আজ খুব খুশি হতো!

বিকেল প্রায় তিনটায ওরা সোনামুড়া বাস স্ট্যান্ডে নামল। গাড়িতে মুন্না ও তসলিমা দুজনেই বমি করেছে। টিউবওয়েলে হাতমুখ ধুয়ে আসতেই আমির বলে, চল চল, তাড়াতাড়ি চল। রিক্সায় একটু দূরে যেতে হবে। রিক্সা ওদের নিয়ে একটা নোংরা গলির ভেতর প্রবেশ করে। চাবদিকে দুর্গন্ধ। নাকে রুমাল দিতে হয়। রিক্সা থেকে নেমে ওরা একটা স্যাঁতসেঁতে মাডওয়াল টিনের ঘরে প্রবেশ করে।

—আজ রাতটুকু এখানেই কাটাতে হবে। কাল সকালেই আমরা রওনা দেব। আমাদের তো পাসপোর্ট নেই। চোরাই পথেই যেতে হবে। সরল তসলিমা কিছু বুঝতে না পেরে আমিরের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে! ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, এটা কি সোনামুড়া নয়? আমাদের বাড়ি কোথায়? তুমি যে বলেছিলে ...। আমির গম্ভীর হয়ে যায়। রাগে ঘাড়ের লোম পশুর মতো খাড়া হয়! ঘাড় বেঁকে যায়। মুখে গড়গড় শব্দ ওঠে। প্রেতাত্মার মতো। আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছি। আসলে আমার বাড়ি সোনামুড়া নয়, বাংলাদেশে। বাংলাদেশের দত্তখলা গ্রামে। সেখানে আমার

পরিবার রয়েছে। সেখানে আমার আরো এক স্ত্রী আছে। তিন সন্তান। বড়টি ছেলে। বয়স আঠার। মেজো মেয়ে। ছোটটি ছেলে। তাছাড়া স্বামী পরিত্যক্তা আমার বড় বোন আছে। মা ও বাবা দুজনই বর্তমান। ধানীজমি কিছু আছে। বলতে গেলে-অভাবের সংসার। চোরাকারবার করে সংসার চালাই। স্মাগলিং। এখানকার মাল ওখানে। আর ওখানকার মাল এখানে চোরাপথে চালান দেই। টাকা কামাই। বি.এস.এফ. এবং বি.ডি.আর.-দের মাসিক দিতে হয়। ইদানিং ওরা খুব কড়া হয়ে গেছে। আগের মতো রোজগার নেই। একবার ধরা পড়ার ভয়ে আমি তোমাদের গ্রামে যাই। তোমার রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তোমাকে ছলে বিয়ে করি।

তসলিমা কী বলবে ...? কথা বলতেই পারছে না। বোবা হয়ে গেছে নাকি? কে যেন বুকে হাজার মন শক্ত পাথর চাপা দিচ্ছে। সামনে সমুদ্র। চোখের কোণ দিয়ে অনবরত পানি ঝরছে। নদীর জল সমুদ্রে গিয়েও কোন দিন শেষ হয় না। তসলিমার দুঃখ সাত সমুদ্র তের নদী। আমিরের কথাগুলো তসলিমার মন বিশ্বাস করতে চায় না। এদিকে মুন্না ভাত খাওয়ার জন্য মাকে বলছে, — মা, ভাত দাও। ভাত খাব। এ কথা তসলিমা শুনতে পাচ্ছে না। ওর মাথায় বজ্রাঘাত! সে মৃত না জীবিত! আকাশ ভেঙে পড়ল। এত বড় বিশ্বাস আজ চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল! এতদিন ও কাকে বিশ্বাস করেছে? ভালবেসেছে? তসলিমা কি ফিরে যাবে? আসলে ও কোথায় দাঁড়াবে?

এক সময় আমির তসলিমাকে বলে, তুমি ইচ্ছে করলে, আমার সঙ্গে যেতে পার। আবার নাও যেতে পার। মুন্নাকে নিয়ে তুমি তোমার মার কাছে ফিরে যেতে পার। তবে তুমি আমার সঙ্গে বাংলাদেশে গেলে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। সতীনের ঘর। পারবে কিনা কে জানে।

এভাবে যে তসলিমার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, ভাবতেও পারেনি। এখন শুধু কাঁদা। আমির এমন প্রতারণা কী করে করতে পারল? বিশ্বাস, স্বপ্ন ভেঙে দুঃখের সমুদ্রে ঝাঁপ দিল! পায়ের তলার মাটি খুঁজে পাচ্ছে না! হতাশায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। নাকি তসলিমা পাগলী হয়ে যাচ্ছে! কী করবে কিছুই বুঝতে পারল না। আমির ঘোষণা দিল, আজ রাতটুকু সময় আছে। কাল ভোর হবার আগেই বাংলাদেশে পৌঁছে দেবার লোক আসবে। নতুবা তোমাকে তালাক দিয়ে মুক্তি দিতেও রাজি আছি। যদি তুমি চাও। তুমি আবার ... —না। না, তুমি তালাক দিবে না। তুমি আমাকে মেরে ফেল। আমি ফিরে গিয়ে কার কাছে দাঁড়াব? কেমন করে এ মুখ দেখাব? আমি তোমার সঙ্গে বাংলাদেশেই যাব। মা জানবে আমরা সোনামুড়া সুখে শান্তিতে আছি। হায়-রে শান্তি! হায়রে কপাল! আমির মনে মনে তাই চাইছিল। হয়তো পরখ করে দেখছিল।

বাংলাদেশে দত্তখলা গ্রামে ওরা সন্ধ্যার আগে পৌঁছে গেল। মরচে ধরা তিনটি টিনের ঘর। বাঁশের পালা। বাঁশের বেড়া। অন্যদিকে একচালা পলিথিনের ছাউনি। বোধ হয় রান্নাঘর। বাড়িতে ঢোকার বাঁ-পাশে আইঠ্যা কলার গাছ। বাড়িতে ঢোকার সময় এক বুড়ির সঙ্গে দেখা। যেন ডাইনোসোরসের মা। বুড়ি খেঁকিয়ে উঠে বলে, 'কী রে গোলামের ছাও, এতদিনে কি ঘরে ফেরার মনে ধরল? এবার নিশ্চয়ই ভাল কামাইছস্? এদিকে তোর মাগ-পোলারে কেডা দেখে? খাওন যে নাই তুই জানিস্ না? কিছু দিন পর পর কোথায় থাকিস্? কিছুই জানি না। নাকি পুলিশের লক আপে ছিলি?

—না মা, এসব কিছুই হয়নি। আমির একটু চুপ করে থাকে। মেরুনবিবি পেছনে একটি মেয়ে ও শিশুকে দেখে, আগের চেয়ে আড়াই গুণ তেজে গর্জন করে উঠে, এরা আবার কারা? একটা পোলাও দি। জ্বালার উপর জ্বালা। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। আমিরের দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠে, কাশতে কাশতে বলে, এইডা কেডারে আমির? নতুন জুডাইছস নাকি? তোর যা স্বভাব! বাড়িতে বউ পোলাপান নাই?

—অ-মা বিয়েই করেছি...। আর কত শ্বশুর বাড়িতে ফেলে রাখুম! ওর নাম তসলিমা বেগম। এটা মুন্না, তোমার নাতি। তসলিমার দিকে চেয়ে, মাকে একটা সেলাম কর। তসলিমা সেলাম করতে গেলে দ্রুত পা সরিয়ে নেয়।

—না-না, সেলাম লাগব না। আপদ যত! আমির মাকে খুশি করার জন্য বলে, তবে এবার একটা অন্য বুদ্ধি আছে মা। তুমি খালি দেখ টাকা কেমনে আসে। তসলিমাকে টাকার গাছ বানামু। আমির মুচকি হাসে।

হায়-আল্লা-রে, হইছে কী? তুই আবার বিয়া করছস্? মেরুনবিবি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। গোলমাল শুনে ফাতেমা ও তার সন্তানরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ফাতেমা আমিরের সঙ্গে বউ দেখে সারা অঙ্গে যেন আগুন ধরে যায়। সঙ্গে বাচ্চাও। যেন আগুনে ঘি! ফাতেমা পাগলিনীর মতো বকাবকি করতে থাকে। মুখে যা আসে তাই বলে। ভীষণ অশ্লীল ভাষা।

তসলিমা এমন অদ্ভুত এবং ভয়ানক দৃশ্য দেখে 'থ' বনে যায়। আমিরের পরিবারের সদস্যরা এমন জঘন্য ব্যবহার করতে পারে! তসলিমা ভাবতেও পারেনি! এমন জানলে বাংলাদেশে আসতই না। মেরুনবিবি গলার স্বর ঝাঁঝিয়ে বলে, কোথাকার কোন বেজাইত্যা বেডি, আমার পা ধরে পাপ দিত আইছে। বেশ্যা, ইয়ালনি কোথাকার।

—না মা, এটা আমার বিয়ে করা বউ। আল্লার সাক্ষী!

—রাখ তোর আল্লা, রমজানের ফিরিস্তি। শূকুরের ছাও কয় কী? আগেও একটা তালাক দিছস না? মেরুনবিবি ধমকে ওঠে। একাই একশ। আমির চুপ হয়ে যায়। মেনিবেড়াল। তসলিমার বুঝতে বাকি নেই যে, তার কপালে দুঃখের সাগর লেখা হয়ে গেছে। এখন মুন্নাকে নিয়ে কী করবে? কীভাবে ত্রিপুরায় ফিরে যাবে? তবু শেষবারের মতো, তসলিমা আমিরের ঘর করার জন্যে চেষ্টা করার মনস্থ করল। আমাকে আপনাদের এ বাড়িতে স্থান দিন। বান্দী দাসীর মতো থাকব। আমিরও সুপারিশ করে। অ-ফাতেমা, তোমরা যা বলবে তসলিমা তাই করবে। মা-তুমিও রাজি হও। ওকে আব মুন্নাকে শুধু পেট ভরে খেতে দিও, তাতেই হবে। ফায়ফরমাশ খাটবে। বেচারি যাবে কোথায়? তসলিমা অবাক হয়ে ভাবে—এ কোন্ আমির? এ-মানুষটিই কি তার স্বামী? মানুষ কত বদলে যেতে পারে! এ জগতে মানুষ চিনা সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ। কান্না আর কান্না! ফাতেমা ও মেরুনবিবি চোখে চোখে কথা কয়। ইশারায়। শেষে বলে, ঠিক আছে...। আমাদের কথা মতো চললে, থাকুক। বনটুলার মাগি!

সেদিন রাতে মাটিতে বিছানা পেতে তসলিমা ও মুন্না শুয়েছিল। আমির ফাতেমার ঘরে। দীর্ঘদিন পরে আজ ফাতেমা ফুর্তিতে মেতে উঠছে। তসলিমা সারারাত ঘুমোয়নি। গভীর রাতে

ফাতেমার ঘর থেকে শব্দ ভেসে আসছে। পার্টিশনের ও পাশে ইয়ে করার শব্দ। আমির যেন বলছে, মাসখানেক সবুর কর ফাতেমা। অনেক কষ্টে তসলিমাকে ফুসলিয়ে এদেশে এনেছি। তোমরা সবাই ওকে একুট ভালবাস। মানে অভিনয়। মাত্র তো কিছু দিন, তারপরই মায়ানমারের পার্টি আসলে-বিক্রি করে দেব। অনেক—অনেক টাকা পাব। তোমাকে গয়না গড়ে দেব।

—গয়না তোমাকে দিতেই হবে। এতদিন পরে এসে দুষ্টামি শুরু করেছ। তবে তসলিমাকে ভালবাসতে পারবে না। সতীন আমার দু'চোখের বিষ। যত তাড়াতাড়ি পার ওকে বিদেয় কর। নইলে তোমার নামে পুলিশে নালিশ করব। আমার গুন্ডা ভাইকে খবর দেব। তোমার কীর্তি শুনলে —পিটের চামড়া তুলে ঢুল্লুক বানাবে।

মুন্না ঘুমোচ্ছে। তসলিমা ঘুমের ভান করেছিল। সব কথাই কান পেতে শুনে ভয়ে আঁতকে ওঠে! শিহরিত হয়! কীভাবে নিজেকে এবং মুন্নাকে বাঁচানো যায়। নাকি আত্মহত্যা করবে? কিন্তু মুন্না? ভেবে কূলকিনারা পায় না।

পরদিন থেকেই তসলিমার ওপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালু হল। সতীন ফাতেমা, শাশুড়ি মেরুনবিবি এবং ফাতেমার ছেলেমেয়েরা তসলিমার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতে লাগল। শারীরিক অত্যাচারই তসলিমার নিকট ঘূর্ণিঝড়। মারধরের হাত থেকে কীভাবে সে বাঁচবে? মুন্নারও গালমুখে জায়গায় জায়গায় লাল কালচে ছোপ ছোপ দাগ। ছেলেটা কয়েক দিনেই শুকিয়ে কাঠ। তাকানো যায় না। তসলিমার সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন। গালে নখের আঁচর। আমিরও কয়েকবার চড় থাপ্পড় মেরেছে। একদিন আমির তাকে কত ভালবাসত! বিছানায় শুইয়ে কত আদর করত। ভালবাসা কি অভিনয়? আর আজ! গাল বেয়ে অশ্রু গড়ায়। বুকের দুঃখ বুকেই ঢেউ খেলে। আমির যদি তসলিমা ও শিশুপুত্রকে বিদেশে পাচার করে দেয়? আমির এখানে এসে পরিবর্তন হয়ে গেছে। মুন্নাকে একবারও আদর করেনি! অথচ কত অসংখ্যবার তাকে ভোগ করেছে। মনের মতো। দাবিয়ে ঝড় তুলেছে দুটি উষ্ণ শরীরে। তসলিমার নরম বুকের ওপর উপুর হয়ে পড়ে, আঁকড়ে ধরে কত কথাই না বলেছে। ভেতরের মরুঝড়কে মুক্তি দিয়েছে, মাতাল হয়ে। সে সব দিন অতীত হয়ে গেছে। স্মৃতি। কিন্তু তসলিমার এসব কথা এখন ভাবলে চলবে না। ঘূর্ণিঝড়ে জীবন উথালপাথাল। তছনছ। যে করেই হোক সে এখান থেকে পালাতে চায়। কীভাবে? বুঝে উঠতে পারেনা। সে কোনদিন বাড়ির বাইরে যায়নি। আজ স্বামী পর। শত্রু। তসলিমাকে দেখিয়ে ফাতেমা চুমো খায়। আলিঙ্গন করে। দৃষ্টিকটু। বড় খারাপ লাগে তসলিমার। আমির এ সব ইচ্ছে করেই করে ...।

তসলিমা আসার পর থেকেই সংসারের সমস্ত কাজ তার ঘাড়ে। রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে সবই করতে হয়। মুন্নাকেও দেখাশুনার সময় পায় না। কিন্তু এভাবে কতদিন? সপ্তাহ খানেক পরে একদিন রাতে আমির মদ খেয়ে বাড়ি আসে। তসলিমাকে বিনা কারণে পেটাতে থাকে। মুন্না ঘুমিয়ে ছিল। জেগে ওঠে। মায়ের ওপর অত্যাচারের দৃশ্য দেখছিল। হঠাৎ বলে ওঠে, বাবা দয়া করো, মাকে আর মেরো না। আমির মুন্নাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বলে, দূর-হ, ছাগলনীর পুত। তুই আমার মুতের ছানা! বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা অত্যাচারের নায়ক, নায়িকা হয়েছিল। সে রাতে তসলিমাকে খাবার দেয়নি। পরামর্শ হচ্ছে—তসলিমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবে। তসলিমার

ঘুম নেই। রাত তখন একটা কি দেড়টা। আন্দাজ মাত্র। মুন্নাকে কোলে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়। অন্যরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কেউ বুঝতে পারেনি তসলিমা পালাচ্ছে। দ্রুতবেগে মরণপণ হাঁটতে থাকে। কখনো খুঁচিদৌড়। সব রাস্তাই অচেনা। একদিকে হাঁটলেই হলো। আল্লাহ্ যেখানেই পৌঁছায়। মরলে মরছে। তবু নরককুন্ড থেকে বের হতে হবে। কৃষ্ণপক্ষের অভিসার। পূর্ব আকাশে চাঁদ সবেমাত্র উঠতে শুরু করেছে। রাস্তা দেখতে কোন অসুবিধাই হয়নি। প্রাণ বাঁচানোর পলায়ন তো! ছোট পথ থেকে একটি বড় রাস্তা পেয়ে গেল। তসলিমা এখন সৈনিক। যুদ্ধ করতে চায়। মরণপণ যুদ্ধ। হয়তো সব নারীকেই কোন না কোন যুদ্ধ মাঠে যেতেই হয়। কিন্তু ও তো বাংলাদেশে চোরাই পথে এসেছে। আইনের চোখে অপরাধী। মুক্তি পেয়ে তসলিমা দারুণ বল পেল। এভাবে সে কতক্ষণ হেঁটে ছিল, দৌড়ে ছিল সে নিজেও জানে না। চারদিক একটু ফরসা হয়ে আসে। ভোর। এখন কোথায় যাবে? তার কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? আবার যদি আমিরের লোকেরা ধরে ফেলে? পাকা রাস্তা ধরে মুন্নাকে হাতে ধরে হাঁটতে থাকে। দূরে কয়েকটি বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। বাজারের মতো।

তসলিমা যখন মধুপুর থানায় পৌঁছল, তখন সকাল সাতটা। সামনে সাইনবোর্ড লেখা দেখে থানায় ঢুকে পড়ে। থানায় ডিউটিরত পুলিশ অফিসার সহিল চৌধুরী। সহিলবাবুর নিকট তার অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করল। ভারত থেকে কীভাবে বাংলাদেশে আসল, তাও বলল। সহিলবাবু বিশ্বাস না করে পারলেন না। কারণ গৃহবধূটি যে ভাবে তার নির্মম কাহিনি চোখের পানিতে অসহায়ভাবে বলছিল—তা বিশ্বাস না করে কারো উপায় নেই। সেন্ট-পারসেন্ট সত্য। কিন্তু তিনি এখন কী করবেন? বিনা পাসপোর্ট বিদেশী কোন নাগরিক ধরা পড়লে গ্রেপ্তার করতে হয়। সহিল দারোগা তসলিমার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে বললেন, এখন তুমি কী করতে চাও? তুমি কি তোমার স্বামীর ঘরে আবার ফিরে যাবে? না মায়ের কাছে, ভারতে? ভয়ে তসলিমা আঁতকে উঠে বলে, না না, স্যার, স্বামীর ঘরে নয়। মায়ের কাছে—ভারতে। ও নাকি, স্যার, আমাকে বিদেশে বেচে দেবে। রাত্রে হাঁকাডাঁকি করে বলতে শুনেছি। বিদেশ থেকে নারীপাচারকারী লোক আসবে।

—বল কী? তোমার স্বামীর নাম কী?

—আমির খান। বাড়ি দত্তখলা। ওরা বলতে শুনেছি।

—আই সি, ওটা একটা ক্রিমিনাল। পুলিশের অপরাধী খাতায় নাম আছে। ওর নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট আছে। বছর তিনেক ধরে খুঁজছি। পাইনি। বেশ কয়েকবার বাড়ি সার্চ করেছি। শেয়াল থেকেও ধূর্ত। ও-আন্তর্জাতিক নারী পাচারকারীর সঙ্গে যুক্ত। বাইক-গাড়ি বিভিন্ন কায়দা করে চুরি করে। দামি যন্ত্রপাতি গোপনে বিক্রি করে। আজই আমিরের বাড়িতে গ্রেপ্তারি অভিযান চালাতে হবে। কী করে যে খবর পেয়ে পালিয়ে যায়, বুঝি না। সহিলবাবু আইনের লোক হয়েও আইনের পথে হাঁটলেন না। এক্ষেত্রে মানবিকতার পথেই পা বাড়ালেন। তসলিমাকে ত্রিপুরায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন। সহিল চৌধুরীর বাবা-আজিজুল হক চৌধুরী ছিলেন একজন মুক্তি যোদ্ধা। কমান্ডেন্ট অব মুক্তি ফৌজ—ঢাকা রেজিমেন্ট। তিনি আগরতলায় ট্রেনিং নিয়েছিলেন। ত্রিপুরার মানুষকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। মুক্তি যোদ্ধার সন্তান সহিলবাবুর হৃদয়ের অন্তঃস্থল তসলিমার জন্য কেঁদে উঠল। তিনি থানাতে মা-ছেলেকে পেটভরে খাওয়ালেন। দেরি করলে আইনী বিপদ দেখা

দিতে পারে। জানাশোনা বি ডি আরের সাহায্যে তসলিমাকে তিনি ভারতের বি এস এফ ক্যাম্পে পৌঁছে দিলেন। তখন রাত দশটা।

সে রাতে বি.এস.এফ. ক্যাম্পে তসলিমা ধর্ষিতা হয়। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। কিশোর আম্বুলি বি.এস.এফ-এর সিনিয়র কমান্ডেন্ট। রাত কাটানোর জন্যে তসলিমাকে একটি ঘরে রাখা হল। পাহারায় দুজন বি.এস.এফ. জোয়ান। ওরা মদ খেয়ে বদ্ধ পাগল হয়। এই কী ওদের দেশপ্রেমের নমুনা? যদি আমাদের কথায় রাজি না থাকিস তবে তোর ছেলেকে গুলি করে মারব। নতুবা গলায় ফাঁস দিয়ে এক্ষুণি শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলব তোকেও। তুই তো বাংলাদেশী সেরাপী। কেউ জানতেই পারবে না। আঃ তোর মুখটা, বুকটা কি সুন্দর! খামচাইতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে। আমার ইয়েটা নাচতেছে! আয়, কাছে আয়। মধু খাই? হোজা, তসলিমা ছেলেকে আঁকড়ে ধরে। না, কাছে আসবে না, বার বার অনুরোধ করেছিল না ছোঁয়ার জন্যে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। হঠাৎ তসলিমার মুখটা কাপড়ে বেঁধে ফেলে। মাতাল জোয়ানটি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিবস্ত্র করতে থাকে। অন্য জোয়ানটি মুন্নার হাত মুখে ধরে রাখে। ও সারলে— সে যাবে। এক সময় মুন্না, বাঁচাও, মাকে বাঁচাও, বাঁচাও চিৎকার করে উঠল। পাশেই ছিল কমান্ডডেন্ট আম্বুলি সাহেরের কোয়ার্টার। শিশুর চিৎকার শুনে তিনি চমকে উঠে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। জঘন্য কান্ড দেখেন। জোয়ানটির ঘাড় ধরে তসলিমার গা থেকে ছাড়িয়ে ..., মাটিতে আছাড় দেন। লাথি মারতে মারতে আধমরা করেন। অন্যটি তৎক্ষণাৎ ভেগে যায়। তারই ক্যাম্পের জোয়ান! ছি! লজ্জায়, রাগে কিশোরবাবুর মাথা গরম হয়ে যায়। পাগল জোয়ানের পায়ে গুলি করে চির বিকলাঙ্গ বানালেন।

সেদিন তসলিমা ও তার সন্তানকে নিজের কোয়ার্টারে এনে রাখলেন। দুঃখজনক ঘটনার জন্য কী বলবেন? ধর্ষণের কী ক্ষতিপূরণ হয়? কলঙ্ক কি মুছে যায়? আমি ভাবতেও পারিনি, ওরা এমন ঘৃণ্য কাজ করতে পারে। অত্যন্ত খেদের সঙ্গে আম্বুলি সাহেব এ কথাগুলো বললেন। ওদের আমি চরম শাস্তিই দেব। যাতে কোনদিন এ-রকম জঘন্য অপরাধ আর কেউ করতে না পারে। তুমি আমার মেয়ের মতো। আমার মেয়েটি বেঁচে থাকলে হয়তো তোমারই মতো হতো। নাতি-নাতনিও থাকত। কপালে সইল না। মা কুন্তলা চলে গেল। বাবাকে একা ফেলে। প্রৌঢ় সাহেবের চোখে জল। কিশোর সাহেব এ সব কথা বাংলা ও হিন্দির মিশ্রণে বলছিলেন। ওনার আর এক বছর চাকরি বাকি আছে। অবসর নিয়ে উত্তরপ্রদেশে নিজের বাড়িতে চলে যাবেন। স্ত্রীও নেই। হয়তো কোন বৃদ্ধ আশ্রমেও চলে যেতে পারেন। তসলিমা কিশোর সাহেবের বুকে তার হারানো পিতার মমতাভরা প্রতিকৃতি দেখতে পেল। পিতা কেমন মানুষ হয়, তা কিছুটা বুঝতে পারল। অজান্তেই তসলিমা বলে ওঠে, না বাবা, আমি তো আপনার মেয়েই। না হলে আমাকে বাঁচালেন কেন?

—কি; তুমি আমাকে বাবা বললে? আরো একবার বলো, মা। বুক শান্ত করি। তসলিমা আবেগে উচ্চারণ করে—বাবা—বাবা ...। যেন রক্তের ভালবাসা।

কিশোর সাহেবের কোয়ার্টারে দুদিন থাকার পর তসলিমাকে ওর মায়ের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। প্রথমে ওর ঠিকানা জানলেন। সমস্ত খোঁজ খবর নিলেন। তারপর ওর মাকে সোনামুড়া থানাতে যোগাযোগ করতে বললেন। তিনি নিজে গিয়ে তসলিমাকে থানার ও.সি.এর হাতে তুলে দেন। সমস্ত ঘটনা বলেন, কীভাবে শিশু ও নারী পাচারকারীর হাত হতে অল্পের জন্য

রক্ষা পেল। ও.সি. সাহেব শুনে থ। রুজিনা মৌলবি চাচাকে সঙ্গে নিয়ে সোনামুড়া থানায় আসে। তসলিমাকে দেখে ওরা প্রথমে চিনতেই পারেনি। এ কোন তসলিমা! নিজের মেয়েকেই চিনতে পারেনি। মাসের মধ্যেই তার চেহারার এ কি অবস্থা!! আমির কোথায়? তসলিমা কিছুই বলতে পারছিল না। শুধু কোটরে বসা চোখে পানি! রুজিনাও কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ও.সি. সাহেব বললেন, আপনার মেয়ে ও নাতি যে প্রাণে বেঁচে আছে—এটাই তো ঢের। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আসলে নারীপাচারকারী লোকটির নাম আমির নয়। দাউদ খাঁ। আরো কয়েকটি নাম ও থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক চক্র। ভারত-বাংলা যৌথ পরিকল্পনা চলছে। শীঘ্রই ওরা জালে পা দেবে।

ডাঃ বিভাস পালচৌধুরী

কৃতজ্ঞতা

সঞ্জয় আজ মরিয়া প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ডাক্তারবাবুর সাথে দেখা না করে বাড়ি ফিরবেনা। আজ নিয়ে চার দিন, সে এসেছে ডাক্তারবাবুর সাথে দেখা করতে। রোগীর ভিড়ে আর দেখা করা সম্ভব হয়নি।

আজ সে চেম্বারে ঢোকার একটি টোকেন সংগ্রহ করেছে। সর্বশেষ টোকেনটাই বেছে নিয়েছে। সে তো রোগী নয়—তাই অন্য রোগীর অসুবিধে করতে চায় না।

রাত তখন দশটা। সর্বশেষ রোগী হিসেবেই ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকল সঞ্জয়। মাটিতে পড়ে ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করে বলল, স্যার, আমি রোগী নই, আমি আপনাকে একটি প্রণাম করতে এসেছি, আর আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

আপনার হয়তো মনে নেই আমার বাবার পেটে একটি গুলি লেগেছিল। খুব খারাপ অবস্থায় আপনার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলাম। আপনি তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা এবং অপারেশন করে আমার বাবাকে সুস্থ করেছিলেন। আমার বাবা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমরা ভাবতেও পারিনি—বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। এবং আগের মতো আবার সব কাজ কর্ম করতে পারবেন। বাবা যদি এই দূর্ঘটনায় মারা যেতেন, তাহলে তো আমরা রাস্তায় বসে যেতাম।

আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। বয়স ১৪ বছর হবে। চার ভাই বোনের মধ্যে আমিই বড়। সংসারের দায়িত্ব আমার ওপরই এসে পড়তো। আমার তো কোন যোগ্যতা ছিলনা সংসারের দায়িত্ব নেবার। তখন হয়তো কোন মুদির দোকানের কর্মচারী, না হয় চা-স্টলের কর্মী হিসেবে কাজ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না।

আমি এখন এম. কম. পাশ করেছি। একটি ভাল চাকরিও করছি। ভাইবোনদের পড়াশোনা করিয়ে মানুষ করেছি। ছোট বোনকে বিয়েও দিয়ে দিয়েছি।

বাবা যদি না থাকতেন, তাহলে তো আমাদের আর আজকের অবস্থায় আসার সুযোগই হতো না!

তাই তো আপনি আমাদের পরিবারের ভগবান। আজ আমি আমার ভগবানকে প্রণাম করতে এসেছি। আর কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

সঞ্জয়ের কথা শুনে ডাক্তারবাবু কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। মনের গভীরে পড়ে থাকা স্মৃতিগুলি যেন একের পর এক ভেসে উঠতে লাগলো।

সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে বললেন, বেঁচে থাক, সঞ্জয়। তোমরা সুখে থাক। অন্যদের আদর্শ হও।

কুসংস্কার

সুমন এতক্ষণে শান্তি পেয়েছে। আশ্বস্ত হয়েছে, ডাক্তারবাবু তার স্ত্রীকে দেখতে যাবেন তার বাড়িতে। এক ঘন্টা পরই যাবেন বলেছেন ডাক্তারবাবু। তাই দ্রুত চলল সুমন বাড়ির দিকে।

হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে পড়লেন সুমনের বাড়ির উদ্দেশে। বাড়িটা মোটামুটি পরিচিত। আর সুমন তো বাড়ির সামনেই অপেক্ষা করবে, তাই বাড়ি চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

সুমনের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামালেন ডাক্তারবাবু। কৈ, সুমনকে তো দেখা যাচ্ছে না? তবে কি বাড়ি চিনতে ভুল হলো?

গাড়ির হর্ণ বাজালেন। একটু অপেক্ষাও করলেন; কাউকে পাওয়া যায় কিনা! কারো সাড়া শব্দ না পেয়ে, বাড়ির ভেতরে গিয়ে সুমনকে ডাকলেন।

ডাক শুনে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন, বললেন, সুমন তো বাড়ি নেই, বেরিয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, সুমন তো তার কাছই গিয়েছিল, তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে। ফেরেনি এখনো?

মহিলা বললেন, না আসেনি।

সঙ্কটে পড়লেন ডাক্তারবাবু! কী করবেন? জিগ্যেস করলেন—তার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা এবং তাকে দেখার কথা।

মহিলা বললেন, তার স্ত্রী তো এখানে নেই? সে তার বাপের বাড়ি চলে গেছে।

অদ্ভুত সমস্যায় পড়লেন ডাক্তারবাবু, ফিরে যাওয়া ছাড়া তো গত্যন্তর নেই!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় ডাক্তারবাবু শুনতে পেলেন, মহিলা বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময় নিজে নিজে বলছিলেন, পই পই করে মানা করেছি সুমনকে ডাক্তারের কাছে না যাওয়ার জন্যে! তার স্ত্রীর অসুখ তো ডাক্তারি চিকিৎসায় সারবে না? তার স্ত্রীর তো উপরি-বাতাস লেগেছে! তার থেকেই তো রক্ত যাচ্ছে শরীর থেকে!

এই রোগ কি এলোপ্যাথি চিকিৎসায় সারে? এই রোগের জন্যে তো উপরি চিকিৎসা করাতে হবে। তবেই তো সারবে এই রোগ। এর জন্যে ভালো মোল্লা, ফকির বা তান্ত্রিকের কাছ থেকে কবচ-তাবিজ বা জলপড়া আনা দরকার।

ডাক্তারবাবুকে বাড়িতে ডেকে এনেছে? এখন সামলাক? আমি তো বলে দিয়েছি রোগী বাড়িতে নেই!

গাড়িতে বসে সামনের দিকে তাকাতেই ডাক্তারবাবু দেখেন সুমন দৌড়ে আসছে বাড়ির দিকে। ডাক্তারবাবু ফিরে যাচ্ছেন দেখে কাতর অনুরোধ করে সুমন, বলে, ডাক্তারবাবু , রাগ করবেন না, আমায় ক্ষমা করুন। ফেরার সময় একজনের বাড়ি গিয়েছিলাম, কিছু টাকা জোগাড় করতে, তাই একটু দেরি হয়ে গেলো। দয়া করে চলুন ভেতরে, আমার স্ত্রীকে দেখতে ।

ডাক্তারবাবু কিছুই বললেন না। অনুসরণ করলেন সুমনকে। সুমনের স্ত্রীর শয্যার পাশের চেয়ারটাতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন তার স্ত্রীকে। পরীক্ষা শেষে সুমনকে বললেন,

তোমার স্ত্রীর অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক, অত্যধিক রক্তপাত হয়েছে শরীর থেকে। ওকে রক্ত দিতে হবে। রীতিমত চিকিৎসা না করলে ওকে বাঁচানো যাবে না। এক্ষুণি হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি। তুমি রোগীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে এসো। এই বলে, ডাক্তারবাবু গাড়ির দিকে রওনা হলেন।

গাড়িতে বসে চিন্তা করলেন ডাক্তারবাবু, কেন এই মহিলা এমন করলেন? কেন রোগী না দেখিয়েই তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন?

এটা তো কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার—স্বাস্থ্য সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাব। চিকিৎসা না করিয়েই মিথ্যা কথা বলে ডাক্তারকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া।

হায়, কবে যে সমাজ এই কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাবে!

মোহিনী

খট্ খট্ করে পায়ে হাইহিল জুতো পরে, ষাটোর্ধ এক মহিলা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকলেন।

প্রথম প্রশ্ন, দেখেন তো বাবা, আমাকে চিনতে পারেন কিনা? ডাক্তারবাবু অপলক দৃষ্টিতে মহিলার দিকে চেয়ে আছেন, কোন মতেই মনে করতে পারছেন না, এই মহিলা কে?

মহিলাই সমস্যার সমাধান করলেন। এতদিন পর দেখছেন, আপনার তো মনে থাকার কথা নয়। কত রোগীই তো আসে আপনার কাছে। কত জনকে মনে রাখবেন।

বলতে থাকলেন মহিলা, আমি মোহিনী, আপনার রোগী।

ডান পায়ের উরুর হাড় ভেঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। আপনার চিকিৎসায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি।

আমার আত্মীয়স্বজন সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, আমার ভাঙ্গা পা আর জোড়া লাগবে না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই আমার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

আমিও ভাবতে পারিনি, আমি একদম সুস্থ হয়ে চলাফেরা করতে পারবো সুস্থ মানুষের মত।

যখনই খবর পেয়েছি আপনি এখানে এসেছেন, আপনাকে দেখার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কোনদিনই ভাবিনি আপনার সাথে আবার দেখা হবে। এখান থেকে একবার যারা যান, তারা তো আর ফিরে আসেন না!

আপনার স্মৃতি তো আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছে। রোজই তো আপনার কথা স্মরণ করি।

আমার ঠাকুরঘরে আপনার জন্যেও একটা জায়গা করেছি। ঠাকুর দণ্ডবৎ করে আপনাকেও একটা দণ্ডবৎ করি। আজ আমি আমার সাক্ষাৎ ঠাকুরের দেখা পেয়েছি।

ডাক্তারবাবু মোহিনীর দিকে মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে রইলেন।

মোমাই ও তাতুর গল্প

মোমাই আজ বায়না ধরেছে, তাতুর সাথে ও আজ ঘুমোবে আর গল্প শুনবে। মোমাই দাদুকে আদর করে 'তাতু' বলেই ডাকে।

দুজন রাত্রে একসাথেই খেতে বসেছে। আজকে সে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমির গল্পই শুনবে। পুরো গল্প না শুনে সে ঘুমোবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছে।

কোন দিনই মোমাইর গল্প শোনা সম্পূর্ণ হয় না। দশ মিনিট বড় জোর পনের মিনিট গল্প শোনার পরই চোখ দুটো জড়িয়ে আসে ঘুমে। আস্তে আস্তে গলায় জড়িয়ে ধরা হাতগুলো একটু শিথিল হয়ে আসে। তাতু বুঝে ফেলেন, মোমাইর ঘুম পেয়ে গেছে। আর গল্প বলে লাভ নেই।

আজ খাওয়া দাওয়া তাড়াতাড়িই সেরে ফেলেছে মোমাই। তাতুর বালিশের পাশে নিজের বালিশটাকে সাজিয়ে রেখেছে। মাকে বলেছে, সে আজ তাতুর সাথেই ঘুমোবে আর গল্প শুনবে। তার জন্যে মা যেন চিন্তা না করে।

তাতুর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে মোমাইর আর তর সইছেনা। তাড়াতাড়ি এস তাতু ? রাত হয়ে যাচ্ছে! দেরি হলে তো গল্প বলা শেষ হবেনা? —বলে ডাকে মোমাই।

অগত্যা তাড়াতাড়িই শেষ করতে হলো খাওযার পর্ব! আজ আর দেরি করা চলবে না।

বিছানায় আগেই শুয়ে পড়েছে মোমাই। তাতুও তার পাশেই শুয়ে পড়লেন। মোমাইর আব্দার, আজও সে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমিব গল্প শুনবে।

গল্প বলতে শুরু করলেন তাতু — এক যে ছিল ব্যাঙ্গমা আর এক ব্যাঙ্গমি। তারা থাকতো এক উঁচু গাছের মগডালে। মগডাল কি তাতু?— প্রশ্ন করে মোমাই। তাতু বুঝিয়ে দেন মোমাইকে, মগডাল মানে কি? অনেক দিন ধরেই তারা এই গাছে বাসা বেঁধে থাকে। তাদের ঘরে মাঝে মাঝে যখন বাচ্চা আসে, তখন তাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়।

এখনও তাদের দুটো বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাগুলো বেশ বড় হয়েছে, তবে উড়তে পারেনা। তাদের খাবার যোগাড় করতে বাইরে যেতে হয়, তাই সকাল হতে না হতেই তারা বেরিয়ে পড়ে শিকারের খোঁজে।

দূরে অনেক দূরে, নীল সমুদ্রে উড়ে উড়ে চলে যায় দুজনে। নীল সমুদ্রে তারা লাল নীল রং-এর অনেক মাছ ধরে। গলার মধ্যে জমিয়ে বাখে তাদের বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে বলে।

মাছ ধরা শেষ হলে বাসার দিকে রওনা হয়। উড়ে উড়ে অনেক পথ অতিক্রম করে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি যখন বাসার কাছাকাছি চলে আসে, বাচ্চাগুলো যখন মা-বাবাকে দেখতে পায়, তখন তাদের কী আনন্দ! চিৎকার কবে মা-বাবাকে তাদের উচ্ছ্বাসের কথা জানায়।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি বাসায় বসে একটু জিরিয়ে নেয়। তারপরই একটি একটি করে মাছ গলার ভেতর থেকে বের করে দেয়। বাচ্চাগুলোর কী আনন্দ ! রঙিন মাছগুলোকে তারা পরম তৃপ্তিতে খেতে থাকে।

গল্প বলে যাচ্ছেন তাতু। হঠাৎ নজর পড়লো মোমাইর দিকে! অন্যদিনের মত আজও মোমাই

ঘুমিয়ে পড়েছে। গলায় জড়িয়ে ধরা ছোট ছোট হাতগুলো একটু আলতো হয়ে গেছে। মোমাই সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে।

গলায় জড়িয়ে ধরা হাতটাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে বালিশের ওপর রাখলেন তাতু ।শরীরটাকে সুবিধে মত রেখে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন তাকে।

তাতু ভাবতে থাকেন, আজও মোমাইর গল্প শোনা শেষ হলো না। এত উৎসাহ করে এসেছিল গল্প শুনতে; কিন্তু গল্প শেষ হওয়ার আগেই তার ঘুম পেয়ে গেলো। আজ. . এনিয়ে পাঁচ দিন সে এসেছে গল্প শুনতে — শেষ অবধি মোমাইর আর শোনা শেষ হলো না।

তাতুর মনে ভেসে ওঠে অতীত দিনগুলোর কথা। মোমাইর মার বয়স যখন মোমাইর মত ছিল, তখন সেও বাবাব কাছে এসে আব্দার করে বলতো, বাবা, একটা গল্প বলনা? বাবা বলতেন, কোন্ গল্প বলব? সেও ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমির গল্প শোনার জন্যেই বায়না ধরতো।

মেয়ে বাবার গলায় জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতো —আর বাবা গল্প বলতেন। দশ থেকে পনের মিনিট গল্প শোনার পর মেয়েও ঘুমিয়ে পড়তো বাবার গলায় জড়িয়ে ধরে।

অনেক দিনই এই গল্প বলতে শুরু করেছিলেন বাবা, কিন্তু কোনদিনই শেষ কবতে পারেননি।

আজ শুয়ে শুযে তাতু ভাবছেন, কী অদ্ভুত মিল! মাও ছেলে দুজনের পছন্দ একই গল্প। কেউই সম্পূর্ণ গল্প শুনতে পাবে না, তাব আগেই ঘুম এসে চোখ দুটো তাদের বন্ধ কবে দিযে যায়।

তবে কি, এই গল্প বলা আব কোনও দিন শেষ হবে না? নাকি গল্পটিতেই কোন নেশা আছে - যা শুনলে ঘুম এসে যায়?

কচিরাই

আজ কচিরাইব কথা খুব মনে পড়ছে। সহজ কবল মুখখানা, হাসি ছাড়া কথা বলেনা। চোখে মুখে এক সাথেই হাসে। এমন মনখোলা হাসি সহজে দেখা যায় না।

এমন সহজ সরল লোকটার বিপদেব দিনেব কথা আজও ভুলতে পাবিনা। কিছু করতে পারলাম না বলে আরও খাবাপ লাগছে।

কিছুদিন আগে তার ছেলেকে নিযে এসেছিল কচিবাই চিকিৎসাব জন্যে। রোগে ভুগে ভুগে সে একদম কাহিল হয়ে গেছে। দেখ তো বাবু পুলাটারে, —জ্বর হইছে, কিছু খায়না, শবীলটাও খুব দুর্বল। চোখটাও কিছু হলুদ হইছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় আমাকে বোঝাত চেষ্টা করল কচিরাই।

পরীক্ষা করে ধবা পড়লো তার Jaundice (কামেলা/ হলমি) হয়েছে। আরও পরীক্ষা নিরীক্ষায় ধরা পড়ল রোগটা একটু জটিল। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস তার রক্তের নমুনাতে পাওয়া গেছে। রক্তেব নমুনার রিপোর্ট দেখে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো! এতো মবার ওপর খাড়ার

যা!

এখানে তো তাকে চিকিৎসা করা যাবে না। বাইরে কোন বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ভাল চিকিৎসার জন্যে। কথাটা গোপন বাখা তো ঠিক হবে না? তাই কচিরাইকে খোলাখুলি সব বললাম।

কচিরাই আমার কথা শুনে অবাক! আকাশ থেকে যেন পড়ল! বাবু, তুমি এইটা কিতা কয়? আমি তোমার কাছে চিকিৎসার লাগি আনলাম, আর তুমি কয় তার চিকিৎসা করত পারতনা? আমি কত আশা করি আইছে চিকিৎসার লাগি। তুমি— কর বাবু, তার চিকিৎসা তুমিই কর। তোমার ওপরে তো আমার খুব বিশ্বাস।

আমাব বাড়ির আমার পাড়ার যত রোগী আনছে চিকিৎসার লাগি তোমার কাছে— সব তো ভালা হইছে। তে তুমি তারে চিকিৎসা করত পারত না কয় কেরে? নাকি তুমি রাগ করছে আমার ওপরে? আমি তো কুস্তা জানে না! তুমি তারে চিকিৎসা কর বাবু — নইলে তো তারে বাঁচাইতো পারতো না!

বাবু, আমি তো ভুলছে না, তুমি যখন কৈলাশহরে বড় হাসপাতালে আছিল, তখন তো আমি বাবারে নিয়া তোমার কাছে গেছিল। তুমি তো বাবারে হাসপাতালে ভর্তি করি চিকিৎসা করছিল একমাস। আমার বাবা তো একদম ভাল হইয়া বাড়িতে আইছিল, আরও অনেক দিন বাঁচছে।

আমি তো ভুলছে না বাবু — তুমি ডি. এম গালাত সালটিকেট লিখি দিছে। আমি আটশ পঞ্চাশ টাকা সাহায্য পাইছে। হেই টাকায় তো বাবার সব চিকিৎসার খরচ হইছে। আমার তো আর একটা টাকাও লাগছে না।

তুমি একদিন আমারে কইছ, কচিরাই তুমি কই খাও? আমি কিছু কইছে না, চুপ করিয়া রইছে। আবার জিগাইছ, তুমি খাওয়া দাওয়া করনা ঠিকমত? তোমার মুখটা এত শুকনা কেন? আমি চুপ করিয়া রইছে।

তুমি তখন সিস্টাররে কিতা ইংলিসে কইছ। তারপর রান্না ঘরের বড় ডাক্তরনি (cook) গালাত চিঠি লিখি দিছ। তারপর থাকি আমি দুইবেলা ভাত, সকালে দুধ চিঁড়া কলা ডিম চা; বিকালও দুধ চা — প্রত্যেক দিন পাইছে। আর আমার খাওয়ার কোন কষ্ট হইছে না।

আমি তো ইতা ভুলতো পারছে না, বাবু! কোনোদিন— ভুলতো পারতো না!

তুমি আমাব পুলাটারে চিকিৎসা কর বাবু — হে ভালা হইব। তোমার ওপরে খু-ব বিশ্বাস। তোমারে তো আমি খুব ভাল পায়। ভগবানের মত দেখে।

কোন ভাবেই কচিরাইকে বোঝাতে পারিনা, তার ছেলে হেপাটাইটিস- বি রোগে আক্রান্ত এবং এর পরিণাম খুব খারাপ।

তাকে বোঝালাম, তুমি আগরতলা যাও, কচিরাই। বড় হসপাতাল আছে। এখন মেডিকেল কলেজ হয়েছে। তোমার ছেলের ভালো পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার, ভালো চিকিৎসার দরকার। সরকারি সাহায্য পাবে। আমিও সাহায্য করব।

কচিরাইকে কোন ভাবেই বোঝানো গেলো না। সে আগরতলা যাবে না। কোনোদিন সে আগরতলা যায়নি। কাউকে চেনেও না। ভাল করে কথাও বলতে পারেনা। তার কথা কে শুনবে, আর কে বুঝবে? আর এত টাকা সে কোথায় পাবে?

আমি চিকিৎসা করছি না দেখে তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। সবশেষে অনুরোধ করে, — কিছু ওষুধ লিখি দেও বাবু— বাড়িতে নিয়া যাই। বুঝছে আর বাঁচতো না! বাড়িতে নিয়া পাহাড়ি চিকিৎসা করমু আর ওষুধ খাওয়াইমু। তারপর যা হওয়ার হইব। আর কিতা করমু বাবু, আমরা তো গরিব মানুষ, লেখাপড়াও জানেনা, বলতে বলতে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো কচিরাইর। দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার চিবুক বেয়ে!

কচরাইর কথা শুনে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেলো! তার ছেলের অবস্থা , তার পরিণামের কথা চিন্তা করে, আর কিছু করতে পারলাম না বলে বড্ড অসহায় লাগছিল! সমস্ত রাতই তার কথা মনে পড়েছে! ঘুমোতে পারিনি একদম!

সবশেষে স্থির করেছি কচিরাইর ছেলের জন্য কিছু করা দরকাব। এভাবে বিনা চিকিৎসায় তাকে রেখে দেয়া ঠিক হবেনা। তাকে যে কোন ভাবে চিকিৎসার জন্যে আগরতলা পাঠাতে হবে।

সকাল হতে না হতেই লোক পাঠালাম কচিরাইর বাড়িতে, তাকে আনার জন্যে। বহু কষ্টে কচিরাইর বাড়ি খুঁজে বের করা গেল। আসতে চায়না সে। আমি আসতে বলেছি শুনে দ্বিধায় পড়ে গেল। অনেক বুঝিয়ে তাকে আনা হলো আমার কাছে।

কচিরাইকে আবার বুঝালাম, ছেলেকে নিয়ে আগরতলা তাকে যেতেই হবে। রাজি হয়না কচিরাই।

বহুকষ্টে কচিরাইকে রাজি করালাম। তার জন্য একটা এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিলাম। সঙ্গে একজন লোকও দিলাম যাতে কচিরাইর কোন অসুবিধে না হয়। সরকারি সাহায্যেরও কিছু ব্যবস্থা হলো। হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, এটা রাখ, কাজে লাগবে। কৃতজ্ঞতায় তাব চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে।

কচিরাইর সাথে যাওয়া ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন। আমার সাথে দেখা করলেন পবদিন। দুদিন ছিলেন আগরতলায়। কচিরাইর ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাকে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসে থাকারও ব্যবস্থা করে এসেছেন।

পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা চলছে। ভদ্রলোক আরও বললেন, কচিরাইর ছেলের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। বাঁচবে কিনা বলা মুশকিল।

দশদিন পর কচিরাই আমার চেম্বারে এসেছে। মনটা তার খুব খারাপ। দুপায়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল কচিরাই। বলতে থাকে, পুলাটা আর নাই বাবু! ইখান থাকি যাওয়ার সাতদিন পরেই মরছে! অনেক চেষ্টা করছে ডাক্তারবাবুরা — বাঁচাইত পারছেনা! আমার ভাগ্য খারাপ। তুমি তো অনেক সাহায্য করছ বাবু। তোমার ঋণ তো শোধ করত পরতনা জীবনে।

আগরতলা দেখছে বাবু। নতুন জাগা, বড় হাসপাতাল, সব দেখছে। কিন্তু আমার পুলা বাঁচছে না। তুমি তো জানছিল, হে বাঁচতো না— তে তুমি তাবে কেনে পাঠাইলো আগরতলাত। তুমি যেতা কইছ সব করছে, তবুও বাঁচলো না! তুমি যেদিন কইছে— তুমি চিকিৎসা করতনা, হেই দিনই আমি বুঝছে — হে বাঁচতনায়। কিতা করমু বাবু — আমার ভাগ্য!

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। কচিরাইর ছেলেকে বাঁচানো গেলো না। তার চিকিৎসার তো কোন ত্রুটি হয়নি। সব রকম চেষ্টাই তো করা হয়েছে। তবুও বাঁচানো গেল না। রোগটা যে মারাত্মক!

চুনী দাশ

পিতৃস্নেহ

বিধানবাবুর দুই ছেলে। একজন সরকারি ডাক্তার। অপরজন কলেজের অধ্যাপক। দুজনকেই বিয়েও করিয়েছেন। বড় বউমা সরকারি হাসপাতালের নার্স। ছোট বউমা স্কুলের বিষয়-শিক্ষিকা।

বিধানবাবুর স্ত্রী আড়াই বছর হল গত হয়েছেন। স্ত্রীর জীবদ্দশাতেই সংসারের সুখ-শান্তি রক্ষার জন্যে বিধানবাবু দুই ছেলেরই পৃথগন্নের ব্যবস্থা করে দেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রীও আলাদা খান। স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেন!

পূর্ব পাকিস্থান থেকে এসে বিধানবাবু মুদির-দোকান দিয়ে সৎভাবে সংসারটা টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এবং সফলও হন। বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেবার আগে বিধানবাবু সেই মুদির-দোকানের পাট চুকিয়ে দিয়ে যান।

বৃদ্ধাশ্রমে তিনি সুখেই আছেন। অন্যান্য বৃদ্ধদের সঙ্গে গল্পগুজব করে আনন্দে দিন কাটে, রাত পোহায়। বাড়ির মতন একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে কাটাতে হয় না। আর তাছাড়া, অন্য বৃদ্ধদের করুণ কাহিনি শুনে শুনে, তিনি নিজেকে সেই তুলনায় সৌভাগ্যবানই মনে করেন। আতুর যেমন অন্ধকে দেখে, অন্ধ যেমন আতুরের দুঃখময় জীবনের কথা অনুমান করে, অনুভব করে, পরস্পর নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে থাকে।

বিধানবাবুর বৃদ্ধাশ্রমে আসার ক'মাসের মধ্যেই বড় ছেলের প্রথম সন্তানের জন্ম হল। বিধানবাবু খবর পেয়ে নাতনিকে হাসপাতালেই একবার দেখে এলেন। বাড়িতে নিয়ে আসার পরও দেখে গেলেন। তারপর সূর্যদর্শন ব্রত এবং অন্নপ্রাশনে তো এলেনই।

কিছুদিন পর, ছোটছেলের প্রথম সন্তানের জন্ম হল। পুত্র সন্তান। ছোট ছেলে বৃদ্ধাশ্রমে এসে বাবাকে এই শুভ-সংবাদটি দিয়ে গেলেন। শুনে বাবা কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। নার্সিংহোমে দেখতেও গেলেন না! বাড়িতেও দেখতে এলেন না।

সূর্যদর্শনের দিন ছোটছেলে নিজেই নিজের গাড়ি চালিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে বাবাকে আনতে গেলেন। অসুস্থতার অজুহাতে বাবা এলেন না।

ক'মাস পর, ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন ছোটছেলে বাবাকে আনতে বৃদ্ধাশ্রমে গেলেন। বাবা এলেন। নাতিকে দেখলেন। কোলে নিলেন। আদর করলেন। আশীর্বাদ করলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে পাশের রুমে একটু বিশ্রাম করতে গেলেন, যে রুম একদিন ওঁর নিজেরই শয়নকক্ষ ছিল।

বিধানবাবুর বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার সময় হলে, ছোটছেলে পাশের রুমে বাবার কাছে এলেন। ছেলেকে দেখতেই বিধানবাবুর মন হুহু করে কেঁদে উঠলঃ

হায়, আমাদের অতি আদরের, অতি স্নেহের — এই ছোটছেলেকেও তো আমারই মতন একদিন—এই সাধের বাড়িঘর, সংসার, ছেলে-ছেলেবউ, নাতি-নাতনি সব ছেড়ে, শুধু কদিন বেঁচে থাকার জন্যেই কোনো বৃদ্ধাশ্রমে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে হবে! — এসব কথা মনে হতেই বিধানবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়েই ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন!

যে বাবাকে জীবনে কোনদিন কাঁদতে দেখেননি, তাঁকেই এইভাবে কাঁদতে দেখে ছোটছেলের

মনও বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল, দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল! আস্তে আস্তে ছোটছেলে বাবাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, আজ এই আনন্দের দিনে, তুমি কাঁদছ কেন?

মনের আসল কথা মনেই চেপে রেখে, চোখ মুছতে মুছতে বিধানবাবু কান্নাভেজা গলায় বললেন, আজ যদি তোদের মা বেঁচে থাকতেন, কী খুশিই না হতেন!

পশুর মনুষ্যত্ব

মরণী একটি ছোট্ট মেয়ের নাম। এই ছ'সাত বছর বয়েস হবে। ওর মাও নেই, বাবাও নেই। আছে শুধু বুড়ি ঠাম্মা। ঠাম্মা রোজ সকালে বাসিভাত —নুন আর মরিচপোড়া দিয়ে খায়। ওকেও খেতে দেয়। মরণী মরিচপোড়া খেতে পারে না। ঝাঁজ লাগে, ঝাল লাগে।

খেয়েদেয়ে ঠাম্মা ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যায়। ফিরতে ফিরতে ঠাম্মার দুপুব গড়িয়ে পড়ে। ততক্ষণে মরণীর খিদে পেয়ে যায়। ঠাম্মা ফিরে এসে কযমুঠো চাল ফোটায। শাকপাতা-টাকপাতা যা হোক একটা কিছু রান্না করে। তাই দিয়ে দুজনে মিলে খায়। মরণীরা ডাল খেতে পায় না! ডালের নাকি আকাশ ছোঁয়া দাম!

মরণীদের বাড়ির কাছেই একটা মস্ত বড় বাগান আছে। যেখান থেকে মরণীর ঠাম্মা গাছের মরা ডালডুল, গাছের শুকনো পাতাটাতা রান্নার জ্বালানির জন্যে কুড়িয়ে আনে। মবণীও ঠাম্মাব সাথে সাথে কুড়োয়। আবার একা একাও কুড়িয়ে নেয়।

সেই বাগানে নানা রকমের ফলের গাছও আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু আর নানান জাতের কলাগাছ। একটা পেয়ারাগাছও আছে। সেই পেয়ারা গাছে প্রচুর পেয়ারা ফলে। পেয়ারার মরশুমে কাক, পাখি, বাদুড়ের খাওয়া, আধা-খাওয়া, ঠোকরান, অনেক পেয়ারা গাছের নিচে পড়ে থাকে। মরণী ভালো ভালো পেয়ারা দেখে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায়। মরণী গাছে উঠতে পারেনা। ভয় পায়। তাছাড়া এই পেয়ারাগাছটার কাণ্ড বড্ড সোজা ও উঁচু।

পেয়ারার মরশুমে, প্রতিদিন একটা হনুমানও আসে। ঠিক একই সময়। দুপুরে। ঘরের ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে মরণী হনুমানের আসার সময়ক্ষণ ঠিক বুঝতে পারে। হনুমান আসার বেশ কিছুক্ষণ আগেই মরণী বাগানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। হনুমান এলে মরণীর বেশ মজা। হনুমান ওকে একটা দুটো পাকা পেয়ারা গাছের নিচে ফেলে দেয়! কোঁচড় পাতলে কোঁচড়েও দু'একটা ছুঁড়ে দেয়। মরণী তা মনের আনন্দে খায়। খিদেও ভুলে যায়।

এখন আর সেই গাছে পাকা পোয়ারা নেই। কাঁচাও নেই। পেয়ারাগাছ শূন্য। আবার নতুন পাতা আসবে, ফুল ফুটবে, পেয়ারা ধরবে, পেয়ারা পাকবে। কাক, পাখি, বাদুড় আসবে। হনুমানও আসবে। তখন মরণীও পেয়ারা খেতে পাবে। এখন আর মরণীর খাবার মতন বাগানের কোথাও কোন ফল নেই!

তবে হ্যাঁ, একটা সবরি-কলাগাছে সেদিন একটা কাঁদির প্রথম ফণাতে বেশ কয়টা হলুদ রঙের

কলা মরণীর চোখে পড়েছে। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কী? মরণী তো আর সে-কাঁদির ফণা থেকে কলা পেড়ে খেতে পারবে না?

এই ভাবতে ভাবতে মরণী আনমনে বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। বাগানের মালিক বড় একটা বাগানে আসে না।

অমন সময়, মরণীর চোখে পড়ল, সেই কলাগাছে হনুমান সবরিকলা খাচ্ছে আর ওর দিকে বার বার তাকাচ্ছে। তখন মরণী সেই কলাগাছের নিচে গিয়ে কোঁচড় পেতে দাঁড়িয়ে রইল। আর সত্যি সত্যি হনুমান ওর কোঁচড়ে একটা পাকা কলা ছুঁড়ে দিল! —ক-ত্তো বড় সবরিকলা! কী স্বাদ! আর কী মিষ্টি! খেতে খেতে মরণীর খিদেটাই চলে গেল।

রাত পোহালেই কাঁদির ওপরের ফণার কলা পেকে পেকে হলুদ সোনার রঙ ধরে, আর রোজই হনুমান তা পেড়ে পেড়ে খায়। মরণীও হনুমানের আসার আগেই এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আর হনুমান এলেই গাছের নিচে কোঁচড় পেতে দাঁড়ায়। হনুমান কাঁদি থেকে ছিঁড়ে প্রথম কলাটা প্রত্যেক দিন মরণীর কোঁচড়ে ছুঁড়ে দেয়। তারপর মরণীও কলা খায়, হনুমানও কলা খেতে শুরু করে। এবং যে কয়টা পাকা কলা সেদিন কাঁদিতে থাকে, সব কয়টা খেয়ে চলে যায়। মরণীও আর দাঁড়ায় না, চলে আসে।

এইভাবে পাকা কলা খেয়ে খেয়ে মরণীর বেশ আনন্দে দিন কাটছিল। কিন্তু পঞ্চম দিনের দিন, হনুমান এসে যেই না প্রথম কলাটা ছিঁড়ে মরণীর কোঁচড়ে ফেলতে যাবে, অমনি শাঁ-শাঁ মার-মার কাট-কাট করে দা-লাঠি হাতে নিয়ে— যেন ঝড়ের বেগে মালিক সেই কলাগাছের গোড়ায় ছুটে এল! ছেঁড়া কলাটা আর হনুমান মরণীর কোঁচড়ে ফেলার সময়ই পেল না! হাতের কলা হাতে নিয়েই ভয়ে হনুমান পালিয়ে গেল!

তারপর মালিক সেই কলাগাছটা কেটে পুরো কাঁদিটাই নিয়ে চলল। তাই দেখে, মরণী মালিকের কাছে গিয়ে দুহাত পেতে কাতর কণ্ঠে বলল, আমাকে একটা কলা দাও না, বড্ড খিদে পেয়েছে।

মালিক রক্তচক্ষু করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মরণীকে 'ভাগ্ ভাগ্' করে রাস্তার কুকুরের মতো তাড়া করল!

হায়, আর একটু পরে যদি মালিক আসত, তাহলেই হনুমান আমাকে কলাটা ছুঁড়ে দিতে পারত! —এই আপশোস করতে করতে— মালিকের তাড়া খেয়ে—পড়ি-কী-মরি করে ছুটতে ছুটতে মরণী— সেই ফলের বাগান পার হল বটে; কিন্তু আবার মরণী ধারাল-দাঁত-বের-করা ইটের বড় বড় চিপস্ ছড়ানো ভগ্ন রাস্তায় গিয়ে পড়ল, যে রাস্তায় নগ্নপায়ে চলা দুষ্কর!!

রোদ্দুরের প্রতীক্ষা

পৌষ মাসের শেষ। আগরতলায় হাড়কাঁপানো শীত। আমাদের বাঁশের বেড়ার ঘর। ছনের ছাউনি। ঘরের মেঝে মাটির। স্যাঁতসেঁতে।

বটতলার শ্মশানে বাবাকে দাহ করে বাড়ি ফিরে এলাম। তখন রাত নামতে শুরু করেছে। মা

মেঝের ওপর বেশ পুরু করে খড় বিছিয়ে, ওপরে একটা চাদর পেতে, বিছানা করে রেখেছেন। বাবার মৃত্যুশোক পালন করতে— এই খড়ের বিছানায়ই তিরিশ দিন কাটাতে হবে। শাস্ত্রের বিধান।

সেই বিছানায় শোকাচ্ছন্ন মা ও আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি। তখন গভীর রাত। মা সস্নেহে আমাকে বললেন, বাবা, তুই কি দশদিন ফলমূল খেয়ে থাকতে পারবি?

কেন, মা?

দশা পর্যন্ত মানে মৃত্যুর দশদিন পর্যন্ত পুত্রসন্তান যদি দানা গ্রহণ না করে শুধু ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, মৃতের আত্মার পরম শান্তি হয় এবং স্বর্গলাভ হয়।

কেন পারব না, মা? বাবার আত্মার যেখানে পরম শান্তি হবে এবং স্বর্গলাভ হবে, সেখানে আমাকে তো পারতেই হবে!

দশ দিন পর আমি তোকে নিজ হাতে হবিষ্যান্ন রেঁধে দেব। তরিতরকারি সহ একসঙ্গে আতপ চালের একসেদ্ধ ভাত। গাওয়া-ঘি দিয়ে মেখেও খেতে পারবি। তাছাড়া একজ্বালের দুধ খাওয়াতেও বাধা নেই। বাকি কুড়িদিন এই হবিষ্যান্ন খেয়ে থাকতে পারবি তো, বাবা?

নিশ্চয় পারব, তুমি কোনো চিন্তা করো না।

যদি পারিস্, উত্তম হবে, তোর বাবার আত্মা চিরশান্তি লাভ করবে, স্বর্গসুখে সুখী হবে।

মা-র এই ঐকান্তিক ইচ্ছে আমি পূরণ করলাম। নিষ্ঠার সঙ্গে দশদিন ফলমূল খেয়ে ও কুড়িদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে অতিবাহিত করালাম। মাও মৃত-স্বামীর আত্মার চিরশান্তি এবং স্বর্গলাভের কামনায় আমার সঙ্গে দশদিন ফলমূল, কুড়িদিন স্বপাকে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করলেন এবং খড়ের পাতা-বিছানায় দিনাতিপাত করলেন।

শ্রাদ্ধের পাঁচ ছ'দিন থাকতেই একদিন পুবোহিত মশাইরা আমাদের বাড়িতে এলেন। একজন অতি প্রৌঢ়। অস্থি সর্বস্ব দেহ। লম্বা যেন তালপাতার সেপাই। বয়স পঁচাত্তরের কাছাকাছি। শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত। নাম শ্রীযুক্ত জলধর ভট্টাচার্য। যিনি জলধর শাস্ত্রী নামেই সমধিক পরিচিত। অপরজন মাঝারি বয়সের, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্তী। পুরোহিত দুজন শ্রাদ্ধের ব্যাপারে সব খোঁজখবর নিলেন। শ্রাদ্ধের প্রয়োজনে কী কী জিনিষ, দান সামগ্রী ইত্যাদি লাগবে—ফর্দ লিখে আমার হাতে দিলেন এবং কীভাবে কী করতে হবে, তাও সবিস্তার বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তাঁরা সলাপরামর্শ করে স্থির করে আমাকে জানালেন যে, শ্রাদ্ধের দিন রাত থাকতেই প্রৌঢ় পুরোহিত মশাই আসবেন এবং কাক মাটিতে বসার আগেই আমাকে চানটান করিয়ে শ্রাদ্ধের প্রাথমিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে রাখবেন। পরে অন্যজন এসে মূল শ্রাদ্ধকর্মে যোগদান করবেন।

জলধর শাস্ত্রীর বাসস্থান বাধারঘাটে। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার। আর রমণী চক্রবর্তীর বাড়ি যোগেন্দ্রনগর। চার কিলোমিটারের মতন।

বয়স, দূরত্ব ও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে, আমি সুপন্ডিত শাস্ত্রীমশাইকে সবিনয়ে বললাম, এই বয়সে, এই শীতে, এতো রাতে, এতো দূর থেকে আপনি আসবেন কেমন করে? তখন তো বাস চলাচল শুরু হয় না, রিক্‌শাও পাওয়া দায়। আপনার স্থলে রমণীদা এলে হয় না?

না না, রমণী এসব ক্রিয়াকাণ্ড করে অভ্যস্ত নয়। যদি ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে যায়, অনর্থ হবে! নির্দোষ মৃতের আত্মা কষ্ট ভোগ করবে!

তাহলে শ্রাদ্ধের আগের দিন বরং আপনি আমাদের বাড়ি এসে থাকুন?

না না, শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে যজমান বাড়ি রাত কাটানোর বিধান নেই।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। আরও কিছু উপদেশ, নির্দেশ দিয়ে তাঁরা যথাসময়ে প্রস্থান করলেন।

তিরিশ দিনের দিন ভোরে নাপিত মশাই এলেন। আমার গলার ধড়া ছিন্ন করলেন। মুখমণ্ডল শ্মশ্রুহীন করলেন। হাতের নখ, পায়ের নখ কেটে দিলেন। আমি চান করে ক্রিয়াধারী-বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন ধুতি পরিধান করলাম।

শ্রাদ্ধের দিন।

রাতের অন্ধকার কাটতে না কাটতেই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জলধর শাস্ত্রী দুই কম্বল, একটা সূতির ও অন্যটা উলের, গায়ে চাপিয়ে আর সেই কম্বলদ্বয়ের নিচে প্রজ্বলিত হ্যারিকেন দুই হাতে পাকড়ে, পৌষের দারুণ শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমাদেব বাড়ি এসে পৌছুলেন! তাঁর হাঁকডাকে আমরা দুযার খুললাম। সবাই সজাগ হলাম। শীতে কম্পমান শাস্ত্রীমশাইকে ঘরে এনে একটা হাতাওয়ালা কাঠের চেয়ারে উপবেশন করতে দিলাম। পরে তাঁরই নির্দেশে চেয়ারের নিচে একটা গরম চাদর ভাঁজ করে পেতে দেওয়া হল।

শাস্ত্রীমশাই চেয়ারে বসে কম্পিত কলেবরে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, এক কাপ চা হবে?

আমার সহধর্মিনী চা করে এনে তার হাতে দিলেন।

তিনি প্রকম্পিত ঠোঁটে চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে আমাকে আদেশ করলেন, বাবু, এই বেলা স্নানকর্মটা সেরে ফেল। —তাঁর কম্পমান হাতে তখন পেয়ালাটা টুংটাং করে বাজছিল!

আমি সবিনয়ে বললাম, আপনাব সেদিনের নির্দেশ মত একটা আস্ত-কলাগাছ কেটে উঠোনে রাখা হয়েছে এবং ধুযে পরিশুদ্ধ করে একটা বটিদাও সঙ্গে রাখা আছে। আপনি কলার খোল কেটে ভোগ (নৈবেদ্য) সাজাবার পাত্র তৈরি করতে করতেই আমি চট করে পুকুরে ডুব দিয়ে চান সেরে চলে আসব। কাক মাটিতে বসার আগেই তো বাড়ানও (ভোগ) নিবেদন করতে হবে।

একটু পর যাচ্ছি। হাত দুটো অবশ হয়ে আছে। কলাগাছটাও নিশ্চয় এই ঠাণ্ডায় বরফ সম। চা-টা পান করে একটু গরম হয়ে নিই। হাত দুটোও হ্যারিকেনের ওপর রেখেছি। হাতে একটু রক্ত চলাচল শুরু হোক। কাক মাটিতে বসার ঢের দেরি আছে।

তাহলে, অনুগ্রহ করে অনুমতি করুন, আমিও একটু পরেই চান সারতে পুকুরে নামি।

একে পুকুর বলা ঠিক হবে না। ডোবা মতন ছোট্ট জলাশয। খেতের মধ্যে বাড়ি করার সময়, গর্ত কেটে সেই খেতের মাটি উঠিয়ে, ঘরের ভিটা গড়ার জন্যে খানিকটা জায়গা উঁচু করা হয়েছিল। সেই গর্তই এখন ডোবা বা পুকুর।

আগরতলা তখন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রী সেলসিযাসের কাছেপিঠে। চার ডিগ্রী সেলসিয়াসেই জল জমে বরফ হতে শুরু করে। স্বল্প গভীর এই ডোবা বা গর্তের জল তখন বরফ তুল্য। সেই জলে নেমে আমাকে চান করতে হবে বাবার আত্মার চিরশান্তি এবং স্বর্গলাভের অভিলাষে। শাস্ত্রের অমোঘ বিধান। পুরোহিতদের নির্মম আদেশ, নির্দেশ। অন্যথায় মৃত বাবার আত্মার অনাদিকাল নরক বাস!

মার দিকে করুণ-কাতর চোখে অসহায় ভাবে কাঁদো কাঁদো দৃষ্টিতে তাকালাম। মা আমার মনোকষ্ট অনুভব করতে পারলেন। বললেন, বাবারে, এটি তোর বাবার শেষকাজ। তাঁর আত্মার মুক্তির জন্য এইটুকুন কষ্ট যে তোকে স্বীকার করতেই হবে, পুত্রসন্তানের এ যে একান্ত কর্তব্য! নরক যন্ত্রণা থেকে তাঁর আত্মার পরিত্রাণের আর যে কোনো উপায় নেই!

মাগো, হিমশীতল এই ডোবার জল! জলে হাত ডোবালে সঙ্গে সঙ্গে হাত অবশ হয়ে যায়! জলে নামতেই যদি আমার শরীরের রক্ত চলাচলও থেমে যায়? জলে ডুব দিয়ে আমি যদি আর না ভাসতে পারি?

তাঁর অদৃশ্য অমর আত্মাই তোকে রক্ষা করবে। ভয় পাস নে বাবা। আমি তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, তোর কিছু হবে না; তুই কৃতকার্য হবি।

শাস্ত্রীমশাই পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। মা ও ছেলের কথোপকথন শুনছিলেন। আর শীতে থরোথরো কাঁপছিলেন। কলাগাছের খোল কেটে ভোগের পাত্র তৈরি করার মতন তখনও তাঁর হাতগুলো সচল হয়ে ওঠে নি, বশে আসে নি! যদিও দুই কম্বলের নিচে প্রজ্বলিত হ্যারিকেনের ওপর তখনও তাঁর দুটি হাত সযত্নে রক্ষিত ছিল।

এই অবস্থায়, আমি শাস্ত্রীমশাইয়ের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে করুণ সুরে বললাম, আচ্ছা শাস্ত্রীমশাই, অমনও তো দেশ আছে, স্থান আছে, যেখানে সব নদনদী, পুকুর, দিঘি শীতে জমে জমে বরফ হয়ে আছে! সেইখানে, দশদিন ফলমূল ভক্ষণ কবা, কুড়িদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করা, অত্যন্ত দুর্বল শরীরে, আমার মতন কোনো পুত্রসন্তানকে যদি মৃত পিতার আত্মার নবক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসে এবং স্বর্গ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় স্নানকর্ম সমাপন করতে হয়, তবে সে তা কেমন করে করবে?

আমার সকরুণ কাতর কণ্ঠস্বর তাঁর কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হল কি না বোঝা গেল না। তখনও তিনি শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন! কম্পিত কণ্ঠেই শাস্ত্রীমশাই খানিকটা অনুনয়ের সুরে বললেন, আর এক কাপ চা হবে? বড়ো ঠাণ্ডা লেগেছে! এই শীতে এতোটা পথ হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে তো? দেহের কাঁপুনিটা কোনমতেই আর থামতে চাইছে না!

আমি পুনরায় বিনীতভাবে কাতর কণ্ঠে বললাম, শাস্ত্রীমশাই, আমার কথা কি আপনি কিছু শুনতে পেলেন?

হ্যাঁ, বাবা; আমি সবই বিলক্ষণ শুনেছি।

তাহলে দয়া করে বলুন, যে দেশ বরফে আবৃত, সেই দেশের কোনো পুত্রসন্তান মৃত পিতার শ্রাদ্ধকর্ম সম্পাদন করার জন্যে কীভাবে স্নানকর্ম সম্পন্ন কববে?

এরমধ্যে চা এসে গেছে। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে শাস্ত্রীমশাই উচ্চারণ করলেন, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

শ্লোক শুনে আমি তাঁকে মিনতি করে বললাম, অনুগ্রহ করে সহজ করে বুঝিয়ে বলুন।

যে দেশে যে আচার। অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। অর্থাৎ কি না, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শাস্ত্রের বিধান প্রযোজ্য। আর ইহাও শাস্ত্রেরই অনুশাসন।

তাহলে, আমার বেলাও কি শাস্ত্রের সেই অনুশাসন কার্যকরী হতে পারে না?

নিশ্চয়ই পারে। তুমিও রৌদ্র উঠলই স্নানকর্ম সমাপন করবে। ইহাও শাস্ত্র সম্মতই।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জলধর শাস্ত্রীর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্য শুনে—এ ব্যবস্থায় মা-র স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি আছে কি না বোঝার জন্যে আমি মা-র দিকে অত্যন্ত ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকালাম। মা পুলকিত মনে বললেন, পুরোহিত মশাইয়ের মুখের কথাই আমাদের কাছে বেদবাক্য সমান।

ততক্ষণে আঁধার কেটে পুবাকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। কাক উড়ে উড়ে দুয়ারে দুয়ারে ভোরের খবর নিয়ে যাচ্ছে। পূর্বদিগন্ত আলো করে সূর্য উঠি-উঠি।

কম্বল গায়ে জড়িয়ে আমি আহ্লাদিত মনে রোদ্দুরের প্রতীক্ষায় বসে রইলাম।

আঁধারের হাতছানি

১৯৯৬ সাল।

আমি তখন রামপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রধানশিক্ষক। দুর্গাপুজোর ছুটির মাত্র তিনদিন আগে বকুলবাগান হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বদলি হলাম। যিনি এই স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনি অন্য একটি স্কুলেরও দায়িত্বে আছেন। এটি ওঁর অতিরিক্ত দায়িত্বভার। তাঁর এই অতিরিক্ত দায়িত্বভার কাগজে-কলমে গ্রহণ করতে করতে একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগল। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ছুটির মাত্র কদিন আগে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার এস সি স্টাইপেন্ড উঠাতে (ড্র করতে) গেলেন কেন? এই দীর্ঘ ছুটির মধ্যে এত টাকা তো স্কুলের সিন্দুকে রাখাও উচিত হবে না, নিয়মও নেই। অন্যদিকে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তা বিতরণ করা যাবে না।

পুজোর ছুটি তখন তিরিশ দিনের মতন থাকত

উত্তরে তিনি বললেন, স্টাইপেন্ড-কমিটির সদস্যরা এবং অফিস-স্টাফ আমাকে বললেন, এই স্কুলে এই দস্তুর। ছুটির মধ্যেও স্টাইপেন্ড বিলি করা হয়ে থাকে। তাই, ছুটির মধ্যে স্টাইপেন্ড নেওয়ার জন্য ক্লাশে ক্লাশে নোটিশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই কাজে ছুটির মধ্যেও যাঁরা সহায়তা করতে রাজি আছেন, তাঁদের থাকার (ডিটেন্‌শান) অনুমতির জন্যে মাননীয় ডেপুটি ডিরেক্টারের কাছে আবেদনও করা হয়েছে।

একটু থেমে আবার তিনি বলতে লাগলেন, আমি মাত্র চার মাস যাবৎ এই স্কুলের দায়িত্বে আছি। এ আমার অতিরিক্ত দায়িত্বভার। সপ্তাহে একদিনও এই স্কুলে আসা সম্ভব হয়ে উঠেনি। নিজের স্কুল নিয়েই হিমশিম খাচ্ছি। নাজেহাল হচ্ছি সেই স্কুলে কোন সহকারী প্রধানশিক্ষকও নেই। অবশ্য, এই স্কুলে একজন সিনিয়র শিক্ষকমশাইকে টিচার-ইন চার্জ করা হয়েছে। স্কুলের পড়াশোনার ব্যাপারটা উনিই দেখেন, পরিচালনা করেন। স্টাফের বেতন, ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড ইত্যাদি যাবতীয় অর্থ সংক্রান্ত বিলটিল, ক্যাশিয়ারবাবুই আমার সেই স্কুলে নিয়ে গিয়ে—সই-সাবুদ করিয়ে আনেন। পূর্বতন প্রধানশিক্ষক মশাইও নাকি এভাবেই স্টাইপেন্ড ড্র করতেন এবং স্কুলের সিন্দুকে টাকা ফেলে না রেখে ছুটি হবার মধ্যেই তা বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করতেন।

আজ আপনার হাতে এই স্কুলের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করতে পেরে হালকা বোধ করছি।

অতিরিক্ত দায়িত্বভারের দুশ্চিন্তা থেকেও নিষ্কৃতি পেলাম।

তারপর তিনি চলে গেলেন।

তিনি চলে যেতেই ক্যাশিয়ারবাবুকে ডেকে বললাম, এখনই স্টাইপেণ্ডের সমস্ত টাকা স্কুলের অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসুন। ক্যাশিয়ারবাবু চলে গেলে টিচার-ইন-চার্জ পরেশবাবুকে আসতে বললাম।

পরেশবাবু এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্কুল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যে এখানে কী কী কমিটি আছে?

পরেশবাবু জানালেন :

(১) ক্রীড়া-কমিটি : স্কুলের খেলাধুলোর ব্যাপারটা দেখেন।

(২) পরীক্ষা কমিটি : স্কুলের এবং ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখেন। এই স্কুল মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা-কেন্দ্রও।

(৩) বোর্ড কমিটি : কেবলমাত্র এ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত সব ব্যাপার দেখেন। যেমন, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণে সাহায্য করা, ফি সংগ্রহ করে সময়মত মধ্যশিক্ষা পর্ষদে জমা দেওয়া এবং পর্ষদের সঙ্গে সমস্ত প্রকার যোগাযোগে প্রধানশিক্ষক মশাইকে সাহায্য করা ইত্যাদি। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে ছাত্রবৃত্তির জন্য ছাত্রছাত্রী মনোনয়নের দায়িত্বও তাঁরাই বহন করেন।

(৪) সংস্কৃতি কমিটি : স্কুলের কালচারেল দিকটা দেখেন। স্কুলের সরস্বতী পুজোও তাঁরাই পরিচালনা করেন।

(৫) রুটিন-কমিটি : স্কুলের ক্লাশ-রুটিন, সাব-রুটিনের দায়িত্বে আছেন।

(৬) স্টাইপেণ্ড কমিটি : ছাত্রছাত্রীদের সবরকম স্টাইপেণ্ড, স্কলারশিপ ইত্যাদি দেখেন এবং তদারকি করেন।

(৭) এ্যাডমিশান কমিটি : স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো দেখেন।

এই সাত প্রকার কমিটি স্কুলে আছে। প্রত্যেক কমিটির একজন করে আহ্বায়ক আছেন এবং পদাধিকার বলে, সব কমিটির সভাপতি স্কুলের প্রধানশিক্ষক মশাই।

স্টাইপেণ্ড-কমিটিতে কে কে আছেন?

উত্তরে—পরেশবাবু দুজন শিক্ষকের নাম বললেন।

এই স্কুলে তো সহকারী প্রধানশিক্ষক নেই, তাই আপনি যেমন আছেন, তেমনই থাকুন। টিচার-ইনচার্জ হিসেবে থেকেই সহকারী প্রধান শিক্ষকের ভূমিকায় আমাকে স্কুল পরিচালনায় সাহায্য করুন।

তিনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

তিনি চলে যেতে অফিসের বড়বাবু বিনয় ভট্টাচার্যকে ডাকলাম। বিনয়বাবু আসতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা, বিনয়বাবু, স্কুলে মোট অফিস স্টাফের সংখ্যা কত?

মোট চারজন, স্যার। আমি হেডক্লার্ক, দুজন ইউ.ডি ক্লার্ক, একজন এল. ডি ক্লার্ক। এই এল ডি ক্লার্কই ক্যাশিয়ার।

কতজন চতুর্থ-শ্রেণির কর্মচারী অর্থাৎ দপ্তরি?

চারজন। দুজন পুরুষ, দুজন মহিলা। পুরুষ দুজনের মধ্যে একজন সাক্লোটাইপ-মেশিন চালকের ট্রেনিংপ্রাপ্ত।

স্কুলে কি সাক্লোটাইপ-মেশিন আছে? সচল কি?

আছে, স্যার। সচলই।

অফিসের কার ওপর স্টাইপেণ্ড সেক্‌শান দেখার দায়িত্ব?

দিবাকর চক্রবর্তীর ওপর। দিবাকরবাবু খুবই অভিজ্ঞ, স্যার। একনাগাড়ে বারো বছর বিদ্যালয় শিক্ষা-অধিকারে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে স্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপ সেকশান্ সামলেছেন।

ভালো, বেশ। তাহলে স্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল। তা পুজোর ছুটিতে কাকে কাকে স্টাইপেণ্ড ইত্যাদি স্কুলের কাজে ডিটেন্‌শানে রাখার জন্যে ডেপুটি ডিরেক্টারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে?

স্টাইপেণ্ড কমিটির দুজন শিক্ষক, অফিস-স্টাফ সবাই এবং ক্লাশফোর দুজন। একজন পুরুষ, একজন মহিলা।

ভ্যাকেশানে যারা কাজ করেন, তারা তো আর্নলিভ পান, তাই না?

হ্যাঁ, স্যার। ষোলদিন বা তার বেশি হলে পঞ্চাশ শতাংশ আর্নলিভ পাবার নিয়ম আছে। আর, ষোলদিনের কম হলেও আনুপাতিক হারে আর্নলিভ পান। সেজন্য একটা আলাদা নিয়মও আছে।

সেই আর্নলিভ ভোগ না করে, কেউ জমালে, অবসর গ্রহণের সময় তিনি সর্বাধিক দুইশ আশি দিনের পুরো বেতনও তো পাবার অধিকারী হন, তাই তো?

হ্যাঁ, স্যার।

এসব কথাবার্তার পর, বড়বাবুকে বললাম, আপনি একটা চিঠি এবং একটা নোটিশ লিখে টাইপ করে আনুন। চিঠিটা ডেপুটি ডিরেক্টারকে লিখবেন। লিখতে হবে, হেড ক্লার্ক, ক্যাশিয়ার এবং একজন দপ্তরি (পুরুষ) শুধু এই ছুটিতে স্কুলে দরকার। অধিক দরকার নেই। আগের চিঠির তারিখ, নম্বর এবং বিষয় উল্লেখ করবেন। আব নোটিশে লিখবেন, ছুটির মধ্যে কোন স্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে না। ক্লাশে ক্লাশে এখনই তা পাঠিয়েও দিতে হবে। নোটিশ বোর্ডেও একটা কপি রাখতে হবে। একেবারেই সাধারণ চিঠি, সাধারণ নোটিশ—

তাড়াতাড়ি টাইপ করে আনুন, আমি সই করে দিচ্ছি। আর স্টাইপেণ্ড সেক্‌শানের দিবাকরবাবুকে একটু পাঠিয়ে দিন।

দিবাকরবাবু এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন কোন ক্লাশের স্টাইপেণ্ড ড্র কবা হয়েছে? কী স্টাইপেণ্ড?

দিবাকরবাবু জানালেন, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এস-সি-দের স্টাইপেণ্ড ড্র করা হয়েছে।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এস্-সি-দের কী কী স্টাইপেণ্ড আছে?

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েবা চারটে স্টাইপেন্ট পায়। উপস্থিতি (অ্যাটেনডেন্স) স্টাইপেণ্ড, পোষাক (ড্রেস) স্কলারশিপ, পুস্তক (বুকগ্রান্ট) স্কলারশিপ, এবং প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। আর ছেলেরা পায় মাত্র দুটি স্কলারশিপ। বুকগ্রান্ট ও প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ই একটি মাত্র স্টাইপেণ্ড পায়। তা হল, প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ।

কেন, ওরা বইয়ের জন্যে কোন সাহায্য পায় না?

স্কুলের বুকব্যাঙ্ক থেকে ওদের সমস্ত পাঠ্যবই নেবার সুযোগ আছে, যা পাঠান্তরে স্কুলে ফিরিয়ে দেবার নিয়ম। কিন্তু আমাদের স্কুলে লাইব্রেরি নেই বলে, ওরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত, স্যার।

দিবাকরবাবুকে অষ্টম শ্রেণির স্টাইপেণ্ডের সমস্ত আবেদনপত্র এবং স্টাইপেণ্ডের জন্যে মনোনীত ছাত্রছাত্রীদের তালিকাটি নিয়ে আসতে বলায় তিনি একটা ফাইল বা বাণ্ডিল আমার টেবিলে এনে রাখলেন। মনোনীত ছাত্রছাত্রীর একটি তালিকাও আমার হাতে দিলেন।

তালিকাটিতে একটু চোখ বুলিয়ে একটি ছাত্রীর নাম করে ওর চার প্রকার স্টাইপেণ্ডের চারটে আবেদনপত্র চাইলাম।

চারটে আবেদনপত্র তো হবে না, স্যার? যেসব ছাত্রীরা বছরের প্রত্যেকদিন ক্লাশে উপস্থিত থাকতে পারে, কেবল মাত্র সেইসব ছাত্রীরাই অ্যাটেনডেন্স স্টাইপেণ্ডের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

এই স্কুলে কি এবার কোন ছাত্রী অ্যাটেনডেন্স স্টাইপেণ্ড পেয়েছে?

না, স্যার। একজনও পায় নি।

তাহলে মেয়েটির তিনটে আবেদনপত্রই দিন?

তাও হবে না, একটা আবেদনপত্রেই এখানে তিনটে স্টাইপেণ্ডের মনোনয়ন দেওয়া হয়ে থাকে, স্যার।

কেন প্রত্যেকটা স্টাইপেণ্ডের জন্য তো আলাদা আলাদা দরখাস্ত করার নিয়ম।

কারণ, ছাত্রছাত্রীদের এতে অনর্থক হয়রানি হয়, খরচও বেশি লাগে, স্যার।

কী ভাবে?

কারণ, প্রত্যেকটা আবেদনপত্র বা দরখাস্ত ওদের কিনতে লাগে। তাছাড়া, নাগরিকত্ব,কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল,আনার জন্যও চার জোড়া ফরম কিনতে হয়। তদুপরি, বার বার এম.এল.এ. গেজেটেড অফিসারকে প্রত্যয়িত নকলের জন্য বিরক্ত করতে হয়। এতে ওদের কষ্টও হয়, সময়ও লাগে, খরচও বাড়ে। তাই এখানে একটা আবেদনপত্রেই একাধিক স্টাইপেণ্ডের মনোনয়ন দেওয়ার রেওয়াজ, স্যার।

ছাত্রছাত্রীরা এই ফরমগুলো কোথা থেকে কেনে?

মূল আবেদনপত্রটি স্কুল থেকেই দেওয়া হয় এক টাকার বিনিময়ে। অন্যগুলো ওরা বাইরে থেকে কিনে আনে।

এক টাকা করে ফরমের জন্যে যে টাকা রাখা হয়, সে টাকা কি স্কুল ফাণ্ডে জমা পড়ে?

না, স্যার। ক্লাশফোরেরা ফরমগুলো সাপ্লাই করে। তাই ওরাই তা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে যায়; চা-টা খায়।

এখন থেকে স্কুলের কন্টিনজেন্সি ফাণ্ড থেকে কাগজ কিনে আনাবেন। সবরকম ফরমই সাইক্লোটাইপ করাবেন। প্রত্যেকটি স্টাইপেণ্ডের জন্যে সেই স্টাইপেণ্ডের নামাঙ্কিত আলাদা আলাদা আবেদনপত্র ছাপাবেন। প্রত্যয়িত নকলের জন্যে নাগরিকত্ব এবং কাস্ট সারটিফিকেটের ফরমও ছাপাবেন। স্কুল খোলার পর প্রকৃত তপসিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ক্লাশে ক্লাশে পাঠাবেন। কোন পয়সা নিতে হবে না।

দিন, মেয়েটির একটি দরখাস্তই দিন।

দিবাকরবাবু আমার হাতে দরখাস্তটি দিলেন। আমি দেখতে শুরু করলাম। সোমা দাস। পিতার নাম শ্রী সোমনাথ দাস। অষ্টম শ্রেণি। প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপের জন্যে আবেদনপত্র।

আবেদনপত্রটি দেখতে দেখতেই দিবাকরবাবুকে বললাম, কিন্তু ড্রেস স্টাইপেণ্ড এবং বুকগ্রান্টের কথা তো আবেদনপত্রের কোথাও উল্লেখ নেই? মনোনয়নেব তালিকাতেও সেকথার কোন উল্লেখ চোখে পড়ছে না! তাছাড়া তিনটি স্টাইপেণ্ডের মোট কত টাকা, তাও কোথাও লেখা নেই!

স্যার, এখানে উল্লেখ নেই ঠিকই, কিন্তু স্টাইপেণ্ডের ড্রয়িং-বিলের মধ্যে মোট টাকার অঙ্কটি লেখা আছে।

তাই নাকি?

সেই আবেদনপত্রে মেয়েটির নাগরিকত্ব এবং কাস্ট সারটিফিকেটের কোন প্রত্যয়িত নকল ছিল না, বা তেমন কোন প্রমাণপত্রও ছিল না! তাই দিবাকর চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলাম, নাগরিকত্ব এবং তপসিলভুক্ত জাতিব কোন প্রমাণপত্র ছাড়াই ওকে কীভাবে স্টাইপেণ্ডের জন্যে মনোনীত করা হল?

স্যার, এই অঞ্চলের লোকেরা এতো গরীব যে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই নাগরিকত্ব এবং কাস্ট সারটিফিকেট নেই। এমন কি, ওদের বাপ-ঠাকুরদারও নেই। এগুলো পেতে হলে অফিস-কাছারিতে অনেক দিন ধরে ঘুরতে হয়। পঞ্চায়েত প্রধান, তপসিলি নেতা, এম.এল.এ. গেজেটেড অফিসারদের কাছে বাব বার যেতে হয়, এদেব বিরক্ত করতে হয়। তারপরও বহুক্ষেত্রেই ওরা এস ডি. ও-র কাছ থেকে নাগরিকত্ব এবং কাস্ট সাবটিফিকেট পাবার মতন প্রমাণপত্র জোগাড় করতে সমর্থ হয না! তারওপর এখানকার অধিকাংশ মানুষই বিশেষ করে তপসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা, দিনমজুব। ওরা দিন আনে দিন খায। একদিন কাজে যেতে না পারলেই উনানে ওদের হাঁড়ি চড়ে না! এ অবস্থায় অত্যন্ত গবীব এই ছেলেমেয়েগুলো স্টাইপেণ্ডেব এই ক'টা টাকা থেকেও বঞ্চিত হবে। যাদের দুবেলা দুমুঠো খাবার জোটেনা, বই কিনতে পারে না, স্কুল-পোষাক পরে স্কুলে যেতে পারে না, একদিন ওরাই তো স্যার; অভাবের তাড়নায ড্রপআউটেব দলে নাম লেখাতে বাধ্য হয়! ফলে, টাকাগুলো সরকারের কাছে ফেবৎ চলে যায! আব শেষপর্যন্ত এই অব্যয়িত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে গিয়ে জমে জমে পাহাড় গড়ে ওঠে। তাই, সেইসব বিচাব বিবেচনা কবে— এই পরিস্থিতিতে মানবতাব খাতিরে এখানে এই নিঃস্ব ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্টাইপেণ্ডের জন্য মনোনীত করা হয়, স্যাব।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মেয়েটি যে তপসিলভুক্ত জাতির মেয়ে, তা কেমন করে বুঝব?

এ-তো স্যার, অতি সোজা ব্যাপার! ওর 'দাস' পদবীটিই তো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ!

মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন কোন পদবী তপসিলিভুক্ত জাতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে আপনি মনে করেন?

—কেন স্যার, দাস, সরকার, ভৌমিক, রায়, মজুমদার, বিশ্বাস, মালাকার, নমঃ, নমঃশূদ্র— এইসব পদবী, স্যার।

মন্ত্রী খগেন দাসের নাম শুনেছেন?

হ্যাঁ, স্যার। তিনি বর্তমানে ত্রিপুরা সবকাবেব কেবিনেট মন্ত্রী।

তিনি কি এস্-সি?

না, স্যার। তিনি কায়স্থ।

ডাঃ মৃণাল কান্তি ভৌমিকের নাম শুনেছেন?

হ্যাঁ, স্যার। তিনি ত্রিপুরার প্রখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ।

তিনি কি এস-সি?

না স্যার। তিনি কায়স্থ।

প্রাক্তন অধ্যক্ষ কুলদাপ্রসাদ রায়, ডাঃ জে এল. রায়, ডাঃ বিকাশ রায়ের নাম শুনেছেন? তাঁরা কি এস্-সি?

তাঁদের প্রত্যেককেই জানি, স্যার। প্রাক্তন অধ্যক্ষ কুলদাপ্রসাদ রায় আমারও শিক্ষাগুরু, তিনি ব্রাহ্মণ। ডাঃ জে. এল. রায়, স্বনামধন্য চিকিৎসক, তিনিও ব্রাহ্মণ। ডাঃ বিকাশ রায়, ত্রিপুবার বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, তিনি কায়স্থ।

ত্রিপুরার জনপ্রিয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার, মন্ত্রী কেশবচন্দ্র মজুমদার কি তপসিল জাতির লোক?

—আজ্ঞে না, স্যার। ওঁরা দুজনই কায়স্থ।

—এম. পি অজয় বিশ্বাস, কোন্ জাতির লোক, জানেন কি?

জানি স্যার, কায়স্থ।

তবে যে বললেন, পদবীই তপসিলিভুক্ত জাতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ? আমি একটু হাসলাম।

স্যার, এভাবে তো কোনওদিনও ভাবি নি, এ চিন্তাও মাথায় ঢোকেনি! আজ বুঝতে পারছি, এতোদিন সবই ভুল করে এসেছি! এবং এই ভুলের মাশুল প্রকৃত তপসিলিদেরই কড়ায়গণ্ডায় গুনতে হয়েছে, হচ্ছে। এখন থেকে এমন ভুল আর জীবনে কখনও হবে না, স্যার! একবার নিজগুণে ক্ষমা করে দিন।

আচ্ছা, দিবাকরবাবু, হরিজন স্কলারশিপের নিয়মকানুন কী?

হরিজন ছাত্রছাত্রী তপসিলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মতই সব স্টাইপেণ্ড পাবে, অধিকন্তু পাঁচশ টাকা করে প্রত্যেকে হরিজন-স্কলারশিপও পাবে।

এই স্কুলে কতজন হরিজন স্কলারশিপ পাচ্ছে?

একজনও না, স্যার! এই স্কুলে একজনও হরিজন ছাত্র বা ছাত্রী নেই!

—অদ্ভুত কথা! নেই কেন? অথচ কাছেই তো হরিজন বস্তি, হরিজন কলোনি রয়েছে। সেখানে বহু হরিজন পরিবারের বাস।

পড়াশোনার দিকে ওদের কোন ঝোঁকই নেই, স্যার! বাবা-মাব সঙ্গে ছোটরাও লাঙি টানে, দেশীমদ গিলে! মুখে উগ্র হিন্দি গানের কলি আওড়ায়, রাতে শুয়োর, কুকুর, ছাগলের সঙ্গে একসঙ্গে গড়াগড়ি খায়, আর নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে ঘুমোয়!

এরমধ্যে বড়বাবু চিঠি এবং নোটিশ টাইপ করে নিয়ে এলেন। আমি তা সই করে দিলাম। তিনি চলে গেলেন।

পুজোর ছুটির পর।

আমি স্টাইপেণ্ড কমিটির শিক্ষক, প্রত্যেক শ্রেণিশিক্ষক, স্টাইপেণ্ড সেকশানের অফিস-কর্মী অর্থাৎ দিবাকর চক্রবর্তীকে ডেকে পাঠালাম। তারা এলে আমার ঘরে মিটিং শুরু হয়।

সবাইকে আমি বিনীতভাবে বুঝিয়ে বললাম এবং সবার কাছে আবেদন রাখলাম ঃ প্রত্যেক স্টাইপেণ্ডের নামাঙ্কিত ফরম বা আবেদনপত্র ছাপা হয়েছে। নাগরিকত্ব ও কাস্ট সারটিফিকেটের প্রত্যয়িত নকলের জন্যেও ফরম ছাপা হয়েছে। প্রকৃত তপসিলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককে সেইসব ফরম দেবেন। পয়সা নিতে হবে না। পদবী দেখে কাউকে যেন এস্-সি বা এস্-টি নির্ধারণ না করা হয়। প্রত্যেক আবেদনপত্রের সঙ্গে এস্-ডি.ও-র সই করা নাগরিকত্ব ও কাস্ট সারটিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল যেন থাকে।

যদি কোন ছাত্রছাত্রীর নিজের এই দুটি সারটিফিকেট বা প্রমাণপত্র নাও থাকে, তবে ওদের বাবার হলেও চলবে।

তাও যদি না থাকে, তবে ভাই, বোন, কাকা, জেঠার হলেও চলবে। সেক্ষেত্রে ভাই বা বোন এবং ওকে একই বাবার সন্তান হতে হবে। এবং কাকা বা জেঠা এবং ওদের বাবাকে একই বাবার সন্তান হতে হবে।

তাও যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম না হয়, তবে নিকটতম কোন আত্মীয় স্বজনের হলেও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে এমন কোন এস্-সি বা এস্-টির সাহায্য নিতে পারে, যিনি আমার পরিচিত। এতদ্ অঞ্চলের সকল নেতৃস্থানীয় এস্-সি এবং এস্-টিই আমার পরিচিত। অনেক এস্-সি আবার আমার নিকটতম আত্মীয়ও।

আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, প্রকৃত এস্-সি, এস্-টি একজন ছাত্রছাত্রীও যেন এই স্টাইপেণ্ড প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়।

যেহেতু গভর্ণমেন্ট হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদটিই গেজেটেড়্, স্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাস্ট সারটিফিকেট প্রদানেরও যোগ্য ব্যক্তি, আর স্টাইপেণ্ড অনুমোদনেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত, আমি যদি প্রকৃত তপসিলি বলে সন্তুষ্ট হতে পারি, তবে আমিই কাস্ট সারটিফিকেট দিয়ে দিতে পারব, অ্যাটেস্টেড়্ও করতে পারব এবং স্টাইপেণ্ডও অনুমোদন করব।

আর, যেহেতু, এইসব ছাত্র বা ছাত্রী এই স্কুলেই পাঠরত, প্রাথমিক ভাবে ওরা ভারতীয় নাগবিক বলে স্বীকৃত। কাজেই নাগরিকত্ব-সারটিফিকেট না হলেও চলবে। তবে কাস্ট সারটিফিকেট অবশ্যই লাগবে।

তারপর উপস্থিত সকলের নিকট থেকে সক্রিয় সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করে মিটিং সমাপ্তি ঘোষণা করলাম।

স্কুল খোলার পনের দিনের মধ্যেই ক্লাশে বিলি করা স্টাইপেণ্ডের সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়ে গেল। সেসব আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল, আগের দরখাস্তকারীদের মধ্যে পঁচাত্তর শতাংশই বাদ পড়েছে এবং নতুন প্রায় চল্লিশ শতাংশ যুক্ত হয়েছে! যার ফলে সকল তপসিলভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে স্টাইপেণ্ড দিয়েও একান্ন হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে; যা পরে সরকারি স্টাইপেণ্ড ফাণ্ডে জমা দিয়ে দেওয়া হয়।

দুই

হরিহর সেন এই স্কুলের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক। অফিসের, বোর্ডের, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের, সব কাজে তিনি সমান পারদর্শী। প্রয়োজনে তিনি এসব কাজে সবাইকে সাহায্য করে থাকেন। আমিও অফিসের নানা কাজে তাঁর সাহায্য নিই।

এরমধ্যে একদিন, যখন আমি রুমে একা একা বসেছিলাম, আমার কাছের একটা চেয়ারে এসে বসলেন। এবং তারপর আমাকে বলতে লাগলেন, স্যার, আমি এই স্কুলে বহুদিন ধরে আছি। এবারই এই প্রথম দেখলাম, ছুটির মধ্যে কোন স্টাইপেণ্ড দেওয়া হল না! হেডক্লার্ক, ক্যাশিয়ার ও একজন পুরুষ দপ্তরি ছাড়া ছুটির মধ্যে আর কাউকেই ডিটেন্‌শানেও রাখা হল না! তপসিলিদের স্টাইপেণ্ডের টাকাও উদ্বৃত্ত হল; আবার সে উদ্বৃত্ত টাকা সরকারি তহবিলেও জমা পড়ল! যা কোনদিন দেখিনি, কল্পনাও করতে পারিনি! ত্রিপুরা রাজ্যে তপসিলিদের স্টাইপেণ্ডের ড্র-করা টাকা কোন স্কুল থেকে ফের সরকারের ঘরে গিয়ে জমা পড়েছে, এই তাজ্জব ঘটনা কোথাও ঘটেছে বলে আমার তো জানা নেই!

আর সব থেকে আশ্চর্যের ও আনন্দের ঘটনা হল এই যে, একমাত্র এবারই এই স্কুলে ষষ্ঠশ্রেণি থেকে দশমশ্রেণির একজন এস্-সি এবং এস্-টি ছাত্রছাত্রীও স্টাইপেণ্ড থেকে বঞ্চিত হয়নি! যদিও দুনম্বরি তপসিলিরা বঞ্চিত হয়েছে অর্থাৎ মুখ বুজে পালাতে বাধ্য হয়েছে!

তাঁর কথাশুনে এতটুকু আত্মপ্রসাদ লাভ করা তো দূরের কথা, বরং আমি মর্মপীড়া আব মনোকষ্টে দগ্ধ হতে হতে ভোরের আকাশে আঁধারের হাতছানি চাক্ষুষ করে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, এই ভেবে যে, এই ত্রিপুরায় না জানি কত হাজার হাজার প্রকৃত এস্-সি, এস্-টি ছাত্রছাত্রী এইভাবে বছর বছর প্রতিটি স্কুলে প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছে! আর, নকল তপসিলিরা আখের গোছাচ্ছে, মজা লুটছে, এবং ভবিষ্যতে নানা সুযোগ সুবিধে ও চাকরি জোগাড়ের সোপান রচনা কবছে! কারণ স্কুলের এই তপসিলি হিসেবে স্টাইপেণ্ড প্রাপ্তির রেকর্ড দেখিয়েই নকল তপসিলিরা এস্. ডি. ও-র থেকে তপসিলভুক্ত হিসেবে মূল সারটিফিকেট বা প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে। যার দৌলতে উচ্চশিক্ষার সকল স্তরে (ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, ভেটেরিনারি ইত্যাদি সহ) তপসিলিদের সংরক্ষিত কোটায় ভাগ বসায়, সব রকম সুযোগ-সুবিধে লোটে এবং চাকরিও আত্মসাৎ করে!

মেঘ কাটা রোদ

এক

বকুলবাগান হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছি, আজ প্রায় দু'মাস অতিক্রান্ত হল।

অফিসের বড়বাবু অর্থাৎ বিনয় ভট্টাচার্য আমার রুমে আমার কাছে এসে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি কি কিছু বলবেন?

আমাকে আর 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না, স্যার। আমি আপনার ছাত্র। আমি অভয়নগর

হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে পড়তাম। আপনি আমাদের ফিজিক্যাল সাইন্স পড়াতেন।

সে তো প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। একদম মনে পড়ছে না, ভুলে গেছি! মনে মনে বললাম, ব্যাটা দুষ্টু, তাহলে আমার এই স্কুলে জয়েন করার দিন অর্থাৎ দুমাস আগেই তো পরিচয় দিতে পারতে? ছাত্রছাত্রীদের তো ভোলার কথা নয়, শিক্ষকমশাইরা অনেক ক্ষেত্রে ভুলে যান। কারণ ছোটরা বড় হয়, বড় হলে স্বাভাবিক ভাবেই চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়; ছেলেদের মুখে গোঁফদাড়ি গজায়। কিন্তু মুখে বললাম, শুনে খুশি হলাম। দাঁড়িয়ে রইলে কেন বিনয়, বস।

বিনয় বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিষণ্ণ-মলিন মুখে বলল, স্যার, এরমধ্যে আপনার কাছে ডিরেক্টরেট থেকে আমার সম্বন্ধে একটা কন্‌ফিডেনশিয়াল লেটার আসার কথা আছে।

গতকালই ওর সম্পর্কে একটা গোপনীয় চিঠি স্কুল শিক্ষা-অধিকর্তার কাছ থেকে আমি পেয়েছি। কিন্তু বিনয়কে চিঠির ব্যাপারে কিছুই বললাম না। গোপনীয়তা বজায় রাখলাম।

বললাম, কী ব্যাপার, বিনয়? আমাকে কি খুলে বলতে পারবে?

বিনয় বলতে শুরু করল।

স্যার, আজ থেকে তিন বছর আগে আমার একমাত্র ছেলে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন ওর পাঁচ বছর বয়স। ডাক্তার দেখালাম, হাসপাতালে ভর্তি করালাম। কিন্তু না, কিছুতেই নিরাময় হল না! আসল রোগ ধরাই পড়ল না! ডাক্তাররা বললেন, চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরার বাইরে নিয়ে যেতে। চাইলে হাসপাতাল থেকে বেফার করে দেওয়া হবে।

তখন আমার হাত কপর্দকশূন্য। মাথা ঠিক নেই। অর্থ সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সম্ভাব্য সবখানেই হাত পাতলাম। বাড়ি বন্ধক দিয়েও ঋণ নিতে চাইলাম। টাকার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করানোর মত প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করতে পারলাম না! শেষে মাথায় এক দুর্বুদ্ধি চাপল। সাপের মাথাব মণি ছিনিয়ে আনার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। জি.পি.এফ-এ (জেনারেল প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড) তখন আমার মাত্র দশ হাজার টাকা আছে। কিন্তু ছেলেকে বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করাতে গেলে, হাতে যা আছে, তা ছাড়াও, আরও কমপক্ষে অন্তত তিরিশ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। কুড়ি বছর সার্ভিস হয়ে গেছে বলে জি. পি. এফ-এ মোট জমানো টাকার পঁচাত্তর শতাংশ আমি তুলতে পারি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি, তাই, সেই মুহূর্তে টাকা সংগ্রহের আর কোন পথ দেখতে না পেয়ে, এ. জি-র (অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল) সে বছরের বার্ষিক স্টেটমেন্টের টাকার-ব্যালেন্স জাল করে ফেললাম। দশ হাজার টাকার ব্যালেন্সকে চল্লিশ হাজার টাকায় রূপান্তরিত করে, তখনকার প্রধানশিক্ষক মশাইয়ের চোখে ধুলো দিয়ে, তাঁকে দিয়েই সই করিয়ে তিরিশ হাজার টাকা উঠিয়ে নিলাম। প্রধানশিক্ষক মশাই আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগে আমি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম!

তারপর মাদ্রাজের অ্যাপলো চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলাম। এবং মৃত্যুব পথ-যাত্রী আমার ছেলেকে রোগমুক্ত করে বাড়ি ফিরে এলাম।

এখন ওর বয়স আট। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু সে বছরই স্কুলের অডিট ভেরিফিকেশন হল এবং এই কারচুপি ধরা পড়ে গেল। অচিরেই আমি দোষী প্রমাণিত হয়ে গেলাম। কদিনের মধ্যে

আপনার কাছে যে চিঠি আসার কথা, আপনার তরফ থেকে সে চিঠির রিপোর্ট ডিরেক্টারের হাতে পৌঁছবার পরই আমার আর চাকরি থাকবে না! চাকরি থেকে আমাকে বরখাস্ত করা হবে। এ চিঠি শুধু নিয়ম রক্ষার চিঠি!

আপনি আর কী করবেন, স্যার। আপনারও তো হাত-পা বাঁধা। স্কুলের রেকর্ডপত্র দেখেই তো আপনাকেও রিপোর্ট লিখতে হবে!

একটু থেমে বিনয় আবার বলতে লাগল, বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী আর এই ছেলেকে নিয়েই আমাদের ছোট্ট সংসার। চাকরি গেলে অসহায় হয়ে পড়ব, অনাথ হয়ে পড়ব ঠিকই, তবু তো মৃত্যুর হাত থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম! সেই আমার একমাত্র সান্ত্বনা এবং পরম পাওয়া! সুখের দিন, দুখের দিন, কারও বসে থাকে না। নদীও কেউ অপার থাকে না! অন্যের সাহায্যে হোক, সাঁতরে হোক, একভাবে না আরেকভাবে নদী সে পার হয়ই! দুঃখে কষ্টে সব দিনই চলে যায়। যারা চাকরি করেন না, তারা কি আর এটা সেটা করে জীবন কাটান না? আমিও ওঁদের নিয়ে কোনওরকম নিশ্চয় টিকে থাকব, বেঁচে থাকব, বিশ্বাস রাখি! শুধু রেকর্ড জাল করে টাকা তোলার জন্য অন্যের কাছে অর্থ আত্মসাৎ করার বদনামটা বাকি জীবন আমাকে পেছন পেছন তাড়া করবে, এই দুঃখ! কিন্তু ছেলের জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে সেই দুর্নাম আমি হাসিমুখে বরণ করে নেব!

এতটুকু বলে বিনয় থামল। তখন আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার তোলা অতিরিক্ত টাকাগুলো কি এর মধ্যে তুমি জমা দিতে পেরেছ?

হ্যাঁ, স্যার। তিরিশ হাজার টাকাই আমি জমা দিয়ে দিয়েছি।

আগামী রবিবারে আমি তোমাদের বাড়ি একটু যেতে চাই। আমাকে কি নিয়ে যেতে পারবে?

নিশ্চয় পারব, স্যার। আপনাকে দেখলে বাবা-মা খুব খুশি হবেন। আপনি যে, আগামী রোববারে আমাদেব বাড়ি আসছেন; তাঁদের আজই গিয়ে বলব। আপনি যে অভয়নগর হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং আমারও শিক্ষক, তাও বলব। স্কুলের অতি সন্নিকটেই আমাদের বাড়ি। এই স্কুলকে তো লালস্কুলও বলে। এতো অবশ্য আপনি জানেনই, স্যার।

লালস্কুলের কাছে বাড়ি হলে, আমাকে আর নিয়ে যেতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব। আমি দশটার মধ্যেই লালস্কুলের গেটে পৌঁছে যাব।

ঠিক আছে, স্যার। আমিও তখন সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকব।

পরের দিন।

রবিবার সকাল দশটার সময় লালস্কুলের গেটে পৌঁছুতেই দেখি, বিনয় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ওর সঙ্গে ওদের বাড়ি গেলাম। কাছেই। যেতে যেতে বিনয় বলল, স্যার, বাবা-মা, আপনার বৌমা, আমার স্কুলের এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। যখন চাকরি চলে যাবে, বেকার জীবন কাটাব, তখন, একদিন না একদিন তো ওঁরা জানতে পারবেনই! আগে থেকেই জানিয়ে দুঃখে ফেলতে চাই না! যতদিন ওঁরা এই মানসিক যন্ত্রণার ছোবল থেকে নিষ্কৃতি পান, ততটুকুই লাভ! অনুগ্রহ করে আপনিও যদি এ ব্যাপারে ওঁদের কিছু আঁচ করতে না দেন, ভালো হবে, স্যার।

মাটির দেওয়াল ঘেরা দু কোঠার একটি ঘর। টিনের চাল। সামনের বারান্দাটা বেশ বড়সড়।

বারান্দার অর্ধেকটায় ছোট্ট মতন একটা বসবার রুম। সেখানেই অতিথিদের বসার জায়গা। সাজানো গোছানো। বিনয় আমাকে নিয়ে সেখানেই বসাল। ওর বাবা মা এসে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ওর বাবা বসে আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তাও বললেন। বিনয়ের স্ত্রী আমাকে চা-টা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। ওর ছোট্ট ছেলেটি দোরের পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিতেই কাছে ডাকলাম। কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলাম , তোমার নাম কী?

বিপ্লব ভট্টাচার্য।

কোন শ্রেণিতে পড়?

তৃতীয় শ্রেণিতে।

আরও কিছুক্ষণ ওঁদের সান্নিধ্যে কাটিয়ে ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

সোমবার।

স্কুলে না গিয়ে সোজা স্কুল-শিক্ষাঅধিকারে চলে গেলাম। কনফিডেনশিয়াল সেকশানের যিনি ভারপ্রাপ্ত, তিনি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলেরই একজন প্রধানশিক্ষক। বর্তমানে ও-এস-ডি (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি) হিসেবে ডিরেক্টরেটে কর্মরত। আমার সবিশেষ পরিচিতও। বিনয়ের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম। সহানুভূতির সঙ্গে ওর কেস্‌টা বিবেচনা করা যায় কিনা, তার মতামত চাইলাম।

তিনি বললেন, মাননীয় অধিকর্তার সঙ্গে আলাপ করে দেখুন। উনিই তো আমাদের সকলের হেড-অব- দি ফ্যামিলি। একমাত্র উনিই এসব ব্যাপাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী।

তাই, অনুমতি নিয়ে, অধিকর্তার রুমে প্রবেশ করলাম। বকুলবাগান হায়ার সেকেন্ডাবি স্কুলের হেডক্লার্ক বিনয় ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ তুলতেই সেকশান ইনচার্জকে ফোনে বিনয় ভট্টাচার্যেব ফাইলটা নিয়ে আসতে বললেন। তিনি এসে ফাইলটা অধিকর্তার হাতে দিলেন।

মাননীয় অধিকর্তা ফাইলের কাগজপত্র উলটেপালটে দেখে আমাকে বললেন, বিনয় ভট্টাচার্য যে ধরনের জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী এবং যা তদন্তে প্রত্যেকবার প্রমাণিতও হয়েছে, ওকে নির্ঘাৎ চাকরি থেকে বরখাস্ত হতেই হবে। ওকে বাঁচানোর আর কোন রাস্তাই খোলা দেখছিনা! আইন তো ওর নিজের পথেই চলবে।

এর উত্তরে আমি অত্যান্ত বিনীতভাবে কাতব কণ্ঠে বললাম , স্যার, প্রকৃত অপবাধী , ধর্ষণকারী, এমন কি খুনি পর্যন্ত ধরা পড়েও, আনুবীক্ষণিক ফাঁক গলে আইনের মারপ্যাঁচে , অর্থের জোরে , বাজনৈতিক বলের দৌলতে, দিব্যি বেঁচে যায়। বেঁচে আছে। লেফাফার্দুরস্ত হয়ে সমাজের বুকে বুক ফুলিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে বিনয় ভট্টাচার্য একটি প্রাণ বাঁচাতে অনন্যোপায় হয়ে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, হোক না ওর ছেলে, তবু, সেটি একটি মানুষের প্রাণ বই তো নয়? তাছাড়া কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত বিনয় ভট্টাচার্য সেই তিরিশ হাজার টাকাও ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন।

আমি গতকাল ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর অতি বৃদ্ধ, বয়সেব ভারে ভারাক্রান্ত, ন্যুব্জ বাবা-মা, স্ত্রী ও ছোট্ট সেই ছেলেটিকে নিয়ে ওর ছোট্ট সংসার। ওর বাবা-মা, স্ত্রী ও ছোট্ট ছেলেটি তো সে-অপরাধে অপরাধী নয়, স্যার? ওর চাকরি গেলে, ওরা যে সবাই শাস্তি পাবেন? ওদের বাঁচার আর অন্য কোন উপায়ই তো দেখছিনা! ওর বাবা যজমেনে ব্রাহ্মণও ছিলেন না যে, বিনয়বাবু সেপথ অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে পারবেন, ওঁদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন! তখন এই

প্রাণগুলো অনাহার, অর্ধাহারের কবলে পড়ে শেষপর্যন্ত যদি মারা যায়, কে দায়ী হবে, স্যার? তখন এই প্রাণগুলোর খুনের জন্য কারা দায়ী হবে, স্যার? অপরাধীর তো সাজা হবে তাকে শুধরানোর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যে? তাকে নির্মমভাবে ধ্বংস করার জন্যে তো নিশ্চয়ই নয়, স্যার?

আমি যখন এসব কথা বলছিলাম, মাননীয় অধিকর্তা শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং মনোযোগ সহকারে আমার কথা তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, আপনার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো অকাট্য। আপনার এই মূল্যবান বক্তব্য শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম, সন্তুষ্ট হলাম। ওকে রক্ষা করতে হলে আপনি এই কথাগুলো লিখে, আমাকে রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিন; দেখি কিছু করা সম্ভব হয় কিনা!

তারপর একজন স্টেনোগ্রাফারকে ডাকলেন এবং ডিক্টেশান দিলেন। স্টেনোগ্রাফার সঙ্গে সঙ্গে তা টাইপ করে অধিকর্তার হাতে এনে দিলেন। অধিকর্তা তাতে চোখ বুলিয়ে আমাকে দিলেন।

পরের দিনই অধিকর্তার ডিক্টেশান দেওয়া টাইপ করা বয়ান অনুসারে, চিঠিটা আমি নিজহাতে লিখে, খামে ঢুকিয়ে সিল করে, চিঠির ওপরে "মোস্ট আরজেন্ট" "কনফিডেয়েনসিয়াল" লিখে, পিয়নবুকে এনট্রি করে, মাননীয় অধিকর্তার নামাঙ্কিত চিঠিটা একজন দপ্তরিকে দিয়ে স্কুল-শিক্ষা অধিকারে পাঠিয়ে দিলাম।

বকুলবাগান হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে আমি ১৯৯৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল অবসর গ্রহণ করলাম।

আমি থাকাকালীন বিনয় ভট্টাচার্যের এ ব্যাপারে আর কোন চিঠিপত্র আসেনি। শুনেছিলাম, হেডক্লার্ক হিসেবেই নাকি কমাস পর উদয়পুর ডেপুটি ডিরেক্টারের অফিসে বিনয় ভট্টাচার্য বদলি হয়ে গেছেন। এরপর বিনয়ের সাথে আর কোন যোগাযোগ নেই।

দুই

২০০৩ সাল।

আশ্বিন মাস। কদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি ঝরছিল। ছাতা নিয়ে কী একটা বিশেষ কাজে স্কুলশিক্ষা-অধিকারে যেতে হয়েছিল। কাজ সেরে অফিস থেকে বেরুচ্ছি। গেটে হঠাৎ বিনয়ের সঙ্গে দেখা! বিনয় হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল!

খানিকটা অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার, বিনয়? এখন কেমন আছো? বাবা-মা, বৌমা, তোমার ছেলে, ওরা সব কেমন?

আপনার আশীর্বাদে আমরা সবাই ভালো আছি, স্যার' আমি গতমাসে প্রমোশন পেয়েছি, ও.এস (অফিস সুপারইনটেনডেন্ট) হয়েছি। সবই স্যার, আপনার কৃপায়!

বিনয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে চলল, স্যার, আমি আপনার ছাত্র। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় কোনওদিন আপনাকে হাত তুলেও নমস্কার করে সম্মান জানাই নি! বকুলবাগান স্কুলে যখন চাকরি করতাম, চিনেও আমি আপনাকে ছাত্র বলে পরিচয় দেইনি! আপনার কাছ থেকে 'আপনি' সম্বোধনের

প্রলোভনে এবং নিজেকে বর্ণশ্রেষ্ঠ ভাবার অহংকারে। বিপদে পড়ে ছাত্রের পরিচয় দিয়েছিলাম। কিন্তু তবুও, তখনও আপনাকে হাত তুলে নমস্কার করে সম্মান জানানোর মানসিকতা অর্জন করতে পারিনি! জাত্যভিমানের শিকার হয়ে জন্মগর্বে বর্ণশ্রেষ্ঠর খাঁচায় বন্দি হয়ে এতকাল আবদ্ধ পাখির মত ছটফট করছিলাম! মর্মজ্বালার আগুনে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছিলাম! আজ আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পেরে সেই আগুনে জল সিঞ্চন করতে পেরে ধন্য হলাম । আশীর্বাদ করবেন , জন্মগর্ব ভুলে জাত্যভিমানকে পদদলিত করে আমার ছেলে যেন একদিন মানুষ হতে পারে।

তারপর বিনয় হর্ষসুন্দর মুখে বলল, একদিন ছেলে এবং আপনার বৌমাকে নিয়ে আপনার বাসায় যাব, স্যার।

হ্যাঁ, যেয়ো, খুশি হব। এই বলে বিনয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। উড়ে উড়ে আকাশের কালোমেঘ কোথায় যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে! মেঘ কেটে সোনা রোদ ফিনকি দিয়ে ঝরতে শুরু করেছে।

আলোর আঁধারে

রামপুর হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল থেকে বকুলবাগান হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে দুর্গাপুজোর মাত্র তিন দিন আগে এসে যোগ দিয়েছিলাম। প্রথম দিনে ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক মশাইয়ের কাছ থেকে কাগজ-কলমে স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেই প্রায় শেষ হয়ে গেল। অফিসের সামান্য কিছু টুকটাক কাজ ছাড়া তেমন আর কিছুই করা বা খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয় নি।

পরের দিন মানে পুজোর ছুটির আগের তিন দিনের দিন, পরীক্ষা-কমিটির আহ্বায়ক ধীরাজবাবু (শ্রীধীরাজমোহন রায়) আমার কাছে এলেন। স্কুলের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন। যেহেতু স্কুল খোলার কিছুদিন পরই বার্ষিক পরীক্ষা। এই স্কুলে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রচলন। স্কুল ছুটির আগেই, তাই, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশ্নপত্র করার দায়িত্ব দিয়ে দিতে হয়, যাতে স্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নপত্রগুলো প্রধানশিক্ষকের নিকট সবাই জমা দিতে পারেন এবং তা প্রেসেও ছাপাতে দেওয়া যায়। তাই ধীরাজবাবু, কাকে কোন্ প্রশ্ন দেওয়া যায়, তেমন একটা খসড়া তালিকা করে, গোপনীয় রেজিস্ট্রি খাতায় তা লিপিবদ্ধ করে নিয়েও এসেছেন। অন্যান্যবারও ধীরাজবাবুই এই দায়িত্ব পালন করেন। এখন সেই খসড়া তালিকা আমার অনুমোদন পেলেই কার্যকরী করা হবে।

আমি সেই খসড়া তালিকায় একটু চোখ বুলিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে অনুমোদন করে দিলাম। তিনি ছোট ছোট স্লিপ-কাগজেও—প্রশ্নকর্তার নাম, ক্লাশের নাম,-বিষয় এবং মোট নম্বর লিখে এনেছিলেন। সেগুলোও আমাকে দিয়ে সই করিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামাঙ্কিত খামে ঢুকিয়ে মুখ আঠা দিয়ে বন্ধ করে নিলেন। এবং প্রশ্নকর্তাদের ডাকিয়ে এনে তাঁদের হাতে সেসব খাম দিয়ে দিতে আমাকে অনুরোধ করলেন।

আমি বললাম, আমার তো এখনও কারও সঙ্গে পরিচয়ই হয় নি, নামেও কাউকে চিনি না,

এখানে বসে আপনিই আমার তরফে এ কাজটি করুন।

সেজন্যে একজন দপ্তরিকে ডেকে দেওয়া হল।

সব খাম বা চিঠি বিলি করা হয়ে গেলে, ধীরাজবাবু বললেন, স্যার, প্রত্যেক পরীক্ষাতেই, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক, স্কুল থেকে প্রত্যেক প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন করার জন্য কাগজ-কলম দেওয়া হয়; খাতা দেখার সময় অবশ্য আর কলম দেওয়া হয় না, শুধু লাল রঙের রিফিল দিলেই চলে। প্রশ্নকর্তাদের দেওয়ার জন্য সেসব কাগজ-কলম এখনও কেনা হয়নি। আপনি অনুমতি করলে আজই কিনে এনে প্রশ্নকর্তাদের দিয়ে দিতে পারব।

কী রকম খরচ পড়বে?

মোটামুটি জনপ্রতি দশ টাকা করে বাজেট ধরা হয়।

মোট প্রশ্নকর্তা কত জন?

প্রাইমারি সেক্‌শান্ এবং দুপুরের সেক্‌শান্ মিলিয়ে প্রায় ষাট জনের কাছাকাছি। প্রাইমারি বিভাগও ডে-বিভাগের প্রধানশিক্ষকের কন্ট্রোলেই। প্রাইমারি বিভাগে অবশ্য একজন ডেজিগ্‌নেটেড্ প্রধানশিক্ষকও রয়েছেন। তিনিও আমার মত প্রশ্নপত্র ইত্যাদির খসড়া তালিকা নিয়ে আজই আপনার কাছে অনুমোদন নিতে আসার কথা।

প্রশ্নপত্র কোন্ প্রেসে ছাপানো হয়?

ধীরাজবাবু প্রেসের নাম বললেন।

কী রকম রেট নেন?

খুবই কম, স্যার। একেবারে মিনিমাম রেট। আমরা সব সময় এই প্রেস থেকেই ছাপাই কিনা? তাছাড়া প্রেসের মালিক খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে দেন, স্যার।

প্রশ্নপত্র ছাপার রেটগুলো একটু দেখাতে পারেন?

নিশ্চয়ই, স্যার। —এই বলে তিনি উঠে গেলেন এবং প্রশ্নপত্রের বিলগুলো নিয়ে এলেন, যাতে রেট লেখা ছিল।

রেট দেখে আমি আঁতকে উঠলাম! কিন্তু মুখে কোন উচ্চবাচ্য করলাম না। হাবভাবেও তা প্রকাশ হতে দিলাম না।

বললাম, আমি তো প্রকাশনা লাইনে বহুদিন যুক্ত ছিলাম, সুদীর্ঘ একুশ বছর আমার পরিচালনায় আগরতলা থেকে ছোটদের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কাকলি' নিয়মিত বেরিয়েছে এবং বড়দের গল্প কবিতা প্রবন্ধ নিয়ে 'প্ল্যাটফরম' নামক একটি সংকলনও বেশ ক'বছর প্রকাশিত হয়েছে। আমার পরিচিত প্রেসের মালিকদের সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখি।

ঠিক আছে, স্যার। তাহলে তো খুবই ভালো হয়। আপনার প্রভাবে রেট-টেটেও কিছু ছাড় পাওয়া যেতে পারে।

তিনি আরও বললেন, আমি কাকলি এবং প্ল্যাটফরম দুটোই পড়েছি, স্যার। খুবই উন্নতমানের রুচিসম্মত ম্যাগাজিন। এখন কি আর বেরোয় না, স্যার?

না, এখন আর বেরোয় না। দমে কুলোয় না। হেডমাস্টারের দায়িত্ব পালন করে আর সময় পাই না। একই হেডমাস্টারের আবার একাধিক স্কুলের দায়িত্বও পালন করতে হয়! তাছাড়া, ত্রিপুরার বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে বদলির ঝামেলাও পোহাতে হয়।

ধীরাজবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই প্রাইমারি সেক্‌শানের প্রধানশিক্ষক বলাইবাবু (শ্রীবলাই

চাঁদ লস্কর) এসে গেলেন। এবং ধীরাজবাবুর মতই মর্নিং স্কুলের প্রশ্নপত্রের রেজিস্ট্রি খাতা আমাকে এগিয়ে দিলেন।

তাতে সই না করে আমি বলাইবাবুকে বললাম, আচ্ছা, ইন্টার-স্কুলের প্রশ্নপত্র আনা যায় না? ওঁরা তো অনেকগুলো প্রাইমারি স্কুল মিলে একসঙ্গে প্রশ্নপত্র ছাপান, এতে ঝামেলাও অনেক কমে, ছাপার খবচও অনেক কম পড়ে। প্রায় এক চতুর্থাংশ। তবে পরীক্ষার দিন-তারিখ ও সময় ওঁদের সঙ্গে মিলিয়ে করতে হয়, এই যা।

ইন্টার-স্কুলের প্রশ্নপত্র আনা হলে আমরাও ওঁদের সঙ্গে মিলিয়েই পরীক্ষার তারিখ ও সময় করতে পারব; কোন অসুবিধে হবে না, স্যার।

তাহলে আজই নেতাজী বিদ্যানিকেতনে গিয়ে কোন্ ক্লাশের জন্যে কত সংখ্যক প্রশ্ন দরকার, লিখিত অনুরোধ করে আসুন। নেতাজী বিদ্যানিকেতনেই ইন্টার-স্কুল পরীক্ষা-কমিটির কার্যালয়।

ঠিক আছে, স্যার। আজই যাব।

আরও একটি অনুরোধ। ধীরাজবাবুকেও বলছি। আমরা শিক্ষক। কাগজ-কলম-বই নিয়েই আমাদের কারবার। ব্যবসাও বলতে পারেন। শিক্ষকতা আমাদের জীবিকাও। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করার জন্যে, পরীক্ষার খাতা দেখার জন্যে স্কুল থেকে কাগজ-কলম-রিফিল আর নিতে চাই না! মনে হয়, তা শোভনও নয়! বরং এজন্যে যে টাকা সাশ্রয় হবে, তা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা-ফি থেকে বাদ দিলে, ফি অনেক কমে যাবে। সকাল এবং দুপুরের স্কুলের স্যার ও দিদিমনিদের তাই জানিয়ে দেবেন, এবার থেকে আর প্রশ্নকরা এবং খাতা দেখার জন্যে স্কুল থেকে কাগজ-কলম-রিফিল দেওয়া হবে না।

দুজনেই ক্ষুণ্ণমনে বললেন, আচ্ছা, স্যার।

তাহলে, এবার আসুন।

কিন্তু বলাইবাবু উঠে যেতে চাইলেও ধীরাজবাবু উঠলেন না। বলাইবাবুকেও হাতের ইশারায় বসতে বললেন। তারপর ধীরাজবাবু অত্যন্ত বিনীত সুরে বলতে আরম্ভ করলেন, আরও একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি, স্যার। এ স্কুল তো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা-সেন্টারও। বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষার্থীদের সিট পড়ে এ স্কুলে। অফিস-স্টাফ বাদে, এ দুটো পরীক্ষাতেই টিচিংস্টাফ এবং ক্লাশফোর-স্টাফ সহ আমাদের সবাইকে ব্যস্ত থাকতে হয়। বাইরের স্কুলে থেবে আরও টিচিংস্টাফ ইনভিজিলেশনের জন্যে এবং ক্লাশফোর-স্টাফ রুমে রুমে জলটল কাগজপত্র ইত্যাদি দেবার জন্যে আনাতে হয়। পরীক্ষার সেন্টার-ফি বাবৎ যে টাকা সংগৃহীত হয়, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুন্দর সুশৃংখলভাবে পরীক্ষা চালনা করার জন্যে সেই টাকা সেন্টার-স্কুলেই দিয়ে দেন। প্রধানশিক্ষকেব অনুমতি ক্রমে স্কুলের পরীক্ষা-কমিটিই তা ব্যয় করে থাকে। সেখানে আমরা নানাভাবে খরচ কাটছাঁট করে পরীক্ষা-কেন্দ্রে নিয়োজিত ব্যস্ত সবাইকে সেই কাটছাঁট করে বাঁচানো টাকা জলখাবারের জন্য সমভাবে বণ্টন করে দিয়ে থাকি।

জনপ্রতি কতটাকা করে দেওয়া সম্ভব হয়?

গতবছর মাধ্যমিকে বারো টাকা এবং উচ্চমাধ্যমিকে পনের টাকা করে দেওয়া হয়েছে, স্যার।

সেন্টার-ফি বাঁচিয়ে সেই টাকা সবাইকে একটু জলখাবারের জন্যে দিতে পারা তো খুবই আনন্দের!

ধীরাজবাবু এবার বিগলিত সুরে বলতে লাগলেন, স্যার, স্কুলের পরীক্ষায় তো আর সেন্টার-

ফির ব্যবস্থা নেই, তাই তা থেকে খরচ বাঁচানোরও আর কোন সুযোগ নেই! ছাত্রছাত্রীদের এই পরীক্ষা-ফি থেকেই নানা উপায়ে খরচ সংকুলান করে বা বাঁচিয়ে, ইন্‌ভিজিলেটর ও পরীক্ষায় কর্মরত স্টাফদের জন্য প্রতি পরীক্ষার দিনই, পরীক্ষার পর, একটু চা-মিষ্টির আয়োজন করা হয়ে থাকে, স্যার।

সেজন্য তো ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা-ফি কিছুটা হলেও বেড়ে যায়, নিশ্চয়?

তা অবশ্য কিছুটা বেড়ে যায় বটে। কিন্তু আমরা সবাই মিলে নানা দিক দিয়ে খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করি বলে ছাত্রছাত্রীদের ওপর তেমন চাপ পড়ে না!

কোন্ কোন্ দিক দিয়ে পরীক্ষার খরচ বাঁচানোর সুযোগ আছে?

এই যেমন, প্রতি রুমে একজনের বেশি ইন্‌ভিজিলেটর রাখা হয় না। দুজন অতিরিক্ত ইন্‌ভিজিলেটর রেখে দেওয়া হয়, যাতে কোন রুমে কর্তব্যরত ইনভিজিলেটরকে প্রয়োজনে রিলিফ্ দেওয়া যায়। পরীক্ষা হলে জলটল কাগজপত্র দেবার জন্য মাত্র দুজন ক্লাশফোর রাখা হয়। অফিস-স্টাফও ইনক্লুড্ করা হয় না।

তাই শুনে হাসতে হাসতে বললাম, তাহলে তো হেডমাস্টার মশাইও অফিস-স্টাফের সঙ্গে বাদ পড়েন।

না, স্যার! আপনি তো স্কুলের সর্বেসর্বা; পরীক্ষা-কমিটিরও সভাপতি! আপনাব কাছেই তো প্রশ্নপত্রও 'আণ্ডার-লক্-এণ্ড-কী' থাকে!

প্রতিরুমে একজন করে ইন্‌ভিজিলেটর থাকলে দুষ্ট পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ বেড়ে যায় না?

আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বড়ই শান্ত, সুবোধ, ওবিডিয়েন্ট ও ন্যায়পরায়ণ। এই স্কুলে নকল-টকল বড় একটা হয় না, স্যার।

অফিস-স্টাফদের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে সকলে মিষ্টিমুখ করতে বিসদৃশ ঠেকে না?

আপনি অনুমতি করলে, অফিস-স্টাফদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব, স্যার।

তাতে আরও পরীক্ষা ফি বেড়ে যাবে না?

তা একটু সামান্য বাড়বে হয়ত।

কটা রুমে সিট পড়ে?

সিক্স, সেভেন, এইট-এ দুটো করে সেক্শান্ আছে। নাইন এবং টেনে একটি করে সেক্শান্। তাই আটটা রুমে সিট বসানো হয়।

টেনের মানে দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে এই বার্ষিক পরীক্ষাই তো টেস্ট পরীক্ষা; তাই না?

হ্যাঁ, স্যার।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাশ কি তখন বন্ধ থাকে?

না, স্যার। বন্ধ থাকে না। চতুর্থ ঘণ্টা পর্যন্ত ক্লাশ নেওয়া হয়। একাদশ এবং দ্বাদশশ্রেণির প্রত্যেকটিতে বাংলা ও ইংরেজির দুটো করে কমন-ক্লাশ এবং আর্টস ও কমার্সের প্রত্যেকটিতে দুটো করে সাবজেক্ট-ক্লাশ নেওয়া হয়। এ স্কুলে তো বিজ্ঞান নেই, স্যার।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রতিদিন ছ'জন শিক্ষক হলেই চলে। কারণ, একাদশ শ্রেণিতে যিনি প্রথম পিরিয়ড বাংলা পড়াবেন, তিনিই দ্বিতীয় পিরিয়ডে দ্বাদশ শ্রেণিতেও

বাংলা পড়াতে পারবেন; এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে যিনি প্রথম পিরিয়ডে ইংরেজি পড়াবেন, তিনিই দ্বিতীয় পিরিয়ডে একাদশ শ্রেণিতে ইংরেজি ক্লাশ নিতে পারবেন। পরীক্ষার ইন্‌ভিজিলেশন ডিউটিতে লাগছে আট রুমে আটজন শিক্ষক, দুজন অতিরিক্ত ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্যে আপনি সহ দুজন। মোট শিক্ষক লাগছে, এই আঠেরো জন। তাই তো?

হ্যাঁ, স্যার। তাই বটে। কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যেক টিচারকেই ইন্‌ভিজিলেশন ডিউটি দিতেই হয়। কাউকেই বাদ দেওয়া হয় না।

তা না হয় হল। কিন্তু স্কুলের টিচার্স্-স্ট্রেংথ্ তো হল বিয়াল্লিশ। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তাহলে প্রতিদিন বাকি (৪২-১৮) চব্বিশ জন টিচার কী করেন?

সে সময় তাঁদের তো আর কিছুই করার থাকে না, তাই অ্যাটেন্‌ডেন্স রেজিস্ট্রারে সই করে বাড়ি চলে যান, স্যার!

তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে, টিচিংস্টাফের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সার্ভিসটা আমরা কোন কাজেই লাগাতে পারছি না! অথচ ইচ্ছে করলেই তাঁদের মূল্যবান সার্ভিস্ আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি। পরীক্ষা-রুমে বেশি সংখ্যক ইন্‌ভিজিলেট্‌র থাকলে দুষ্ট পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বন করার সুযোগও হ্রাস পায়, প্রবণতাও কমে। এবং আর মাত্র দুজন শিক্ষক যুক্ত হলেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সপ্তম পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাশ অনায়াসে চালানো যায়। একাদশ ও দ্বাদশশ্রেণির সপ্তম পিরিয়ড পর্যন্ত দুই ক্লাশের ক্লাশ সংখা (৭+৭) মোট চৌদ্দ। এখন, এই দুটি ক্লাশে চতুর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাশ নিতে ছ'জন টিচার প্রয়োজন হচ্ছে। আরও দুজন যুক্ত হলে টিচারের সংখ্যা দাঁড়াবে মোট আট। এই চৌদ্দটি ক্লাশের জন্যে আটজন টিচার হলে, প্রতিদিন একজনের দুটো করেও ক্লাশ পড়ে না! তাই না?

এসব হিসেব শুনতে শুনতে ধীরাজবাবু বিরস-বদনে বললেন, হিসেব করলে তো তাই দাঁড়াচ্ছে, স্যার।

তারপর আমি অনেকটা আদেশের সুরে বললাম, এবার ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার সময় দশটি রুমে পরীক্ষার সিট বসাবেন। যাতে পরীক্ষার্থীদের ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে না হয়। এবং প্রতিটি রুমে তিন বা তিনের অধিক ইনভিজিলেটর নিয়োজিত করবেন। আর এবার থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হবে। প্রতিদিন প্রতি ক্লাশের একটি করে বিষয়ের পরীক্ষা হবে। অঙ্ক পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের পরীক্ষার আগে কোন গ্যাপ বা ফাঁক থাকবে না। মাসাধিক কাল ধরে পরীক্ষা চলার কোন প্রয়োজন নেই। যত কম দিনের মধ্যে সম্ভব পরীক্ষা শেষ করে ফেলতে হবে। কোন ক্লাশে বা সেক্‌শানে কোর্স শেষ হয়ে গেলে, সেখানে কোর্স রিভাইস চলবে। শিক্ষকমশাইগণ ইচ্ছে করলে তাঁর পিরিয়ডে পরীক্ষাও নিতে পারেন। এতে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা-ভীতি কমবে, পরীক্ষা ফেস্ করার ক্ষমতা বাড়বে; এবং ওরা উপকৃত হবে।

আর, বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পুরো ক্লাশ চলবে অর্থাৎ সপ্তম পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাশ হবে। আর একটি অনুরোধ করি, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা-ফি বাঁচিয়ে এবং তা থেকে টাকা বাঁচিয়ে আমাদের চা-মিষ্টি খাওয়াটা রুচিসম্মত মনে করি না, উচিতও নয়। তার পরিবর্তে যতদূর সম্ভব পরীক্ষা-ফি কমিয়ে দেওয়া হবে।

আচ্ছা, আসুন।

ধীরাজবাবু এবং বলাইবাবু উঠতেই, বলাইবাবুকে আবার একবার মনে করিয়ে দিতে বললাম, বলাইবাবু, ইন্টার-স্কুলের প্রশ্নপত্রের রিকুইজিশান্ (লিখিত আবেদন)দিতে নেতাজী বিদ্যানিকেতনে আজই যাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ, স্যার। এখান থেকেই সোজা চলে যাব।

সেদিনই স্কুল ছুটির পর, আমার পরিচিত প্রেসের একজন মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি প্রশ্নপত্রের যা রেট দিলেন, তা স্কুলের পরিচিত সেই প্রেসের রেটের তুলনায় অর্ধেক। তাই, স্কুলের এবারকার প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্যে আমার পরিচিত এই প্রেসের মালিককেই ফাইন্যাল কথা দিয়ে দিলাম।

বলা বাহুল্য, স্কুল খোলার পর যখন বার্ষিক পরীক্ষার নির্ঘন্টের সঙ্গে পরীক্ষা-ফিরও নোটিশ দেওয়া হল, তখন দেখা গেল, আগের বছরের তুলনায় এবার দুপুরের স্কুলের সব শ্রেণির পরীক্ষার-ফিই এক-তৃতীয়াংশে এবং মর্নিং স্কুলের সব শ্রেণির পরীক্ষা-ফি এক -চতুর্থাংশে নেমে গেছে!

স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং ওদের অভিভাবকগণ খুশি হলেও শিক্ষকমশাইগণ যে মোটেই খুশি হন নি, আমার ওপর চটে আছেন; তা তাঁদের কথাবার্তা আর আচার-আচরণেই ক্রমশ প্রকাশিত হতে লাগল!

দুই

১৯৯৭ সাল। জানুয়ারি মাসের শুরু। পরীক্ষার ঝামেলা শেষ হল। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও যথাসময়ে ঘোষিত হয়ে গেল। নতুন ক্লাশও যথারীতি শুরু হল। কিন্তু এর মধ্যে আরেক ঝামেলার উদ্ভব!

স্কুলে শিক্ষাঅধিকার থেকে এক বিজ্ঞপ্তি এসেছে বাড়িভাড়া-ভাতা সংক্রান্ত ব্যাপারে।

যাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই সরকারি, আধা-সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, তাঁদের যুগ্মভাবে লিখিত ঘোষণা দিতে যে, দুজনের মধ্যে কে এই ভাতা গ্রহণ করেন, বা দুজনই গ্রহণ করেন কিনা।

নিয়ম হল, একই স্টেশনে স্বামী ও স্ত্রী চাকরি করলে, একজন বাড়িভাড়া-ভাতা পাবার যোগ্য। পৃথক পৃথক স্টেশনে চাকরি করলেও যদি একই স্টেশনে বা বাড়িতে বসবাস করেন, সেক্ষেত্রেও একজন, স্বামী অথবা স্ত্রী, এই ভাতা গ্রহণ করার যোগ্য। কেবল পৃথক পৃথক স্টেশনে চাকরি করলে এবং বসবাস করলে, স্বামী-স্ত্রী দুজনই এই বাড়িভাড়া-ভাতা গ্রহণ করার যোগ্য।

এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, পনের ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ -এর মধ্যে সকল কর্মচারীকে বাড়িভাড়া-ভাতা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রটি যুগ্মস্বাক্ষর সহ (স্বামী স্ত্রী দুজনের) স্কুল অফিসে জমা দিতে হবে। অন্যথায়, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ মাসের বেতন থেকে এই ভাতা বাদ দেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বুকে গেঁথে, ওর নিচে প্রত্যেক স্টাফের নাম লিখে, সবাইকে দেখাবার জন্যে ও স্বাক্ষর করাবার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম।

নোটিশের নিচে আরও উল্লেখ করে দিলাম যে, যাঁরা অবিবাহিত, যাঁরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন চাকরি করেন, তাঁরাও এই মর্মে ঘোষণাপত্রটিতে সে কথার উল্লেখ করে দেবেন।

আর যাঁদের স্বামী অথবা স্ত্রী অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, যুগ্ম ঘোষণাপত্রটির সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠানের ডি.ডি.ও.-র (ড্রয়িং এণ্ড ডিস্‌বারস্‌মেন্ট অফিসার) একটি নিদর্শনপত্র এই মর্মে যুক্ত করে দিতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়িভাড়া-ভাতা গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করেন না।

এই নোটিশ প্রদর্শনের কিছুদিনের মধ্যেই যাঁরা অবিবাহিত এবং যাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে একজন চাকরি করেন, তাঁরা প্রত্যেকে ঘোষণাপত্র সই করে জমা দিয়ে দিলেন।

জানুয়ারি মাস প্রায় শেষ হতে চলল, কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক মশাই তখনও ঘোষণাপত্র জমা দেন নি! অবশ্য শিক্ষিকাগণ এরমধ্যে সবাই জমা দিয়ে দিয়েছেন।

সংস্কৃতি-কমিটির পাঁচজনের মধ্যে তিনজন শিক্ষক এবং দুজন শিক্ষিকা। এই তিনজন শিক্ষকমশাইয়ের মধ্যে একজনও ঘোষণাপত্র জমা দেন নি! স্কুলে আরও কয়েকজন নেতৃত্বস্থানীয় যাঁরা আবার রাজনৈতিক দলপ্রভাবিত হোমরাচোমরাও বটেন, তাঁরাও কেউই ঘোষণাপত্র জমা দেননি!

আমি তাই আবার নোটিশ দিয়ে অনুরোধ করলাম এবং নোটিশের নিচে যাঁরা জমা দেন নি, তাঁদের নামও লিখে দিলাম যে, নিম্নলিখিত শিক্ষকমশাইদের স্বামী-স্ত্রীর যুগ্মস্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্র এখনও পাওয়া যায়নি! পনের ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭-এব মধ্যে তা স্কুলের অফিসে জমা দিতে আবারও অনুরোধ করা যাচ্ছে। অন্যথায়, সেই বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক তাঁদের বাড়িভাড়া-ভাতা ড্র-করা সম্ভব হবে না। এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জ্ঞাত করা হবে।

এই নোটিশের পর একজন শিক্ষকমশাই এসে একা একা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা স্যার,আমার স্ত্রী তো অন্য একটি অফিসে চাকরি করেন, আর আমরা একই সঙ্গে থাকিও; বাড়িভাড়া-ভাতা ব্যাপারে যে এত্তো নিয়ম-কানুন, আগে তা জানতামই না! সেই অফিসের ডি.ডি.ও. থেকে কি কোন্ সময় থেকে আমার স্ত্রী এই ভাতা গ্রহণ করছেন, তা লিখিয়ে আনতে হবে? নাকি সময় উল্লেখ না করলেও চলবে?

সারকুলার বা বিজ্ঞপ্তিতে শুধু বলা আছে, বাড়িভাড়া-ভাতা গ্রহণ করলে লিখতে হবে, ভাতা গ্রহণ করি, না করলে লিখতে হবে, ভাতা গ্রহণ করি না; এবং তা যুগ্মভাবে স্বামী-স্ত্রীকে স্বাক্ষর করে দিতে হবে।

তাহলে গিন্নিকে বলে দিই, স্যার; এ মাস থেকেই যেন উনি আর বাড়িভাড়া ভাতা গ্রহণ না করেন। তাহলে, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই গিন্নির এই ভাতা যে গ্রহণ করেন না, এই মর্মে সেই প্রতিষ্ঠানের ডি.ডি.ও.-র কাছ থেকে একটা সারর্টিফিকেট বা নিদর্শনপত্র আনা সম্ভব হবে। এবং তা সময় মত এখানে জমাও দিতে পারবে। সারবে তো, স্যার?

তা আপনি বুঝবেন। আমি শুধু ঘোষণাপত্রের সঙ্গে এই নিদর্শনপত্রটিও জুড়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।

তারপর, এইভাবে, একে একে বাকি সবাই একই কথা এসে উত্থাপন করলেন এবং একই রকম জবাব পেয়ে, মনে হল, ঝড়ের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার খানিকটা সুযোগের সন্ধান পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। শুধু একজন এসে লিখিত জানিয়ে গেলেন, জানুয়ারি, ১৯৯৭ থেকে তিনি আর বাড়িভাড়া-ভাতা গ্রহণ করবেন না। পরস্পর জেনেছি, তাঁর স্ত্রী নাকি অন্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে চাকরি করেন এবং স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গেই বসবাস করেন।

পনের ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ -এর মধ্যেই বাকি আট জনের যুগ্মস্বাক্ষর যুক্ত ঘোষণাপত্র ও তৎসঙ্গে

অন্য প্রতিষ্ঠানের ডি.ডি.ও.-র নিদর্শনপত্রও স্কুল-অফিসে জমা পড়ে গেল। অবশ্য, কোন ডি.ডি.ও.-র নির্দশন পত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কোন্ বছরের কোন্ মাস থেকে এই বাড়িভাড়া-ভাতা গ্রহণ করছিলেন, সে উল্লেখ ছিল না।

তবে, এতদিনের কায়েমি মৌরসিপাট্টায় হাত পড়ায় রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত শিক্ষকগণ যে আমার' পরে বেজায় চটিতং, তা আমি ক্রমে ক্রমে টের পেতে শুরু করেছিলাম।

তিন

অলকবাবু (শ্রীঅলকনাথ মুখোপাধ্যায়) বকুলবাগান হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে প্রায় দশ বছর একনাগাড়ে শিক্ষকতা করেছেন। ডিসেম্বর ১৯৯৬-এর শেষের দিকে তাঁর বদলির আদেশ এসেছে। সে-স্কুলটি তাঁর বাড়ির অতি সন্নিকটে। তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিলিজ করে দেওয়া দরকার।

সংস্কৃতি-কমিটির আহ্বায়ক ধীরাজবাবুকে একদিন বললাম, অলকবাবুর ট্রেন্সফার অর্ডার এসেছে, তাঁকে তো এরই মধ্যে রিলিজ করে দেওয়া হবে। অলকবাবুকে কবে নাগাদ ফেয়ারওয়েল দেওয়া যায়?

তিনি জানালেন, এক স্কুল থেকে অন্যস্কুলে ট্র্যান্সফার হলে, এ স্কুল থেকে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার রীতি নেই। কেবল এ স্কুলে কর্মরত অবস্থায় রিটায়ার্ড হলে, ফেয়ারওয়েল দেওয়ার রেওয়াজ। এ স্কুল থেকে এবার এপ্রিল মাসে আপনি এবং ডিসেম্বর মাসে হরিহরবাবু অবসর নেবেন। আপনার রিটায়ারমেন্ট আগে এবং তা ক'মাস পরই; তাই আপনাকে ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি চলছে।

আমি আর এ-ব্যাপারে কোন কথা বললাম না। অলকবাবুকে জানুয়ারি, ১৯৯৭ -এর প্রথম সপ্তাহেই রিলিজ করে দেওয়া হল।

দেখতে দেখতে এপ্রিল মাস এসে গেল এবং তা শেষও হয়ে যেতে লাগল। এপ্রিল মাসের ২৯ তারিখ নতুন প্রধানশিক্ষক মশাই এসে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করলেন।

সেদিনই স্কুল ছুটির পর, হেডক্লার্ক বিনয় ভট্টাচার্যকে ডেকে, ওর হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললাম, কাল তো আমার চাকরি জীবনের শেষদিন, তুমি একটু কষ্ট করে, স্কুলের সমস্ত স্টাফের জন্যে একটু চা-মিষ্টির ব্যবস্থা করো, বিনয়। বিনয় ভট্টাচার্য এক সময় আমার ছাত্র ছিলেন।

পরের দিন চতুর্থ ঘণ্টার পর অর্থাৎ লেজার পিরিয়ডে, নতুন প্রধানশিক্ষক মশাই, টিচিংস্টাফ, অফিস-স্টাফ এবং চতুর্থ শ্রেণির সকল কর্মচারী সহ টিচার্স্ কমনরুমে গিয়ে বসলাম।

বিনয় কয়েকজন দিদিমনি (শিক্ষিকা) ও চতুর্থশ্রেণির কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনায় চা-মিষ্টি সহযোগে চাকরি-জীবনের অন্তিমদিনে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে হাতজোড় করে বিনম্র-কণ্ঠে বললাম, কর্তব্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে অজ্ঞাতসারে কোন ভুলত্রুটি এবং অন্যায় আচরণ করে থাকলে এই শেষবেলা আমি আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি; আপনারা নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

ছুটির ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্মক্লান্ত চাকরি-জীবনেরও শেষ ছুটির ঘণ্টা বাজল। আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত, বিষন্ন মনে চাকরি-জীবনের ইতি টেনে আস্তে আস্তে প্রধানশিক্ষকের কক্ষ থেকে পা বাড়ালাম এবং স্কুল গেট পেরিয়ে দিনের শেষের ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন পাখির মতন সন্ধ্যার মলিন আলোয় বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

নগরবাসী মারাক

মাঘ মাস।

তখন গভীর রাত। নগরবাসী মারাক গভীর ঘুমে। ওর বৃদ্ধ মা-বাবা স্ত্রী ছোট ছোট শিশু সন্তানও ঘুমে অচেতন। অমন সময় ফট-ফট-ফটাস্ ভট-ভট-ভটাস্ আগুনে পোড়া বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ এবং গুলির আওয়াজে নগরবাসীর ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল! ওদের ছনের ছাউনি বাঁশের ঘর। ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখ মেলতেই পাশের টিলার ঘরদুয়ার দাউ দাউ করে জ্বলার আগুন নগরবাসীর দুচোখ ঝলসে দিল।

পাশাপাশি দুটি টিলা। টিলার নিম্নাংশে লুঙ্গা। ঝোপঝাড়। জঙ্গলাকীর্ণ। ওদেরও টিলার ওপরেই ঘর। দুয়ার খুলে নগরবাসী বাইরে এল। দুয়ারটিও বাঁশেরই তৈরি।

পাশের টিলার আক্রান্ত-মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি আর্তনাদ এবং গুলির আওয়াজে নগরবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল! ওর হাত-পা অবশ হয়ে আসতে লাগল! শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে যেতে লাগল!

নগরবাসী ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে অতি সন্তর্পণে বাবা মা স্ত্রী এবং ছোট ছোট শিশুসন্তান দুটিকে জাগাল। ছোট সন্তানটিকে স্ত্রীর কোলে দিয়ে অন্যটিকে নিজের কোলে তুলে নিল। তারপর সবাইকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে পাশের লুঙ্গার জঙ্গলে গিয়ে ভয়ার্ত খরগোশের মতন চুপিসারে লুকোল। মানুষের আগমন টের পেয়ে পাশের জঙ্গল থেকে বনমোরগ খরগোশ বুনোশুয়োর ও শেয়ালের মতন কয়েকটা বন্যপ্রাণী দ্রুত ছুটে পালাল।

শীত নগরবাসীকে ঠক ঠক করে কাঁপাচ্ছিল। ঘর থেকে ও উদোম গায়েই বেরিয়ে পড়েছিল। একটা কিছু গায়ে জড়ানোর মতন সময় তখন ওর হাতে ছিল না, মনেও ছিল না। এতক্ষণে নগরবাসী শীত ও মশার কামড় টের পেতে লাগল। মশার কামড়ে ও অস্থির হয়ে উঠল! ত্রিপুরার পাহাড়ে-মশা!

মশা তবু মারা যাবেনা, যদি শব্দ হয়? যদি এই শব্দ উগ্রপন্থী-দানবদের কানে পৌঁছোয়? লুঙ্গার জঙ্গলে যে সবাইকে নিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পেরেছে,ওতেই নগরবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল!

এবার নগরবাসীর মনে পড়ল, আজকের দিনমজুরির টাকাটা বালিশের নিচেই রয়ে গেছে! তাড়াহুড়ো করে তখন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসার সময় এ-কথা আর নগরবাসীব মনেই পড়ে নি! এই দিনমজুরির টাকা ক'টা খোয়া গেলে আগামীকাল ওরা খাবে কী? ওরা যে দিন আনে দিন খায়!

তাই নগরবাসী সাহসের ওপর ভর করে ভালুকের মতন চুপ চুপি পা-টিপে পা-টিপে সেই দিনমজুরির টাকা ক'টা আনতে ফের বাড়ি গেল। ঘরে ঢুকল। তারপর বালিশের তল থেকে টাকা ক'টা হাতে নিয়ে মনের সুখে ঘর থেকে বেরিয়ে লুঙ্গার জঙ্গলে পা বাড়াল।

কিন্তু হঠাৎ একটা পিঁপড়ে যেন নগরবাসীর মাথায় একটা কামড় বসিয়ে দিল! ব্যস! গুলি! ও যে গুলিবিদ্ধ হয়েছে— তা ও নিজে টেরও পেল না! ওর লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল!

তখনও নগরবাসীর দিনমজুরির সেই ক'টা টাকা হাতে মুষ্টিবদ্ধ!!